বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

শ্রীসুকুমার সেন

এম.এ., পি-এইচ.ডি.

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৯

মূল্য—দুই টাকা আট আনা

প্রথম সংস্করণ—১৯৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৪০
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৪৩
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৪৫
পুনর্মুদ্রণ—১৯৪৯

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY NISHITCHANDRA SEN,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1665B—February, 1949—B.

। । স্বর্গত কনিষ্ঠ ভগিনী ভক্তির স্মরণে ।

১৩১৭-১৩২৬

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ শতাব্দী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দী

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ—কোম্পানীর আমল

ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু স্বল্পপরিসরের মধ্যে সর্বজনপাঠ্য প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশেষ অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণের জন্যই "বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" লিখিত হইল। ইহাতে যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি বাদ দিয়া সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মল্লিনাথের কথায়—নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নান-পেক্ষিতমুচ্যতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আগ্রহ না থাকিলে বইটি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না। তজ্জন্য ইঁহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুকুমার সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংযোজিত হইল। তর্জা, কবিগান ও পাঁচালীর বিষয়ে একটি নূতন শীর্ষক দেওয়া হইয়াছে। অজ্ঞাতপূর্ব কয়েকটি নূতন কাব্যের পরিচয়ও ইহাতে মিলিবে। আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃততর পরিচয় ও তথ্য জানিতে চান তাঁহারা আমার নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" দেখিলে উপকৃত হইবেন। বৈষ্ণব গীতি-কবিদিগের বিষয়ে পরিপূর্ণ বিবরণ মদীয় **A History of Brajabuli Literature** গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

প্রথম সংস্করণের একটি লোকপ্রচলিত ভ্রম বর্ত্তমান সংস্করণে শুধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলে রাখি। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'-র এক জায়গায় লেখা হয়েছে দিনেন্দ্রনাথ আমার রচিত অনেক গানে সুর বসিয়েছেন,—কথাটা সম্পূর্ণই অমূলক। অনেক মিথ্যা জনশ্রুতি ইতিপূর্ব্বেও অন্যত্র ছাপার অক্ষরে দেখেছি। মুখে মুখে অনেকে চালনা করেন।"

শ্রীসুকুমার সেন

চতুর্থ সংস্করণের বক্তব্য

এই সংস্করণে প্রাচীন সাহিত্যের অংশে উল্লেখযোগ্য নবাবিষ্কৃত তথ্য দেওয়া হইল। আধুনিক সাহিত্যের অংশও অল্পস্বল্প পরিবর্দ্ধিত হইল। তিন খণ্ড বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তৃততর পরিচয় দ্রষ্টব্য।

শ্রীসুকুমার সেন

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী

১

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগ

বাঙ্গালা দেশে আর্য্যদিগের আগমনের পূর্বে যাহারা বাস করিত তাহাদের সংস্কৃতি আদৌ উচ্চাঙ্গের ছিল না, এবং সাহিত্য বলিতে যাহা বোঝায় এমন কিছুও তাহাদের ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য সম্রাট্‌দিগের সময় হইতে এদেশে আর্য্যদিগের বসতি আরম্ভ হয়, এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র আর্য্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ শিক্ষার, বিদ্যাচর্চার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল সংস্কৃত, আর আটপহরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা।

এদেশে সাহিত্যের চর্চার পত্তন হয় এই সব উপনিবিষ্ট আর্য্যদিগের দ্বারা। প্রথম কয় শত বৎসর তাঁহারা যাহা কিছু লিখিতেন সবই সংস্কৃতে, দৈবাৎ প্রাকৃতে। এই সব লেখার নমুনা পাই শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ অথবা তাম্রপটে লিখিত অনুশাসনে বা ভূমিদানপত্রে এবং দুই একটি মহাকাব্যে ও নাটকে আর কতকগুলি সংস্কৃত-শ্লোকে। বাঙ্গালা দেশে রচিত সর্বাপেক্ষা পুরাতন কাব্য হইতেছে রামচরিত। এটি রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা। রচয়িতার নাম অভিনন্দ। অনুমান হয় যে ইনি সম্রাট্‌ দেবপাল দেবের অনুচর ছিলেন। তাহা হইলে ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, ধরিতে হইবে। পাল সম্রাট্‌দিগের রাজ্যকালে আরও একটি কাব্য রচিত হইয়াছিল দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে। এই কাব্যটিরও নাম রামচরিত। ইহাতে রামায়ণ-কাহিনী এবং সম্রাট্‌ রামপাল দেবের জীবনী একই সঙ্গে দ্ব্যর্থের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী রামপাল দেবের পুত্র মদনপাল দেবের অনুচর ছিলেন।

পাল-রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহার পর বর্ম্ম, চন্দ্র ও সেন-বংশের রাজত্ব। ইঁহারাও বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যামোদী ছিলেন। সেকালের অনেক বড় পণ্ডিত ও কবি সেনরাজদিগের সভা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ্মণসেন দেবের সভায় উমাপতি-ধর, গোবর্দ্ধন আচার্য্য,

ধোয়ী, শরণ এবং জয়দেব এই পাঁচজন বিখ্যাত কবির সম্মেলন হইয়াছিল। উমাপতিধরের রচিত কয়েকটি প্রশস্তি এবং প্রকীর্ণ শ্লোক মাত্র পাওয়া গিয়াছে। শরণের লেখা কোন বই পাওয়া যায় নাই, কেবল কতকগুলি শ্লোক কাব্যসংগ্রহ-গ্রন্থাদিতে রক্ষিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন আচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে ইনি যে শিষ্য উদয়ন এবং ভাই বলভদ্রের সাহায্য পাইয়াছিলেন সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধোয়ী পবনদূত কাব্যের রচয়িতা কাব্যটি কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণ হইলেও গুণহীন নয়। লক্ষ্মণসেন দেবের সভায় ধোয়ীর খাতির ছিল সবচেয়ে বেশী। ইনি রাজার কাছ হইতে হস্তিব্যূহং কনককলিতং চামরং হেমদণ্ডং" সমেত কবিচক্রবর্ত্তী বা কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন দেবের "প্রতিরাজ" এবং সুহৃৎ "মহাসামন্তচূড়ামণি" বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলন করেন। বহু বাঙ্গালী কবির রচিত সংস্কৃত শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস এই বইটির কোন কোন কবিতায় লক্ষিত হয়।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব। ইঁহার গীতগোবিন্দ কাব্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বিষয়ে রচিত। গীতগোবিন্দে চব্বিশটি গান বা পদ আছে। এগুলি সংস্কৃতে রচিত হইলেও ইহাদের শ্রুতিমধুরতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই মনোহরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই পদগুলি লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের সূত্রপাত। পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে জয়দেবের নিকট ঋণী। জয়দেবের নিবাস ছিল অজয় নদের ধারে কেন্দুবিল্ব গ্রামে। এই গ্রাম এখন কেঁদুলী বা জয়দেব-কেঁদুলী নামে বিখ্যাত। জয়দেবের স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে এই স্থানে আবহমান কাল ধরিয়া প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও সাধু-বৈষ্ণব আসিয়া এই মেলায় যোগ দিয়া থাকেন। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, পত্নীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীর সম্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে।

সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে লোকের মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হয়। এই প্রাকৃত ভাষা ভাঙ্গিয়া আবার বিভিন্ন আধুনিক ভাষা— যেমন বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি —উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক ভাষায় পরিণত হইবার ঠিক পূর্বে প্রাকৃতের যে রূপ ছিল, তাহাকে বলা হয় অপভ্রংশ। সেন-রাজাদের সময়ে অপভ্রংশ ভাষারও কিছু কিছু চর্চা হইত, তাহা অবশ্য রাজসভায় বা বিদ্বদ্‌-গোষ্ঠীতে নহে,

সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ সহজপন্থী ও শৈব নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য্য এবং সাধকদিগের মধ্যে। এই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা বাঙ্গালাতেও পদ লিখিতেন। যতদূর জানা গিয়াছে, ইঁহাদের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ কিছু রচনা করেন নাই। তাহা করিবারও কথা নয়। কেননা এই সময়েই—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ-দ্বাদশ-শতাব্দীতেই—বাঙ্গালা ভাষা অপভ্রংশ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র ভাষারূপে মূর্ত্তি লাভ করে।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদিগের লেখা একটি গানের বইয়ের পুঁথি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের পুস্তকালয় ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে, আরও কয়েকটি পুঁথির সঙ্গে, "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে প্রকাশিত করেন। মূল বইটিতে একান্নটি গান ছিল, তাহার মধ্যে একটি গান পুঁথি-লেখক বাদ দিয়াছেন, এবং পুঁথির কয়েকটি পাতা হারাইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে মোটমাট সাড়ে ছেচল্লিশটি গান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই গানগুলির মধ্যে সিদ্ধকবিরা তাঁহাদের সাধনার সঙ্কেত ভরিয়া দিয়াছেন পরবর্ত্তী সাধকদিগের উদ্দেশে। তাই এই গানগুলিকে বলা হইত "চর্য্যা (অর্থাৎ আচরণীয় বা সাধনীয়) গীতি।" চর্য্যা-গানে পদকর্ত্তার নাম ভনিতা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। পদগুলি যে যে সুরে গাহিতে হইবে তাহারও নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। পুঁথিটিতে অধিকন্তু আছে গানগুলির একটি বিস্তৃত সংস্কৃত টীকা। লুই, সরহ, কাহ্ন, জয়নন্দী, তাড়ক, কঙ্কণ, আজদেব, ভুসুকু ইত্যাদি প্রায় বিশ কবির রচনা পাইতেছি চর্য্যা-গীতিতে।

চর্য্যা-গীতিগুলিতে বৌদ্ধ ও শৈব সিদ্ধাচার্য্যদিগের সাধনার যে সঙ্কেত নিহিত আছে তাহা আমাদের কাছে এখন প্রায় অবোধ্য। তবে গানগুলির বাহ্যিক বা আক্ষরিক অর্থ জানা বিশেষ দুরূহ নয়। ভাষা কিছু কঠিন বটে, কারণ বাঙ্গালা ভাষা তখন সবেমাত্র প্রাকৃতের খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। ছন্দ অপভ্রংশের।

জয়দেবের কাব্যে এবং বৌদ্ধ গানগুলিতে যে গীতি-কবিতা বা পদাবলীর ধারা শুরু হইল এই ধারা পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে অশেষ রস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান ধারারূপে পরিণত হইয়াছিল। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও গীতি-কাব্যরূপে এই ধারাই খাত বদলাইয়া নিরন্তর প্রবাহে অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার জন্ম-মুহূর্ত্তেই যে তাহার সাহিত্য নিজের মূল ধারা বা মূল সুর, অর্থাৎ গীতি-কাব্য, খুঁজিয়া পাইয়াছিল, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহা না হইলে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

২

তুর্কী অভিযানের পথে

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালা দেশে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। বাঙ্গালা দেশ চিরদিনই আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্রীয় সংঘাতের বাহিরে থাকিয়া নিজের স্বতন্ত্র পথে চলিয়া আসিতেছিল। সেই কারণে আর্য্যাবর্ত্তে যখন শক হূণ প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারিগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, তখন তাহার ঢেউ বাঙ্গালা দেশের সীমানায় পৌঁছিয়া বাঙ্গালীর পল্লীজীবনের সুখশান্তির বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই। অনেক কাল পরে যখন তুর্কী ও পাঠান সৈন্য পশ্চিম ও উত্তর ভারতে একে একে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও এই ব্যাপারের গুরুত্ব বাঙ্গালীর বোধগম্য হয় নাই। অতএব যখন ইখ্‌তিয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ-বিন্ বখ্‌তিয়ার মগধদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া অকস্মাৎ পূর্বদিকে প্রধাবিত হইল, তখন বাঙ্গালা দেশের রাজশক্তি অথবা প্রজাবর্গ কেহই এই বিদেশী আক্রমণকারীদিগকে উপযুক্ত বাধা দিবার জন্য এতটুকুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং মুষ্টিমেয় তুর্কী-পাঠান সৈন্যকে বাঙ্গালা দেশে বিশেষ কোন যুদ্ধ অথবা অন্য প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙ্গালীর বিদ্যা- ও সাহিত্য-চর্চার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। প্রায় আড়াই শত বৎসরের মত দেশ সকল দিকেই পিছাইয়া গেল। দেশে শান্তি নাই, সুতরাং সাহিত্য-চর্চা তো হইতেই পারে না। প্রধানতঃ এই কারণেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ এই দুই শতাব্দীতে রচিত কোন বাঙ্গালা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শম্‌সু-দ্-দীন ইলিয়াস শাহ্ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছেদ করিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন হইতে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইল। দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদের সহায়তায় পুনরায় জ্ঞান-চর্চা সুরু হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টাও দেখা দিল। পাল- এবং সেন-বংশীয় নরপতিদিগের মত এবারেও মুখ্যভাবে রাজশক্তিই জ্ঞান- ও সাহিত্য-চর্চার পোষকতা করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ তিন জন সুলতান এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অন্ততঃ এক জন সুলতান এবং দুই জন উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্ম্মচারী যে নিজেদের সভাকবিদিগের দ্বারা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইতেছে। তুর্কী অভিযানের পর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইংরেজ অধিকারের

পূর্বকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য প্রধানতঃ গীতিমূলক ছিল। অর্থাৎ বাঙ্গালা কাব্য সাধারণতঃ পড়া বা আবৃত্তি করা হইত না,—মন্দিরা মৃদঙ্গ নূপুর ও চামর-সংযোগে একাকী বা দলবদ্ধভাবে গীত হইত। অতি পূর্বকালে পঞ্চালিকা (পাঞ্চালিকা) বা পুতুল-নাচের সঙ্গে এই ধরণের কাব্য গীত হইত বলিয়া বোধ হয় পরে বাঙ্গালা কাব্যের সাধারণ নাম হইয়াছিল "পাঁচালী।" দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ লিখিয়া গিয়াছেন যে এই "পাঞ্চালিকা" বা "পুত্তলিকা" বস্ত্র, গজদন্ত, শৃঙ্গ অথবা কাষ্ঠনির্মিত হইত। এই পাঁচালী কাব্যগুলিতে কোন না কোন দেবতা অথবা দেবকল্প মানুষের মহিমা কীর্ত্তিত হইত; এইজন্য কাব্যের নামে প্রায় "মঙ্গল" বা "বিজয়" শব্দ যুক্ত থাকিত। দেব-মাহাত্ম্য-গীতি অর্থে "মঙ্গল" শব্দ জয়দেব প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে "মঙ্গল" ও "বিজয়" কাব্য বলিয়া দুই স্বতন্ত্র প্রকারের কাব্যধারা বর্ত্তমান ছিল। এই ধারণা ভুল। একই কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে কখনও "মঙ্গল" কখনও বা "বিজয়" নাম পাইতেছি। যেমন মালাধর বসুর কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল এবং গোবিন্দমঙ্গল এই তিন নামেই সমানভাবে সুপরিচিত ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের সাহিত্যিক রুচির চমৎকার ছবি পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, তখন গায়কেরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ও শিবের গৃহস্থালীর গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, পূজা উপলক্ষে সাধারণ লোকে আগ্রহ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ও বিষহরির অর্থাৎ মনসার পাঁচালী শুনিত, এবং রামায়ণ-গানে আর ঐতিহাসিক-গাথায় সাধারণ লোকের, এমন কি বিদেশী মুসলমানেরও চিত্ত বিগলিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত এই সব কাব্যের দুই একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগাথাগুলি—বৃন্দাবনদাসের কথায় "যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত"—একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ শতাব্দী

৩

কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বসু

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে আমরা একজন বড় কবিকে পাইতেছি। ইনি কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান কাব্য।

কাব্যটি রচিত হওয়ার পর হইতেই যেরূপ অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে তাহা এক কাশীরাম দাসের মহাভারত-কাব্য ছাড়া আর কোন বাঙ্গালা কাব্যের অদৃষ্টে ঘটে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু কাব্যরস যোগাইয়া বাঙ্গালীর শ্রবণ-মন তৃপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই অনবদ্য কাব্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশের তাবৎ নরনারী এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। রামায়ণের শান্ত-করুণ কাহিনী শুনিলে এমন কঠিনহৃদয় ব্যক্তি নাই যাহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ আর্দ্র হইবে না। এরূপ কাব্য আহার এবং ঔষধ দুইই, একাধারে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে শ্রোতা ও পাঠকের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিয়া থাকে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। সেকালে শুধু হিন্দুদিগের কাছে নহে, মুসলমানদিগের নিকটেও যে এই কাব্য বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছিল, একথা বৃন্দাবনদাস একাধিকবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কৃত্তিবাস স্বীয় কাব্যে যে আত্মবিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এই—কৃত্তিবাসের এক পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি করেন। ইঁহার এক পৌত্র মুরারি ওঝা। মুরারির সাত পুত্র, তাহার মধ্যে একজন বনমালী। এই বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী, পাঠান্তরে মানিকী। ইঁহারা ছয় ভাই ছিলেন, আর ছিল এক বৈমাত্র ভগিনী। কৃত্তিবাসের জন্ম হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবারে। বার বৎসর বয়সের সময়ে কৃত্তিবাস উত্তরদেশে বড়গঙ্গা- বা পদ্মা-পারে পড়িতে যান। সেখানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গেলেন বাঙ্গালা দেশের রাজধানী গৌড়ে। রাজার খাতির না পাইলে তখন যত বড় পণ্ডিত হউক না কেন, তেমন সমাদর হইত না। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজবাড়ীতে গিয়া সাতটি শ্লোক রচনা করিয়া দ্বারীর হস্তে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন মাঘ মাস, গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র লইয়া প্রাসাদের ভিতরে প্রাঙ্গণে রৌদ্র পোহাইতেছেন। রাজা শ্লোক পাইয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কৃত্তিবাসকে নিকটে আনাইলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃত্তিবাস তৎক্ষণাৎ সাতটি শ্লোক পড়িয়া রাজাকে অভিবাদন ও আশীর্বাদ করিলেন। কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে পুষ্পমাল্য ও পাটের পাছড়া দানে সংবর্দ্ধিত করিলেন। সভাসদেরা কৃত্তিবাসকে অনুরোধ করিলেন রাজার নিকট মোটা রকম কিছু পুরস্কার চাহিতে। কৃত্তিবাস নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি রাজ-প্রতিগ্রহ করিবেন কেন? তিনি সগর্বে উত্তর করিলেন,

ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাক্রি লই,
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহি।

রাজপ্রসাদলব্ধ কৃত্তিবাসের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরে রামায়ণ-পাঁচালী লেখায় এই খ্যাতি দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

বাপ-মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ,
বাল্মীকি-প্রসাদে রচে রামায়ণ-গান।

কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, কিন্তু রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে এবং সভাসদ্‌গণের নাম হইতে বোঝা যায় যে, গৌড়ের সিংহাসনে তখন কোন হিন্দুভাবাপন্ন রাজা ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস বা গণেশ ও তৎপুত্র যদু ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর হন নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজা কংস বা গণেশের অথবা যদুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন— এই অনুমান অনেকে করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানো হইবার কথা। কিন্তু কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে লোকের মুখে মুখে ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া একেবারে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য ভেজালও যে কিছু কিছু না ঢুকিয়াছে, এমন নয়।

রাজা কংস বা গণেশের পুত্র যদু কোন বিশেষ কারণে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া জলালু-দ্‌-দীন মুহম্মদ শাহ্‌ নাম ধারণ করেন। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনিও হিন্দু কবি-পণ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় পরাঙ্মুখ হন নাই। যদুর অনুগৃহীত পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন রাঢীয় ব্রাহ্মণ মহীন্তাপনীয় বৃহস্পতি মিশ্র। ইনি বলিয়াছেন যে, "গৌড়াবনীবাসব" জলালু-দ্‌-দীনের নিকট হইতে তিনি পর পর এই সাতটি উপাধি পাইয়াছিলেন—আচার্য্য, কবিচক্রবর্ত্তী, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য্য, রাজপণ্ডিত, রায়মুকুটমণি। শেষের উপাধি দিবার সময়ে রাজা খুব ধূমধাম করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হাতীর উপর বসাইয়া কনক কলসীর জলে অভিষেক করাইয়া ঘোড়া, ছাতা, কুণ্ডল, হার, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি বহু রত্নালঙ্কার দেওয়া হইয়াছিল।

জলালু-দ্‌-দীনের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত গৌড়ের সুলতানদিগের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় বড় কিছু মেলে না। সে যুগে রাজকার্য্য প্রধানতঃ উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাজা ও সুলতানদিগের মত দরবারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও সাহিত্য- ও শাস্ত্র-চর্চার পোষকতা করিতেন। ইঁহারা কবি-পণ্ডিতগণের উৎসাহদাতা তো ছিলেনই, উপরন্তু নিজেরাও সুযোগ- ও যোগ্যতা-মত কাব্য রচনা করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষের দিকে এক রাজকর্ম্মচারী কবি গৌড়েশ্বরের সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু। মালাধর সুলতান

রুক্‌নু-দ্‌-দীন বার্‌বক শাহের নিকট "গুণরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন। রুক্‌নু-দ্‌-দীন বার্‌বক শাহের রাজ্যকাল ১৪৬০ হইতে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৩৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭৩ বা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মালাধর এক কৃষ্ণলীলা-কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন শ্রীমদ্‌ভাগবত হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে। দীর্ঘ সাত বৎসর পরে ১৪০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮০ বা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, সমাপ্ত হয়। যতদূর জানা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক প্রথম বাঙ্গালা কাব্য, এবং সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে সন-তারিখযুক্ত প্রথম গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় অতি সুললিত কাব্য। কবির ভক্ত-হৃদয়ের পরিচয় কাব্যের মধ্যে উজ্‌জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে। কবির পুত্র সত্যরাজ খান যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথমবার মিলিত হন, তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহার পিতার রচিত কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

রুক্‌নু-দ্‌-দীনের পর শম্‌সু-দ্‌-দীন য়ুসুফ শাহ্‌ গৌড়ের সুলতান হন। ইঁহার রাজ্যকাল ১৪৭৪ হইতে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। য়ুসুফ শাহের পর বারো বৎসর কাল ধরিয়া গৌড়-সিংহাসনে দ্রুত রাজপরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। ফলে দেশেও শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। শেষে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ হোসেন খান নামক জনৈক নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী স্বীয় অসাধারণ যোগ্যতার বলে ক্ষমতাপন্ন হইয়া অবশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। সুলতান হইয়া ইনি সয়্যিদ 'অলাউ-দ্‌-দীন হুসৈন মুজফফর শাহ্‌ শরীফ্‌-ই-মক্কী নাম গ্রহণ করেন। সুলতানদিগের মধ্যে হোসেন শাহ্‌ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার রাজ্য-কালে, ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক চরিত্র বাঙ্গালা দেশে এবং আর্য্যাবর্ত্তের স্থানে স্থানে অভূতপূর্ব জাগরণ আনিয়া দেয়।

৪

মৈথিল সাহিত্য ও বিদ্যাপতি

পাল- ও সেন-বংশের রাজ্যকালে তীরভুক্তি বা মিথিলা সংস্কৃতিতে এবং সাহিত্য-চর্চায় বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। বাঙ্গালা এবং মৈথিলী উভয় ভাষাই মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দুই ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার যে কোন দুই উপভাষার পার্থক্য হইতে অধিক ছিল না। বাঙ্গালা এবং মৈথিল উভয় ভাষাতেই কৃষ্ণলীলাত্মক এবং আধ্যাত্মিক গান লইয়া সাহিত্যের পত্তন হইয়াছিল। আর, উভয় সাহিত্যেরই প্রাচীনতম আদর্শ ছিল জয়দেবের পদ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কীদিগের দ্বারা বিজিত হইয়া বাঙ্গালা তীরভুক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মধ্যে মধ্যে মুসলমান শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও পরে প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া মিথিলা দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই কারণে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও মিথিলার সাহিত্যচর্চার নিদর্শন মিলিতেছে। অথচ বাঙ্গালা দেশে সমকালীন কোন রচনার সন্ধান অদ্যাপি মিলে নাই।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ বাঙ্গালা দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু মিথিলায় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমে রচিত পদ অনেক-গুলি পাওয়া গিয়াছে এবং ভাঙ্গা গদ্যে লেখা একটি বইও পাওয়া গিয়াছে।

মিথিলার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরসিংহ (হরিসিংহ বা হরিহরসিংহ) দেবের মন্ত্রী উমাপতি উপাধ্যায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পারিজাতহরণ নামে একটি নাটক রচনা করেন। ইহাতে একুশটি মৈথিলী পদ আছে। সে পদগুলির ভনিতায় উমাপতির নাম আছে। কয়েকটি পদের ভনিতায় কবি রাজার ও রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়াছেন। হরিহরসিংহ দেব দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসু-দ্-দীন তুঘলকের (১৩২০-২৪) সহিত যুদ্ধ করিয়া মিথিলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া "হিন্দুপতি" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কয়েকটি পদে উমাপতি ইঁহাকে "হিন্দুপতি" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। উমাপতির কতকগুলি পদ এখনকার দিনে বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে।

হরসিংহ দেবের অপর এক সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন জ্যোতিরীশ্বর। ইঁহার উপাধি ছিল কবিশেখরাচার্য্য। ইনি সংস্কৃতে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রহসন, নাম ধূর্ত্তসমাগম। জ্যোতিরীশ্বর মাতৃভাষায় গদ্যেও একখানি বই লেখেন। বইটির নাম বর্ণরত্নাকর। আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য ভাষায় রচিত অন্যতর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ বলিয়া বইটির যথেষ্ট মূল্য আছে। বর্ণরত্নাকর হইতেছে কবিদিগের ও কথকদিগের কড়চা বই। ইহাতে নগর, বাজার, রাজসভা, নায়ক, নায়িকা, প্রভাত, সন্ধ্যা ইত্যাদির মামুলি বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে বাক্য ছড়ার মত ছন্দোময়।

মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। ইনি একাধিক ব্রাহ্মণবংশীয় তীরভুক্তিরাজের সভায় থাকিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদের ভনিতায় শিবসিংহ দেবের নাম দেখা যায়। ইঁহার রাজ্যকালেই বিদ্যাপতির প্রতিভা উজ্জ্বলতম রূপ ধারণ করিয়াছিল।

বিদ্যাপতি সংস্কৃতভাষায় কতকগুলি স্মৃতি- ও ব্যবহার-গ্রন্থ রচনা এবং সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ভূপরিক্রমা,

লিখনাবলী, গঙ্গাবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও পুরুষপরীক্ষা। পুরুষপরীক্ষা বইটির বাঙ্গালা দেশে খুব চলন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বইটি বাঙ্গালা গদ্যে অনুদিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির দুইখানি বই অবহট্‌ঠ বা অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হইয়াছিল। বই দুইখানির নাম কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তিপতাকা। কীর্ত্তিলতা ঐতিহাসিক কাব্য। কবির প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক ভ্রাতৃদ্বয় কীর্ত্তিসিংহ এবং বীরসিংহের পিতা অসলান নামক এক তুর্কী শাসনকর্ত্তার হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। জৌনপুরের অধিপতি ইব্রাহিম শাহের সহায়তায় অসলানকে তাঁহারা পরাভূত করেন। ইহাই কীর্ত্তিলতার বর্ণনীয় বিষয়। শিবসিংহ দেবের পিতা দেবসিংহ দেবের রাজ্যকালে বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষাতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদে শিবসিংহ দেবের নাম আছে। শিবসিংহের সহিত প্রায়ই তাঁহার মহিষী লখিমা বা লছিমা দেবীর নাম পাওয়া যায়। ক্বচিৎ অন্য রাণীর নাম দেখা যায়। রাজপরিবারের বহু ব্যক্তির এবং একাধিক মন্ত্রীর এবং তাঁহাদের পত্নীর নাম কতকগুলি পদে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবির খ্যাতি যে তখন বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ।

বিদ্যাপতির কবিতা অলঙ্কারময় ও চিত্রবহুল। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার কাব্য সংস্কৃতানুসারী। অনেক সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা হইতে বিদ্যাপতি ভাব ও ভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ণনা সংযত এবং বর্ণাঢ্য হওয়ায় বিদ্যাপতির অঙ্কিত কিশোরী এবং অচিরযুবতী রাধার চিত্র যেমন সুপরিস্ফুট হইয়াছে এমন আর কোনও পদকর্ত্তার কাব্যে দেখা যায় না। মৈথিল ভাষার হ্রস্বদীর্ঘবহুল ধ্বনি এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বিদ্যাপতির পদগুলিকে বিচিত্রভাবে ঝঙ্কৃত করিয়াছে।

বিদ্যাপতির এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল কবির পদ বাঙ্গালা দেশে ও বৃহত্তর বাঙ্গালা দেশে, অর্থাৎ আসামে এবং উড়িষ্যায়, এক নূতন কাব্য-ভাষা ব্রজবুলির এবং তদাশ্রিত পদাবলী-সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে, প্রায় একই সময়ে, বাঙ্গালা দেশে, আসামে এবং উড়িষ্যায় মৈথিল পদের অনুকরণে ব্রজবুলি পদ-রচনার সূত্রপাত হয়। ব্রজবুলি ভাষার উৎপত্তির কথা পরে বলিতেছি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বহু বাঙ্গালী পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির অনুসরণে ব্রজবুলি পদ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। হোসেন শাহের এক কর্ম্মচারী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি-ভনিতায়ও কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি হোসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহের সভাতেও বর্ত্তমান ছিলেন, কেননা ইঁহার কয়েকটি পদের ভনিতায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদের

তুলনায় কবিরঞ্জনের পদ নিকৃষ্ট ছিল না, সেই জন্য লোকে ইঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিত। বিদ্যাপতি এবং কবিরঞ্জন ভনিতাযুক্ত যে-সকল পদে হোসেন শাহের অথবা নুসরৎ শাহের উল্লেখ আছে সেগুলি ইঁহারই রচনা। এই বিদ্যাপতি বাঙ্গালাতেও পদ রচনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আর যে সকল কবি ব্রজবুলি পদ-রচনায় বিদ্যাপতির সমান দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন কবিশেখর, কবিবল্লভ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ।

বিদ্যাপতির পদ মিথিলায় বেশী প্রচলিত ছিল না, বাঙ্গালা দেশে বহুদিন হইতেই বিদ্যাপতির পদ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব পদকর্ত্তা এবং কীর্ত্তনিয়াদের কৃপায় এই প্রাচীন মৈথিল কবির পদগুলি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদগুলি পাওয়া গিয়াছে। মিথিলায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা একশতও নহে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিদ্যাপতির পদগুলির প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে বিদ্যাপতির পদাবলীর একাধিক সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সঙ্কলন-গুলির মূল্য কম নয়। তবু একথা বলিতেই হইবে যে, এই সঙ্কলন-কর্ত্তারা অবিবেচনাপূর্বক কবিশেখর, কবিরঞ্জন এবং কবিবল্লভ এই নামগুলি বিদ্যাপতিরই উপাধিভেদ মনে করিয়া ইঁহাদের যাবতীয় ব্রজবুলি পদ বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত দুই-একটি পদে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন বর্ণনা করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাসের সময় ঠিক জানা নাই। তাহা ছাড়া দ্বিতীয় বিদ্যাপতি এবং দ্বিতীয় চণ্ডীদাসও ছিলেন। এবং পদগুলি প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, পদগুলির কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, অর্বাচীন বিদ্যাপতি এবং অর্বাচীন চণ্ডীদাসের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল।

৫

আসামে ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলি পদাবলী ও পাঁচালী কাব্য

বাঙ্গালা দেশে যেমন আসামেও তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ব্রজবুলি ভাষায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদরচনার প্রথা প্রবর্তিত হয়। সে সময়ে অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায় নাই। সে সময়ে উত্তরপূর্ব বঙ্গে যে উপভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাই ছিল আসাম অঞ্চলেরও ভাষা।

সুতরাং এই হিসাবে প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহিরে পড়ে না।

আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারে ইঁহার মৃত্যু হয়। শঙ্করদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অবলম্বনে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্লোক এবং ব্রজবুলি-পদ-সংবলিত কৃষ্ণ-চরিত্র ও রাম-চরিত্র অবলম্বনে কয়েকটি "নাট" বা যাত্রা-পালাও লিখিয়াছিলেন। এই পালাগুলি এখনও নৃত্যগীত-সহযোগে অভিনীত হইয়া থাকে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজের উৎসাহে শঙ্করদেব রামবিজয়-নাট রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন।

রামক পরম ভকতি-রস-জানা,
শ্রীশুক্লধ্বজ নৃপতি-প্রধানা,
রামবিজয় যো করাওত নাট,
মিলহু তাক বৈকুণ্ঠক বাট।

রুক্মিণীহরণ এবং কেলিগোপাল এই দুই নাট রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল রাম-রায়ের উদ্যোগে। ইনি সম্ভবত কোচবিহারের কোন সামন্ত ছিলেন। পারিজাতহরণ নাটের শেষ পদে কবির অন্যতর পৃষ্ঠপোষক জগদানন্দ দলপতির নাম আছে।

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য ও সহযোগী মাধবদেবও বহু কৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনা করিয়াছিলেন। মাধবদেবের প্রধান শিষ্য "দীন" গোপালদেবও গুরুর পথ অবলম্বন করিয়া পদরচনা করিয়াছিলেন।

আসাম অঞ্চলের প্রথম রামায়ণ পাঁচালীর লেখক হইতেছেন মাধব কন্দলী। "শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজার অনুরোধে" ইনি ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। উত্তর কাণ্ড লিখিয়াছিলেন শঙ্করদেব।

বনপর্ব্ব পাঁচালী লিখিয়াছিলেন রাম সরস্বতী রাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতার পৃষ্ঠপোষকতায়। শুক্লধ্বজের বদান্যতার বিষয়ে কবি লিখিতেছেন,

তেঁহে মোক বুলিলন্ত মহা হর্ষ-মনে,
ভারত পয়ার তুমি করিয়ো যতনে।
আমার ঘরত আছে ভারত প্রশস্ত,
নিয়োক আপন গৃহে দিলোহোঁ সমস্ত।
এহা বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই,
পঠাইল পুস্তক আমাসাক ঠাই।
খাইবার সকল দ্রব্য দিলন্ত অপার,
দাস দাসী দিলা নাম করাইলা আমার।

রাম সরস্বতীর আসল নাম ছিল অনিরুদ্ধ।

প্রাচীন কালে বাঙ্গালা দেশের, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের, সহিত উড়িষ্যার যোগাযোগ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। প্রতিবৎসর স্নানযাত্রা, রথযাত্রা এবং অন্যান্য পর্ব উপলক্ষে বহু বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী নীলাচলে যাইত। গৌড় হইতে বরাবর সোজা রাস্তা ছিল দক্ষিণমুখে নীলাচল পর্য্যন্ত। বাঙ্গালা দেশের সহিত খবরাখবরের এবং গতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল বলিয়াই শ্রীচৈতন্য মাতার অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি উড়িষ্যায় হিন্দুস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই কারণেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসীরা তখন নীলাচল-বাস স্বীকার করিতেন।

বাঙ্গালা দেশ হইতেই ব্রজবুলি পদরচনার ধারা উড়িষ্যায় প্রচলিত হইয়াছিল। উড়িষ্যায় রচিত প্রাচীনতম পদটির কবি হইতেছেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্ত রামানন্দ রায়। "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি রামানন্দ রায়ের পদটি চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত আছে। রামানন্দ সংস্কৃত ভাষায় একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন, নাম জগন্নাথবল্লভনাটক। ইহাতে জয়দেবের ধরণে কয়েকটি সংস্কৃত পদ আছে। নাটকটি নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে অভিনীত হইত। শ্রীচৈতন্য এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যায় লেখা প্রথম পাঁচালী কাব্য হইতেছে জগন্নাথ দাসের ভাগবত। মেদিনীপুর-বাঁকুড়া সীমান্ত ছাড়াইয়াও কাব্যটির প্রসার হইয়াছিল। জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন।

৬

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ—হোসেন শাহী আমল

হোসেন শাহের রাজ্যলাভের পর দেশে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্যা- ও সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহের সঞ্চার হইল। গৌড়-দরবারের অধিকাংশ উচ্চ হিন্দু কর্ম্মচারী শাস্ত্র-চর্চা ও কাব্য-আলোচনা করিতেন। সে সময়ের দুইজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মনীষী সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই ভাই পরে সংসার ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সনাতন ও রূপ গোস্বামী নামে প্রথিত হন। রূপ গোস্বামী একজন বড় কবি ছিলেন। ইঁহাদের কথা পরে শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গে বলিতেছি। সনাতন ও রূপ যখন গৌড়-দরবারে কাজ করিতেন তখন তাঁহাদের বাসস্থান ছিল গৌড়ের সন্নিকটে রামকেলী গ্রামে। সে-কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল রামকেলী।

শ্রীমদ্‌ভাগবতাশ্রিত বৈষ্ণব-মত প্রধানত এইস্থান হইতেই বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য ও পদরচনার রীতি এই স্থানে চলিয়া আসিয়াছিল সেন-রাজগণের সময় হইতে। "ভাগীরথীপরিসরে" "বহুশিষ্টজুষ্টে" এই "শ্রীরামকেলিনগরে" থাকিয়া করঞ্জগ্রামীণ চতুর্ভুজ কবি 'হরিচরিত' নামে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। সে ১৪১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। হরিচরিতের ছন্দে অপভ্রংশ কাব্যরীতির ছাপ আছে। হোসেন শাহের অপর এক কর্ম্মচারী শ্রীখণ্ড-নিবাসী বৈদ্য যশোরাজ খান কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একটি বাঙ্গালা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের একটি পদের ভনিতায় কবি সগৌরবে হোসেন শাহের নাম করিয়াছেন। হোসেন শাহের আর এক কর্ম্মচারী কবিরঞ্জন গীতিকবিতা লিখিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি "বিদ্যাপতি" ভনিতায় অনেক উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি পদের ভনিতায় হোসেন শাহ এবং তৎপুত্র নুসরৎ শাহের নাম আছে। রূপ গোস্বামীর 'উদ্ধবসন্দেশ' কাব্য এবং সংস্কৃত পদগুলি এইখানেই লেখা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি।

যে কারণেই হোক, সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হোসেন শাহের বিক্রম ও যশ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে হোসেন শাহের সপ্রশংস উল্লেখ রহিয়াছে।

হোসেন শাহের এক সেনাপতি ("লস্কর") ত্রিপুরা জয় করিয়া চাটিগ্রাম অঞ্চলে জাগীর প্রাপ্ত হন এবং তথায় শাসনকর্ত্তারূপে বসতি করেন। ইঁহার নাম বা উপাধি পরাগল খান। ইনি স্বীয় সভাসদ কবীন্দ্র পরমেশ্বরের দ্বারা বাঙ্গালায় "ভারত-পাঁচালী" অর্থাৎ মহাভারত কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন। কাব্যটির নাম 'পাণ্ডববিজয়' বা 'বিজয়পাণ্ডবকথা'। লস্কর পরাগল খান মহাভারত-কথায় এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে, কবীন্দ্রের কাব্য তাঁহার সভায় প্রত্যহ পঠিত হইত। এইটিই বাঙ্গালায় রচিত সর্বপ্রাচীন মহাভারত কাব্য। কোন কোন পুঁথিতে কবির পুরা নাম পাওয়া যায় পরমেশ্বর দাস। আবার কোন কোন পুঁথিতে শুধু কবীন্দ্র উপাধি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। কবীন্দ্রের কাব্য ১৪২৫ হইতে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে।

পরাগল হিন্দু-বংশোদ্ভূত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই অনুমানের এক হেতু হইতেছে মহাভারত-শ্রবণে অনুরক্তি। দ্বিতীয় হেতু একটি পুঁথিতে প্রাপ্ত পরিচয়—

> রুদ্র-বংশ রত্নাকর তাতে জন্মে সুধাকর
> লস্কর পরাগল খান।

"খান" উপাধি তখন হিন্দু কর্ম্মচারীরাও পাইতেন।

পরাগল খানের পুত্র—যিনি "ছুটি খান" অর্থাৎ ছোট খাঁ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন—সেই নসরৎ খানও ভারত-পাঁচালীর মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। ছুটি খান কবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈমিনি ভারতের বিস্তৃততর অশ্বমেধ-পর্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কবীন্দ্রের কাব্যে সকল পর্বের কথাই খুব সংক্ষেপে দেওয়া আছে। অশ্বমেধ-পর্বের গল্প ছুটি খানের খুব ভাল লাগিত বলিয়া তিনি বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। ছুটি খান হোসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহের সেনাপতি ছিলেন। সুতরাং শ্রীকর নন্দীর কাব্য নুসরৎ শাহের রাজ্য-কালে—অর্থাৎ ১৫১৮ হইতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে, সম্ভবতঃ শেষের দিকেই—রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি।

হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহ্ও বাঙ্গালা কাব্যের সমাদর করিতেন। ইঁহার পৈতৃক কর্ম্মচারী শ্রীখণ্ডনিবাসী কবিরঞ্জন তখনকার সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। বিদ্যাপতির ধরণে ইনি অনেক ভাল ভাল পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকেই "ছোট বিদ্যাপতি" বলিত।

নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহের পুত্র অলাউ-দ্-দীন ফীরূজ শাহ্ পিতা এবং পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পোষকতা করিতেন। কবি শ্রীধর ইঁহারই আদেশে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ফীরূজ শাহ্ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। কাব্যটি যখন লেখা হয় তখনও তিনি সুলতান হন নাই। সুতরাং শ্রীধরের কাব্যের রচনাকাল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই হইবে।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব—হোসেন-শাহী আমলেই ঘটিয়াছিল। সে কথা পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

৭
মনসামঙ্গল পাঁচালী

বাঙ্গালা দেশে সর্পদেবতা মনসা দেবীর পূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তবে মনসা-পূজার সমাদর নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই বেশী ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে উচ্চবর্ণের লোকেরা মনসাদেবীকে বিশেষ আমল দিতেন বলিয়া বোধ হয় না। মনসা-পূজার সময়ে মনসাদেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপক গীত বা পাঁচালী গাওয়া হইত। বাঙ্গালা দেশ হইতে এই কাহিনী-গীতি মিথিলা ও বিহার হইয়া কাশীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চল অবধি পৌঁছাইয়াছিল। এই পাঁচালীর কাহিনী কোন পুরাণে নাই, ইহা বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব গল্প। এই গল্প সব মনসামঙ্গল কাব্যে একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

শিবের কন্যা মনসা অস্থানে ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পক্ষণ মধ্যে দৈহিক বৃদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ণ বয়স্ক নারী হইয়া উঠিলেন এবং সর্পদিগের আধিপত্য লাভ করিলেন। শিব তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে শিবগৃহিণী চণ্ডী ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। ফলে মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর হাতাহাতির ফলে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। চণ্ডীর উপর নিদারুণ ক্রোধ লইয়া মনসা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল। জরৎকারুর ঔরসে মনসার গর্ভে আস্তীকের জন্ম হইল।

জনমেজয়ের পিতা সম্রাট্ পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে দেহত্যাগ করেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয় সর্পসত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, কেন না এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জগতের সমস্ত সর্প বিনষ্ট হইবে। সর্পেরা বিপদ্ বুঝিয়া মনসার শরণ লইল। মনসা আস্তীককে জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আস্তীক বুঝাইয়া শুঝাইয়া জনমেজয়কে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কতক সাপ রক্ষা পাইয়া গেল। গল্পের এই পর্য্যন্ত হইতেছে মহাভারতে উল্লিখিত পৌরাণিক কাহিনী।

এদিকে চণ্ডীর নিকট মনসা যে অপমান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না। উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার একমাত্র পন্থা হইতেছে শিবের ও চণ্ডীর ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভক্তদিগের নিকট হইতে পূজা আদায়। তাহার পূর্বে আবশ্যক সাধারণ লোকসমাজে মনসার পূজা প্রচার করা। মনসা প্রথমে এই কাজে মন দিলেন। ইহাতে তাঁহার পরম সহায় হইলেন সহচরী নেত্রবতী বা নেতা। অল্প আয়াসেই মনসা ক্রমে ক্রমে রাখাল বালক, জালিয়া এবং দরিদ্র মুসলমানদিগের নিকট পূজা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাঁহার মন হইল যাহাতে সমাজের উচ্চস্তরে তাঁহার পূজা প্রচলিত হয়। সে সময়ে গন্ধবণিকেরা সমাজে বেশ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিল বণিক চন্দ্রধর বা চাঁদ বেনে। নেতা ছদ্মবেশে আসিয়া চাঁদের পত্নী সনকাকে মনসার পূজা শিখাইয়া দিলেন। একদিন স্ত্রীকে মনসা-পূজা করিতে দেখিয়া চাঁদ ক্রুদ্ধ হইল এবং পূজার দ্রব্যাদি সব লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিছুতেই চাঁদ বাগ মানিতেছে না দেখিয়া মনসা তাহাকে শাস্তি দিয়া বশে আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। চাঁদের ছয় পুত্র মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিল। মনসার কোপে সেই সাত পুত্র পণ্যদ্রব্য-সমেত নদীতে নিমগ্ন হইল। চাঁদ তাহাতেও দমিবার পাত্র নহে, তাহার "মহাজ্ঞান" আছে। মহাজ্ঞানের বলে চাঁদ সাত পুত্রকে বাঁচাইল। মনসা তখন হীন ছলনা করিয়া চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করিয়া লইলেন। তখন আর চাঁদ তাহার ছয় পুত্র ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিল না। নিঃস্ব, কৌপীনমাত্রসম্বল হইয়া চাঁদ বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্ধর বা লক্ষ্মীন্দ্র

("লখিন্দর") বড় হইয়াছে। খুব ধুমধাম করিয়া বিহুলা বা বেহুলার সহিত লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ হইল। চাঁদ বেনের অশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও লৌহনির্ম্মিত অচ্ছিদ্র বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। চাঁদ বেনের এখন সত্যসত্যই সর্বনাশ হইল।

বিহুলা বয়সে বালিকা হইলেও বুদ্ধি, ধৈর্য্য এবং সতীত্ব-গুণে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অপেক্ষাও তেজীয়সী ছিল। সে মনে মনে সংকল্প করিল, প্রাণ যায় যাউক, স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে। সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিতে নাই। সাধারণত দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। বিহুলা একটি ছোট ভেলার উপর স্বামীর মৃতদেহ লইয়া উঠিল এবং গ্রাম-পার্শ্বস্থ নদীর স্রোতের মুখে ভেলা ভাসাইয়া দিল। আত্মপরিজন কাহারও প্রবোধ ও নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত করিল না। শাখানদীর স্রোত বাহিয়া ভেলা গঙ্গার দিকে চলিল। পথে নানা প্রলোভন ও ভীতি বিহুলাকে টলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিহুলার মন রহিল অটল।

ত্রিবেণীর নিকটে গঙ্গা-সঙ্গমে পড়িয়া বিহুলা একটি অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। এক ধোপানী শিশুসন্তান লইয়া কাপড় কাচিতে আসিয়াছে। সে প্রথমে তাহার ছেলেকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া তাহার পর কাপড় কাচিতে লাগিল। আর, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিবার পূর্বে ছেলেটিকে পুনর্জীবিত করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া বিহুলা ভাবিল যে, এ মেয়ে ত সামান্য নহে; ইহার সাহায্যেই হয়ত তাহার স্বামীর পুনরুজ্জীবন হইবে। পরদিন ধোপানী আসিলে বিহুলা বিনীতভাবে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার হইয়া কিছু কাপড় কাচিয়া দিল। পরিচয়ে জানিতে পারিল যে, এই ধোপানী স্বর্গের দেবতাদিগের কাপড় কাচেন, ইঁহারই নাম নেত্রবতী বা নেতা; ইনি মনসার সহচরীও বটেন। নেতা বিহুলার উপর খুশী হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে রাজী হইল। বিহুলা নেতার সহিত স্বর্গে গেল, এবং সেখানে সঙ্গীত-নৃত্যে দক্ষতা দেখাইয়া দেবতাগণকে পরম পরিতুষ্ট করিল। দেবতারা বিহুলার দুঃখের কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু তাঁহাদের তো হাত নাই। অবশেষে তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং বিহুলার কাতরোক্তিতে মনসার ক্রোধ প্রশমিত হইল। বিহুলা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক শ্বশুরকে দিয়া মনসার পূজা করাইবে। মনসা লক্ষ্মীন্দরের অস্থি-অবশিষ্ট দেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং ওদিকে পণ্যসম্ভার-সমেত চাঁদের বড় ছয় ছেলেকেও বাঁচাইয়া দিলেন। বিহুলা ও লক্ষ্মীন্দর দেশে প্রত্যাগমন করিল। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে আত্মীয়-পরিজনের সহিত মৃত্যুকবল হইতে প্রত্যাগত লক্ষ্মীন্দর এবং নারীরত্ন বিহুলার মিলন হইল। মনসার পূজা করিতে এখন আর চাঁদ বেনের কোন আপত্তি রহিল না।

মনসার গীত পূর্বাবধি প্রচলিত থাকিলেও, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বেকার লেখা কোন মনসামঙ্গল-কাব্য পাওয়া যায় নাই। বিজয়গুপ্তের কাব্য প্রাচীনতম মনসামঙ্গল বলিয়া সাধারণত গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কাব্যটির কোন পুরানো পুঁথি পাওয়া যায় নাই। নিতান্ত অর্বাচীন পুঁথি আধুনিক গায়নদের খাতা ও মুখে শোনা গান অবলম্বনে বিজয়গুপ্তের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত কাব্যে বহু কবি ও গায়নের রচনা আছে। কোন কোন অর্বাচীন পুঁথিতে যে রচনাকাল পাওয়া যায় তাহাতে হোসেন শাহের উল্লেখের সঙ্গতি থাকে না। কেবল একটি পুথির পাঠে এই সঙ্গতি পাওয়া যায়,

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক,
স্থলতান হোসেন শাহা নৃপতি তিলক।

কিন্তু এই পাঠের যথার্থতায় সন্দেহের অবকাশ আছে। মোট কথা এই নিতান্ত সন্দিগ্ধ পাঠের উপরই বিজয়গুপ্তের প্রাচীনত্ব নির্ভর করিতেছে। বরিশাল জেলার ফুলশ্রী (এখন গৈলা) গ্রামের এক বৈদ্যঘরে বিজয়গুপ্তের জন্ম হয়। কবির পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। কোন এক শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা-পঞ্চমীর রাত্রে কবি স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী মনসা তাঁহাকে মনসা-মঙ্গল পাঁচালী রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে কাব্যটি রচিত হয়।

অসন্দিগ্ধভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা হইতেছে বিপ্রদাসের কাব্য। ১৪১৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসাবিজয়-কাব্যের পত্তন করেন।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ,
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।

বিপ্রদাসের নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তর-পূর্বাংশে বসিরহাট মহকুমায় নাদুড়্যা-বটগ্রামে। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা তিন চারি ভাই ছিলেন। বিপ্রদাসও স্বপ্নে মনসাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।

কাব্য হিসাবে বিপ্রদাসের রচনা উচ্চশ্রেণীর নহে। তবে ইহাতে ঐতিহাসিকের পক্ষে অনেক মূল্যবান্ তথ্য নিহিত আছে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে পূর্ববর্তী কবি "কানা" হরিদত্তের উল্লেখ আছে। এক "বৈদ্য" হরিদত্তের মনসামঙ্গলের একাধিক খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই বৈদ্য হরিদত্তই বোধ হয় "কানা" হরিদত্ত। নারায়ণ দেবের মত হরিদত্তও তাঁহার কাব্যের উপক্রমে হরগৌরীর কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হরি-দত্তের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা যায় না।

৮

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্য

চণ্ডীদাস-ভনিতায় বহু বৈষ্ণব পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে প্রচলিত আছে। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুরানো পুঁথিতে অন্য কবির নামে পাওয়া যায়। পদগুলির মূল্যও একরকম নহে; কতকগুলি খুবই উৎকৃষ্ট, আবার কতকগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতি বাজে কবির রচনা। ইহা হইতে সাধারণ ধারণা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদগুলি এক ব্যক্তির এবং এক সময়ের রচনা নহে।

এই ধারণা যে অযথার্থ নহে, তাহার প্রমাণ মিলিল ১৩১৬ সালে। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় পুরানো পুঁথির খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে এক ভদ্র গৃহস্থের গোশালার মাচায় কতকগুলি পুঁথি পান, তাহার মধ্যে একটি পুঁথি দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, এত প্রাচীন পুঁথি তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই। পুঁথি পড়িয়া তিনি দেখিলেন যে, এটি একটি অজ্ঞাতপূর্ব কৃষ্ণ-লীলাত্মক কাব্য। ইহার রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যের ভাষা অত্যন্ত পুরানো ধরণের, এবং গল্পেও অনেক নূতনত্ব আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুঁথিটি খণ্ডিত; গোড়ার একখানি এবং মধ্যের ও শেষের কয়েকখানি পাতা নাই। প্রথম ও শেষের পাতা না থাকায় কাব্যের নাম কি ছিল তাহাও জানা গেল না।

১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে কাব্যটি প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইবামাত্র পণ্ডিত এবং সাহিত্যরসিক-সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এত প্রাচীন ভাষা, বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাড়া, অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। এত প্রাচীন ধরণের লেখা বাঙ্গালা পুঁথিও ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই। কাব্যের গল্পাংশে ও বর্ণনাতেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এতদিনে চণ্ডীদাসের মূল কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যামোদিগণ পুলকিত হইলেন; বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনা করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান মিলিল বলিয়া ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কিছু বিতণ্ডারও যে সৃষ্টি হইল না এমন নয়। এই বিতণ্ডা আজিও সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই। যাঁহারা এখনকার দিনে আধুনিক ভাষায় চণ্ডীদাসের পদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা বলিলেন, এই বিকট ভাষায় লেখা পদ চণ্ডীদাসের হইতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য এখনকার বিচারে স্থানে স্থানে রুচি-বিগর্হিত বলিয়া বোধ হয়। এই সূত্র ধরিয়া আবার অনেকে বলিলেন, এ

কাব্য নিতান্ত গ্রাম্য; শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের যে পদ আস্বাদন করিতেন সে পদ ঐ কবির রচনা হইতেই পারে না।

কিন্তু এই চণ্ডীদাসই যে "চণ্ডীদাস" ভণিতার শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা হওয়া সম্ভব, তাহার একটি অবান্তর প্রমাণ পাওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি ভাল পদ রূপান্তরিত ভাষায় প্রচলিত কীর্ত্তন-পদাবলীর মধ্যে ধরা পড়িল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য অজ্ঞাত ছিল না, তাহারও প্রমাণ মিলিতে বিলম্ব হইল না। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পারিষদ সনাতন গোস্বামী রচিত ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী সঙ্কলিত বৈষ্ণবতোষণী নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় একস্থানে চণ্ডীদাস-বর্ণিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড-লীলার উল্লেখ রহিয়াছে; এই দুই লীলা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবতোষণীর রচনা ও সঙ্কলন যথাক্রমে ১৫৫৪ ও ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, কবির নাম অথবা উপাধি ছিল বড়ু চণ্ডীদাস, আর ইনি ছিলেন দেবী বাসলীর ভক্তসেবক। কয়েকটি পদের শেষে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" এই ভনিতা আছে। এখানে "অনন্ত" এই নামটি লিপিকরের অথবা গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই অনুমান হয়। চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথা ও গালগল্প প্রচলিত আছে। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে ইঁহার জন্মস্থান ছিল বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম। আধুনিক প্রবাদের মতে, ইনি ছিলেন বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। প্রবাদে আরও বলে যে, ইঁহার এক রজকজাতীয়া সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। এই মহিলার নাম-সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে ঐকমত্য নাই;—এক মতে ইঁহার নাম ছিল তারা, অপর মতে রামতারা এবং তৃতীয় মতে রামী। এই সব প্রবাদ আংশিকভাবেও সত্য কিনা, তাহা যাচাইয়া লইবার মত কোন উপাদান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কাব্যের রচনাকাল জানা নাই। তবে পুঁথির লেখা দেখিয়া প্রাচীনলিপিবিশারদেরা বলেন যে, পুঁথিটি আনুমানিক ১৪৫০ হইতে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। পুঁথিটিতে তিন হাতের লেখা আছে এবং ভুলভ্রান্তিও কিছু কিছু আছে। সুতরাং ইহা কবির নিজের লেখা মূল পুঁথি নিশ্চয়ই নহে। পুঁথিটি কবির সময়ে লিখিত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলেও কাব্যের রচনাকাল ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হয়। মনে হয়, কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে একমাত্র রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীই চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্ম ও গোকুলে আগমন, এবং কালিয়দমন—শুধু এই দুইটি বিষয় প্রচলিত পুরাণ হইতে লওয়া হইয়াছে। অপর লীলাকাহিনীগুলি

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশ ইত্যাদি কোন পুরাণে—যেখানে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে সেখানে নাই। তবে বাঙ্গালা দেশে যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লীলাকাহিনী বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

কাব্যটির মধ্যে কবিত্বের উচ্ছ্বাস বা অলঙ্কারবাহুল্য এসব বড় কিছুই না থাকিলেও বর্ণনায় জোর আর লালিত্য দুইই আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা যে খুব উঁচুদরের কবি ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় রাধার চরিত্র-বর্ণনা হইতে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বল ও জীবন্ত, এমনটি আর কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দেখা যায় নাই। কাব্যটিতে এখনকার রুচির হিসাবে কিছু কিছু গ্রাম্যতা-দোষ থাকিলেও ইহার রচয়িতা যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দী

৯

চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রভাব

শ্রীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে রাজ-সরকারের কোন না কোন বিভাগে চাকুরী করিতেন; ইঁহাদের দ্বারা সমাজে কিছু কিছু স্বেচ্ছাচার আমদানী হইতে লাগিল। ক্রমশ সাধারণ লোকের মধ্যেও আচার-বিচারে যথেষ্ট পরিমাণে শিথিলতা দেখা দিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেকে ভয়ে-ভক্তিতে, দায়ে পড়িয়া অথবা সমাজের ঔদাসীন্যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। যে শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্ম ও আচার-নিষ্ঠা অবিচলিত রহিয়া গেল, তাহা হইতেছে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সম্প্রদায়। ইঁহারা সাংসারিক হিসাবে দরিদ্র; লাভলোভ ইঁহাদের বড় কিছু ছিল না; সুতরাং রাজশক্তির আনুকূল্যের ভরসা ইঁহারা রাখিতেন না। কিন্তু ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যাচর্চার বিষয়ে ক্রমশ উদাসীন হইয়া পড়ায়, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংখ্যাও কমিয়া আসিতে লাগিল। সেন-বংশের সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণে হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নবদ্বীপ-অঞ্চল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের

প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া দাঁড়াইল এবং অনতিবিলম্বে বাঙ্গালা দেশের প্রধানতম বিদ্যাকেন্দ্র হইয়া উঠিল। বাঙ্গালা দেশের বলি কেন, এক বিষয়ে নবদ্বীপ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। তাহা হইতেছে নব্য ন্যায়শাস্ত্র। সূক্ষ্ম ন্যায়দর্শন-শাস্ত্রের চরম বিকাশ প্রধানত নবদ্বীপ অঞ্চলেই হইয়াছিল।

নবদ্বীপ সেকালে ছোট জায়গা ছিল না; বহু গ্রামের সমষ্টি লইয়া ইহা ছিল একটি বিরাট্ শহরের মত। কিছু দূরে শান্তিপুর, তাহাও পণ্ডিতপ্রধান স্থান ছিল। গঙ্গার উভয়তীর ধরিয়া আরও অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, সেগুলি নবদ্বীপের অবনতির পর হইতে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে।

নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় ১৫০৭ শকাব্দে—অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে—ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিনে। ইঁহার পিতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী। শ্রীচৈতন্যের নামকরণ হয় বিশ্বম্ভর, ডাক নাম ছিল নিমাই। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া আত্মীয়-স্বজনে তাঁহাকে গোরা বা গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। শ্রীচৈতন্যের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, বিশ্বরূপ। তিনি অল্পবয়সে গৃহ-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য অতিশয় চপল ও দুর্বিনীত ছিলেন, তথাপি পরিচিত অপরিচিত সকলেই এই দুর্ললিত সুন্দর শিশুটিকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হইল। অল্পবয়সেই শ্রীচৈতন্য ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পার-দর্শিতা লাভ করিয়া টোল খুলিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরে তিনি বঙ্গদেশে অর্থাৎ পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও প্রচুর প্রতিপত্তি লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিল। দ্বিতীয়বারে শ্রীচৈতন্য বিবাহ করিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে।

পিতৃকৃত্য করিতে গয়ায় গিয়া শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎলাভ করিলেন, এবং তথায় তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিল। তাঁহার উদ্ধত স্বভাব, পাণ্ডিত্যের গূঢ় গর্ব একেবারে দূর হইল; তিনি ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন। কিছু কাল পরে স্থৈর্য্য লাভ করিয়া তিনি কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ও হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া নবদ্বীপের তাবৎ লোক ভক্তিভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে ভক্তিপ্রচার-কার্য্যে তাঁহার দুই প্রধান সহায় হইলেন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস।

শ্রীচৈতন্য দেখিলেন যে, শুধু নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালার বাহিরেও এই ধর্ম্ম প্রচার

করা আবশ্যক, নতুবা বিভিন্ন আচার-ব্যবহারে এবং অনাচার-অধর্ম্মে আচ্ছন্ন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ জাতিগত ঐক্যলাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। উপরন্তু সমস্ত দেশ ম্লেচ্ছ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। লোকে সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যের নিকট ধর্ম্মের কথা সহজে শুনিতে চাহে না; সুতরাং শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণের মন অবিলম্বে হরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দেশে আর কেহ রহিল না।

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে দুই-চারি দিন থাকিয়া শ্রীচৈতন্য গঙ্গা-তীর-পথ ধরিয়া পুরীতে গেলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া তিনি দেশপর্য্যটনে ও তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন। প্রথম বারে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্রমণ করিলেন। দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাপথ ধরিয়া শান্তিপুর হইয়া গৌড়ে পৌঁছিলেন। সঙ্গে লোকসংঘট্ট হওয়াতে তিনি সেবার গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলী গ্রাম হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামকেলীতে হোসেন শাহের মন্ত্রী "সাকর-মল্লিক" সনাতন ও "দবীর-খাস" রূপ এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মিল; অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিলেন। তৃতীয় বারে শ্রীচৈতন্য ঝাড়িখণ্ড অর্থাৎ মানভূম-ছোটনাগপুরের অরণ্যময় পথে মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি প্রধান প্রধান তীর্থ পড়িল। প্রয়াগে দবীর-খাস রূপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ফিরিবার পথে কাশীতে সাকর-মল্লিক সনাতন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এইরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া শ্রীচৈতন্য সর্বজনীন ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এই প্রচার তিনি বক্তৃতা বা উপদেশ-বাণীর দ্বারা অথবা স্বর্গমোক্ষলাভ আদি প্রলোভন দেখাইয়া করেন নাই; তাঁহার অমল লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবেই লোকে তাঁহার আচরিত ধর্ম্ম সানন্দে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

তীর্থ-পর্য্যটন ও গমনাগমনে ছয় বৎসর অতীত হইল। জীবনের শেষ অষ্টাদশ বর্ষ শ্রীচৈতন্য পুরী ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তেরা আসিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইতেন। এই সময়ে নীলাচলে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিত। দিন দিন শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরপ্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষের কয় বৎসর তিনি একরকম বাহ্যজ্ঞানরহিত

হইয়া দিব্যোন্মাদে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। অন্তরঙ্গ অনুচর ও ভক্তেরা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক শ্লোক ও গান শুনাইয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া রাখিতেন। অবশেষে ১৪৫৫ শকাব্দে—অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে—আষাঢ় মাসে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব হয়। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা দেশে তাঁহার প্রভাব এতদূর ব্যাপক ও গভীর হইয়াছিল যে, জীবিতকালেই তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মপ্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন তাঁহার অনুচর ও ভক্তেরা। সেকালের নবদ্বীপ-অঞ্চলের এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানের অনেক উচচ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মনীষী তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অন্য সময়ে হইলে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেন।

শ্রীচৈতন্যের পারিষদদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ এবং হরিদাস। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতা ছিলেন শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজার মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত। অদ্বৈত আচার্য্য মহাপণ্ডিত এবং অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জননী শচী দেবী ইঁহার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে অদ্বৈত আচার্য্যের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরেও কয়েক বৎসর ইনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের বিস্তারের জন্য যাঁহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ—ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈত আচার্য্য এবং আরও দুই-চারি জন। শ্রীচৈতন্য আচার্য্যকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। আচার্য্যের দুই পত্নী, শ্রী দেবী ও সীতা দেবী। সীতা দেবী মহীয়সী মহিলা ছিলেন। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য্য। ইনি গৌরাঙ্গ-পূজারও প্রথম প্রবর্ত্তক। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ইঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার জন্ম হয় বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। শৈশব হইতেই নিত্যানন্দের ঈশ্বরানুরক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বাল্যাবস্থায় ইনি এক সন্ন্যাসীর সাহচর্য্যে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং অবধূত সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। একস্থানে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন ইনি পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পর্য্যটন-ক্রমে নিত্যানন্দ অবশেষে

বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীচৈতন্যের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্য দ্বিগুণ উৎসাহে হরিনাম ও ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারে মন দিলেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের সময়ে নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুরীতে আসিয়াও কিছুকাল ছিলেন। তাহার পর শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে তিনি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমী হইলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা দেবী ও জাহ্নবা দেবীর সহিত নিত্যানন্দের পরিণয় হয়। বসুধা দেবীর গর্ভে এক কন্যা গঙ্গা দেবী ও এক পুত্র বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের কিছুকাল পরে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভার্য্যা জাহ্নবা দেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র বাঙ্গালায় বৈষ্ণবসমাজের নেতা হন।

হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্যের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। যশোহর জেলায় বুঢ়ন গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি মুসলমান মাতাপিতার সন্তান; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইনি হিন্দুর সন্তান, তবে পিতৃহীন হইয়া মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এই জন্য মুসলমান বলিয়া পরিচিত হন। যৌবনকালেই ইনি ভক্তিধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ উদাসীন হইয়া দিবারাত্র হরিনাম জপ করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচরণ করিতে থাকায় মুসলমান-সম্প্রদায়ের অভিযোগক্রমে কাজী তাঁহাকে হিন্দুয়ানি ছাড়িতে আদেশ করে। হরিদাস তাহা গ্রাহ্য করেন না। তখন তাঁহার উপর অকথ্য নির্য্যাতন চলে; কিন্তু তাহাতেও বাহ্যজ্ঞানহীন হরিদাসের ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে হার মানিয়া কাজী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। হরিদাস গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় আসিয়া কুটীর বাঁধিলেন। এদিকে মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার নাম জাহির হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার কুটীরে ভিড় জমিতে লাগিল। অগত্যা হরিদাস সেখান হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গেলেন। সেখানে অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে পাইয়া পরম সমাদর করিয়া রাখিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যের সহিত হরিদাসের মিলন হইল। হরিদাস এবং নিত্যানন্দ এই দুইজনের উপর মহাপ্রভু নামপ্রচারের ভার দিলেন। ইঁহারা হার মানায়, শ্রীচৈতন্য নিজে প্রভাব বিস্তার করিয়া নবদ্বীপের কোটাল উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতৃদ্বয় জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেন। হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য যারপরনাই শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, সেই কারণে সন্ন্যাসের পর তিনি হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীলাচলে রাখিলেন। পুরীতে হরিদাসের দেহত্যাগ হইলে তিনি স্বহস্তে মৃতদেহ সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে থাকার সময়ে শ্রীচৈতন্যের অপরাপর প্রধান অনুচর ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার তিন ভাই, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত এবং আরও অনেকে।

নীলাচলে অবস্থানকালে তাঁহার প্রধান অনুচর ছিলেন স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ রায়—ইনি পূর্বে উড়িষ্যার রাজার তরফে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন, —গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দ পুরী এবং রঘুনাথ দাস।

রঘুনাথ দাস ছিলেন সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র এবং বংশের একমাত্র সন্তান। ইনি বাল্যে হরিদাসের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন। তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। গৃহ হইতে পলাইবার জন্য রঘুনাথ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্তু যে "চৈতন্যের বাতুল," তাঁহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে কে? এক রাত্রিতে প্রহরীর অলক্ষিতে তিনি পলাইলেন। শ্রীচৈতন্য তখন পুরীতে, এ সংবাদ রঘুনাথ অবগত ছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তিনি পুরী পৌঁছিলেন বার দিনে, পথে তিনদিন মাত্র ভোজন করিয়াছিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সংবাদ পাইয়া, তিনি গৃহে আর ফিরিবেন না জানিয়া পুরীতে ভৃত্য, পাচক ও উপযুক্ত অর্থ পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ সে সব কিছুই নিজের জন্য লইলেন না; আহার-বিহারে কঠোর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাঁহাকে নিজে কিছু উপদেশ দিয়া স্বরূপ-দামোদরের হস্তে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার ভার ন্যস্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্যের ও স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্দ্ধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে আসিয়া রাধাকুণ্ডতীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সনাতন ও রূপ গোস্বামী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের উপদেশ-মত বৃন্দাবনে বাস করিলেন। এখানে ইঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইঁহাদের প্রভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মথুরা-অঞ্চলে, পঞ্জাবে, রাজপুতনায়, এমন কি সিন্ধুদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। পাণ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় সনাতন গোস্বামীর সমকক্ষ তখন কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না—"রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।" ইনি আবার কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। সনাতন অত্যন্ত বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন, ইঁহার কুটীর তো ছিলই না, উপরন্তু এক-বৃক্ষতলে একাধিক রাত্রি যাপন

করিতেন না। অথচ পাণ্ডিত্য বা আধ্যাত্মিকতার গর্বের লেশমাত্র ইঁহার ছিল না। রূপ গোস্বামীও পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন বলা চলে। গৌড়ে থাকার সময়েই ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যগ্রহণ করিবার পর ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক তিনখানি নাটক, অনেকগুলি কাব্য ও গীতিকবিতা এবং বহু বৈষ্ণব শাস্ত্র ও প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার লেখা সবই সংস্কৃতে। রূপের ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি বই দুইখানি বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সনাতন এবং রূপ উভয়েই দীর্ঘজীবী ছিলেন। আনুমানিক ১৫৫৪ ও ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে সনাতন ও রূপের তিরোভাব হয়।

সনাতন ও রূপের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল বল্লভ, নামান্তর অনুপম। ইনি দীর্ঘায়ু হন নাই। ইঁহার পুত্র জীব জ্যেষ্ঠতাত রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনিও ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু দার্শনিক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর জীব গোস্বামী বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবসমাজের নেতা হন।

সনাতন, রূপ এবং জীবের কথা বাদ দিলে তখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্ত-দিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস। ইঁহারা ষট্ গোস্বামী নামে প্রথিত ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামীরও নাম করা উচিত। প্রধানত এই গোস্বামীরাই বৃন্দাবনের তীর্থ সকল প্রকটিত করেন ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা প্রচলিত করেন। ইঁহারা সকলেই যৌবনে অথবা বাল্যে শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজি মতে 'রিলিজিয়ন' বা "ধর্ম্ম" বলা বোধ হয় খুব সঙ্গত হয় না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলাই ঠিক হয়। জনসাধারণের জন্য শ্রীচৈতন্য যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা সর্বজনীন চিরন্তন আদর্শের অনুগত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি-উদ্দীপনের জন্য নামসংকীর্ত্তন—ইহারই উপর শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতিবর্ণ-নির্বিচারে সকল মানুষই যে সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। তখনকার দিনের হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া সমাজে একতা আনিয়া অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ও প্রভাব অসামান্য সহায়তা করিয়াছিল। অপূর্ব প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা কি ধর্ম্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতকলায় সর্বত্র বিচিত্রভাবে স্ফূর্ত্ত হইতে লাগিল। ইহাই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ।

সকল দেশে যেমন তেমনি আমাদের দেশেও প্রাচীন শাস্ত্র ছিল অনুশাসন-মূলক। এইরকম ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা যে আদর্শ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে তাহা সুপ্রাচীন কালের কিংবদন্তী অথবা উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রাচীন সত্যযুগ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে আমরা দুর্গতির স্রোত বাহিয়া চলিয়াছি, এবং শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করিলেই যে আমরা আবার উজানে ফিরিয়া যাইব—এই বিশ্বাস শুধু প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের নয়, সকল ধর্ম্মেরই বিশেষত্ব। শ্রীচৈতন্য যে প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন তাহাতে বর্ত্তমান কাল এবং জীবিত মানুষ প্রথম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। সত্যযুগের কল্পিত মরীচিকার প্রত্যাশায় মানুষ বর্ত্তমানকে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণব বলিলেন—বর্ত্তমান কালই তো কাল, যাহা করিবার তাহা তো এখনি করিতে হইবে; অতএব "প্রণমহো কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।" সৃষ্টির পর্য্যায়ে প্রাণের ব্যক্ততম প্রকাশ হইয়াছে মানুষে, দেবতা তো মানুষের আদর্শেই গড়া, সুতরাং "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" এইরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সুদূর অতীত হইতে ফিরাইয়া বর্ত্তমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় আধুনিকতার প্রবর্ত্তন করিলেন।

১০

বৈষ্ণব গীতিকাব্য

রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল, একথার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ পরিপূর্ণ হইল। তাহার পর আড়াই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবতার ছাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি প্রায় সকলে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিকরের শিষ্য-অনুশিষ্য ছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা চিরন্তন ধারা সেই গীতিকাব্য বৈষ্ণব কবিদিগের দ্বারা বিশেষরূপে অনুশীলিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গীতি-কাব্যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কাব্যকলার চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইল। এই গীতিকাব্য শুধু বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হয় নাই, কিছু কিছু সংস্কৃতে, জয়দেবের অনুকরণে, লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশীর ভাগই লেখা হইত এক নূতন-সৃষ্ট মিশ্রভাষা ব্রজবুলিতে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মৈথিলী ভাষায় লিখিত ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকবিতা বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যও

বিদ্যাপতির গান শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির কবিতার ঝঙ্কারে ও অলঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া ঐ ভাষায় কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। মৈথিলী ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, সুতরাং তাঁহাদের লেখার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব কিছু না কিছু রহিয়া গেল। মৈথিলী এবং বাঙ্গালা মিশ্রিত এই কৃত্রিম ভাষা ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার অন্যতর মুখ্য বাহন হইয়া দাঁড়াইল। সাধারণ লোকে মনে করিল যে দ্বাপর যুগে রাধাকৃষ্ণ সম্ভবতঃ এই ভাষাতেই কথা বলিতেন, ইহাই ছিল ব্রজের বুলি। সুতরাং এই ভাষার নাম হইল 'ব্রজবুলি,' ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষা। বৃন্দাবনের আধুনিক কথ্যভাষার নাম ব্রজভাষা। ইহা হিন্দীরই উপভাষা-বিশেষ, ব্রজবুলির সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন বাঙ্গালী কবি ব্রজবুলিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচনা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি।

বাঙ্গালায় এবং ব্রজবুলিতে শুধু রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই পদ রচনা হইল না, শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী এবং তাঁহার প্রধান প্রধান পারিষদগণের মাহাত্ম্য-বিষয়েও প্রচুর গীতিকবিতা রচিত হইতে লাগিল। দেবতার বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে, বিশেষ করিয়া জীবিত মানুষ লইয়া, কবিতা রচনা করা বাঙ্গালা সাহিত্যে কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিল। বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন ছড়া-গান, ব্রতকথা ও দেবতার পাঁচালী, বড় জোর রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী লইয়াই ব্যাপৃত ছিল; এ ছিল একেবারে "লোক-সাহিত্য," ইংরেজিতে যাকে বলে "ফোক্ লিটারেচার।" এখন ইহা প্রকৃত সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিল। সে যুগের পক্ষে এ অসামান্য ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে যাঁহারা সর্বপ্রথম পদ রচনা করেন তাঁহারা মহা-প্রভুরই পারিষদ ছিলেন। ইঁহারা হইতেছেন নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই গোবিন্দ ও মাধব, এবং পরমানন্দ গুপ্ত। শ্রীচৈতন্যের অনুচরদিগের মধ্যে আরও অনেকে কবি ছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ আচার্য্য, রামানন্দ বসু এবং মাধব আচার্য্য।

নরহরি সরকারের বাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বহু ব্যক্তি গৌড়ে রাজদরবারের চাকুরি করিতেন। সেই সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে শ্রীখণ্ড সাহিত্যচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। নরহরি স্বয়ং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—হোসেন শাহের "অন্তরঙ্গ" অর্থাৎ খাস চিকিৎসক —মুকুন্দ, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের, বিশেষ করিয়া নরহরির এবং রঘুনন্দনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবদিগের একটি

প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হয়। নরহরি শ্রীচৈতন্যের পূজা-প্রচারেরও অন্যতম উদ্যোক্তা। নরহরি এবং রঘুনন্দনের শিষ্যদিগের মধ্যে বহু প্রথমশ্রেণীর কবি ছিলেন, যেমন লোচনদাস, কবিরঞ্জন এবং "কবিশেখর রায়" উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ।

নিত্যানন্দের এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা জাহ্নবা দেবীর শিষ্যগণের মধ্যে সে যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন—বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস এবং জ্ঞানদাস। অন্যান্য শ্রীচৈতন্য-পারিষদের শিষ্যগণের মধ্যেও বহু কবি পাই—নয়নানন্দ মিশ্র, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, উদ্ধবদাস, দৈবকীনন্দন, অনন্তদাস, চৈতন্যদাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণব গীতিকবিরা সচরাচর "পদকর্ত্তা" বা "মহাজন" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগের পদকর্ত্তাদের মধ্যে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় মুরারি গুপ্ত, লোচনদাস, জ্ঞানদাস এবং বলরামদাস অতুলনীয়। লোচনদাস নাচাড়ী বা হালকা ছন্দের বাঙ্গালা কবিতায় বিশেষ গুণপনা দেখাইয়াছেন। সরল ভাষায় সহজ কবিত্বের সহিত মনের কথা প্রকাশ করিতে লোচন অদ্বিতীয়। লোচনের কয়েকটি পদ পরবর্ত্তী কালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। বাৎসল্য-রসের বর্ণনায় বলরামদাসের জুড়ি নাই। জ্ঞানদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষার পদেই অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। অনুরাগের ব্যাকুলতা জ্ঞানদাসের পদে যেমন অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তেমন পদাবলী-সাহিত্যে আর কারও লেখায় মিলে না। তবে এ বিষয়ে বলরাম-দাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের কতকটা মিল আছে। বাসুদেব ঘোষের এবং নয়নানন্দ মিশ্রের রচিত শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক পদগুলি ভক্তি- ও ভাব-রসে ভরপুর।

গীতিকাব্য ছাড়া কয়খানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও এই সময়ে রচিত হয়। মাধব আচার্য্যের কাব্য শ্রীচৈতন্য বর্ত্তমান থাকা কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বা ভাগবতসার বৃহৎ কাব্য। কাব্যটিতে পদ ও বর্ণনা অংশ সমান সমান। পদগুলির ভাষায় ও ভাবে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় আছে।

"কবিশেখর" বা "রায়শেখর" উপাধিযুক্ত দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়ের সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবে ও ভাষায় অনেকটা মিল আছে। দেবকীনন্দনের পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী। দেবকীনন্দনের অপর রচনা হইতেছে কৃষ্ণলীলা-পদাবলী—কীর্ত্তনামৃত—এবং সংস্কৃত মহাকাব্য গোপালচরিত ও নাটক গোপীনাথবিজয়। শ্রীচৈতন্যের অনুগৃহীত ভক্ত বরাহনগর-বাসী রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এটি পুরাপুরি বর্ণনাত্মক কাব্য।

মাধব আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাসও একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি আকারে ছোট, এবং নিন্দনীয় নয়। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহাদের নিবাস ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে।

শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে দুর্লভ-পুত্র পরমানন্দ একখানি কৃষ্ণলীলা-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনাপদ্ধতি হইতে অনুমান হয় যে, কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কাব্যের উপোদ্‌ঘাতে যে চৈতন্যবন্দনা-পদ আছে তাহাতে কবির অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ কবি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অনুচর পদকর্ত্তা পরমানন্দ গুপ্ত।

বংশীদাসের শ্রীকৃষ্ণলীলা কাব্যের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইনি শ্রীচৈতন্যের অনুচর বংশীবদন চট্ট কিনা তাহা বলিবার উপায় নাই।

"দুঃখী" শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল উৎকৃষ্ট কাব্য। কবির পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। বাসস্থান ছিল মেদিনীপুর অঞ্চলে। অনুমান হয় যে, শ্যামদাসের পিতা আর কাশীরাম দাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ একই ব্যক্তি। তাহা হইলে কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের রচনা হয়।

১১

শ্রীচৈতন্য-জীবনী-কাব্য

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনী-কাব্য লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভগ্ন হইল। শ্রীচৈতন্যের অতিলৌকিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব শুধু তাঁহার ভক্তদিগেরই নহে, সাধারণ লোকেরও সবিস্ময় শ্রদ্ধা ও অপরিসীম ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের বহু পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য অবতার বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন, এবং শুধু গীতিকবিতায় নহে, সুবৃহৎ জীবনী-কাব্যেও তাঁহার লীলাকাহিনী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের বর্ত্তমান-কালে যে জীবনীটি রচিত হইয়াছিল তাহা সংস্কৃতে, মহাকাব্যের আকারে, মুরারি গুপ্তের লেখনীপ্রসূত। বাঙ্গালা জীবনীকাব্য কয়খানি—দুই একখানি ছাড়া—তাঁহার তিরোধানের অল্পবিস্তর পরে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝের দিকে আরও দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণিত হইয়াছিল। দুইখানিরই রচয়িতা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর। ইনি শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারিষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। একখানি হইতেছে মহাকাব্য—চৈতন্যচরিতামৃত (১৫৪২), আর অপরখানি নাটক—চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৫৭২)।

বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী-কাব্য হইতেছে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত। বইটি শ্রীচৈতন্যের বর্ত্তমানকালে অথবা তিরোধানের অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে নিত্যানন্দের আদেশে রচিত হইয়াছিল। চৈতন্য-ভাগবতে শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনের কাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বইটি অতিশয় সুখপাঠ্য, পড়িলে মনে হয় যেন গ্রন্থকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সেকালের নবদ্বীপ অঞ্চলের সামাজিক অবস্থার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবতে। বৃন্দাবনদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের মুখ্য পারিষদগণের অন্যতম শ্রীবাস পণ্ডিতের এক ভ্রাতার দৌহিত্র, এবং নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। বর্ণিত বিষয়ের অধিকাংশই তিনি নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের বাল্যকথা এবং পরবর্ত্তী কীর্ত্তিকলাপও ইহাতে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। স্বীয় গুরু নরহরি সরকারের আদেশে লোচন কাব্যটি রচনা করেন। লোচনের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কোগ্রামে। ইঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম অভয়া দাসী। পিতৃ-বংশের ও মাতৃ-বংশের একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে লোচন শিক্ষার অপেক্ষা আদরই পাইয়াছিলেন অত্যধিক। একটু বেশী বয়সে ইনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহাও মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নির্বন্ধে।

লোচনের কাব্য প্রধানতঃ মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে রচিত। জীবনী হিসাবে বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও ইহা কাব্য হিসাবে অতিশয় উপাদেয়। পাঁচালী-গানের বিশেষ উপযোগী বলিয়া চৈতন্য-মঙ্গল বরাবর সমাদরলাভ করিয়া আসিয়াছে। চৈতন্যমঙ্গল পাঁচালী এখনও উত্তররাঢ়ে চলিত আছে।

শুধু শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনী বলিয়াই নহে, উচ্চস্তরের দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিলে বেশি বলা হয় না। কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে। প্রৌঢ় বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান এবং রঘুনাথ ভট্টের (?) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর নিকট ইনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। সনাতন-রূপের তিরোধান হইলে ইনি রঘুনাথদাসের পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন যেমন বিদ্বান্ তেমনি রসবেত্তা ও কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ন। ইঁহার রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য গোবিন্দলীলামৃত অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

পাছে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত তুলনায় হীন প্রতিপন্ন হইয়া অনাদৃত হয়, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের

বাল্য-লীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উপর বরাত দিয়া সারিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের মধ্যজীবনের অনেক কথা এবং শেষজীবনের কাহিনী যাহা অন্যত্র কোথাও লিখিত হয় নাই তাহা কৃষ্ণদাস যথাযথভাবে অথচ বিশেষ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ কয় বৎসরের জীবনকথা জানিবার তাঁহার যে সুযোগ ছিল তাহা অন্য কাহারও ছিল না। রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্যের অবস্থিতি-কালে নীলাচলে বাস করিতেন, তিনি স্বচক্ষে অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লীলা তিনি স্বীয় গুরু, শ্রীচৈতন্যের অভিন্নহৃদয় মর্ম্মসহচর স্বরূপ-দামোদরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। এই সকল তথ্য কৃষ্ণদাস রঘুনাথের কাছে পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং তথ্যনিষ্ঠা অতিশয় বলবতী ছিল; যখনই তিনি শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে কোন নূতন কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রমাণ মানিতে ভুলিয়া যান নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে স্বল্পাক্ষরে অথচ সহজভাবে বর্ণিত থাকায় গ্রন্থটি অধ্যাত্মনিষ্ঠ ও দার্শনিক ব্যক্তিদিগের নিকট পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের এমন অপরূপ সমন্বয় আর কোন দেশের সাহিত্যে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।

চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। তখন কৃষ্ণদাস সুবৃদ্ধ। কোন কোন পুঁথির পুষ্পিকা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা ১৫৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে এ মত সমর্থনযোগ্য নহে।

জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন জনসাধারণের জন্য, শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবের জন্য নহে। কবিত্বশক্তির বালাই তাঁহার বড় কিছু ছিল না। সুতরাং জয়ানন্দের গ্রন্থ কাব্য-হিসাবে বিশেষ উপাদেয় নহে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী জয়ানন্দ সাক্ষাৎভাবে জানিতেন না, দুই তিন বা ততোধিক হাত-ফেরতা সংবাদের অতিরিক্ত তাঁহার জানা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান, তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের নামধাম ইত্যাদি দুই চারিটি নূতন কথা থাকিলেও প্রামাণিকতা-হিসাবে প্রায়ই মূল্যহীন। লোচনের কাব্যের মত জয়ানন্দের কাব্যও পুরাণের ছাঁচে রচিত, এবং ইহাও পাঁচালীর মত গাওয়া হইত। মান্দারন এবং মল্লভূম-অঞ্চলেই জয়ানন্দের কাব্যের চলন ছিল।

জয়ানন্দের নিবাস ছিল মান্দারনের সন্নিকটে আমাইপুরা গ্রামে। তাঁহার পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পারিষদ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। জয়ানন্দের মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে,

তিনি যখন তিন বৎসরের শিশু তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের গৃহে একবার অল্প সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুইয়া নাম বদলাইয়া জয়ানন্দ রাখিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে।

জয়ানন্দের কাব্যে আমরা পরমানন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গবিজয় ও গোপাল বসুর চৈতন্যমঙ্গল পাঁচালীর উল্লেখ পাইতেছি। এই দুইটি কাব্যের এখন আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চারও উল্লেখ করা উচিত। বইটি ছোট; তবে ইহাতে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ-বিষয়ে অনেক নূতন কথা আছে। রচনাভঙ্গি সুন্দর, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক। অনেকেই সন্দেহ করেন যে, বইখানি পুরাপুরি জাল না হইলেও ইহাতে যথেষ্ট ভেজাল ঢুকিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত কোন শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্য পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে। একটির নাম চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী, রচয়িতা পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ, নামান্তর প্রেমদাস। কাব্যটি কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের ভাবানুবাদ। অন্যটি, ভগীরথ বন্ধুর চৈতন্যসংহিতা (পাঠবিকৃতির ফলে 'চৈতন্যসঙ্গীতা'), স্বাধীন রচনা। বইটি ক্ষুদ্র। রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। গ্রন্থকার ছিলেন জাতিতে শাঁখারি। চৈতন্যসংহিতা আগমের আকারে, অর্থাৎ হর-গৌরীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত।

ষোড়শ শতাব্দীতে অন্ততঃ চারিখানি অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনীকাব্য লিখিত হইয়াছিল। শেষের তিনখানিতে শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচুর থাকায় এ দুটিকেও স্বচ্ছন্দে শ্রীচৈতন্যজীবনীর মধ্যে ধরা চলে। শ্রীহট্ট-লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করেন। ১৪০৯ শকাব্দে রচিত বাল্যলীলাসূত্র নামে একটি ছোট সংস্কৃত গ্রন্থে ইনি অদ্বৈত আচার্য্যের বাল্যকথা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী জীবনীকারেরা সকলেই এই বই হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তরকালে শ্যামানন্দ এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন অদ্বৈততত্ত্ব নামে।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ লাউড়ে বিরচিত হয় ১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি ছোট হইলেও অতিশয় সুললিত। শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় নূতন কথা ইহাতে আছে। ঈশান নাগর আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের সমবয়সী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে প্রতিপালিত হন। সেইজন্য ইনি শ্রীচৈতন্যের অনেক লীলা চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য্যের প্রথম পত্নী সীতা

দেবীর আদেশে ইনি বৃদ্ধবয়সে লাউড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হন, আর তাঁহারই আদেশে অদ্বৈতপ্রকাশ কাব্য রচনা করেন। প্রকাশিত অদ্বৈতপ্রকাশ সর্বাংশে অকৃত্রিম কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট হেতু আছে।

অদ্বৈত আচার্য্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্যামদাস আচার্য্য একখানি অদ্বৈতমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল ঈশান নাগরের গ্রন্থ হইতে অনেক বড়। গ্রন্থকার অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। আচার্য্যের জীবনীর অনেক উপাদান তিনি পাইয়াছিলেন আচার্য্যের গ্রামসম্পর্কীয় মাতুল, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিজয় পুরীর নিকট। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের আদেশে হরিচরণ অদ্বৈতমঙ্গল রচনা করেন।

অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনীকাব্য আরও একখানি পাওয়া গিয়াছে; এটি হইতেছে নরহরি দাস রচিত অদ্বৈতবিলাস। খুব সম্ভব বইটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পূর্বে রচিত হয় নাই।

অদ্বৈত আচার্য্যের প্রথম ভার্য্যা সীতা দেবী একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। ইঁহার জীবনী ষোড়শ শতাব্দীর দুইখানি ক্ষুদ্রকাব্যে বর্ণিত হইয়াছিল। বই দুইখানির নাম যথাক্রমে সীতাগুণকদম্ব এবং সীতাচরিত্র। প্রথমখানির রচয়িতা বিষ্ণুদাস আচার্য্য সীতা দেবীর শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয়খানি লোকনাথ দাস বিরচিত। বই দুইখানিতে, বিশেষ করিয়া শেষেরটিতে যথেষ্ট ভেজাল আছে। সীতাচরিত্র খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর অনেক পরেকার রচনা।

রূপ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই আরম্ভ হয়। তবে পরবর্ত্তী শতাব্দীতে এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ছোট-বড় বহু বৈষ্ণবসাধনঘটিত পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। লোচন দাস এইরূপ কতকগুলি ছোট বই রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইতেছে দুর্লভসার। কবিবল্লভের রসকদম্ব একখানি চমৎকার বই। এই বইটিতে অনেক নূতনত্ব আছে। কাব্য হিসাবেও রসকদম্ব উৎকৃষ্ট রচনা। রসকদম্ব-রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল ১৫২০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। ইঁহাদের নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে করতোয়া-তীরে মহাস্থানের সমীপে আরোড়া গ্রামে। কবির গুরু উদ্ধবদাস গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন।

১২

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল-পাঁচালী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, ইহা চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে বোঝা যায়। ইহার পূর্বে এই কাহিনী কাব্যাকারে না হউক, ব্রতকথা-রূপেও যে প্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যাহা হউক, যে-সব চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাদের কোনটিই পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্বে রচিত হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের কথা বলিবার পূর্বে চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর পরিচয় দিই।

মঙ্গলচণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য- ও পূজা-প্রকাশই চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর মূলকথা। এই কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় লেখা কোন প্রাচীন পুরাণে নাই, তবে অনুমান হয় যে বাঙ্গালা দেশে এই দেবমাহাত্ম্য-কাহিনী বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক্ ধনপতির উপাখ্যান। গল্প দুইটি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

কালকেতু সুদরিদ্র ব্যাধের সন্তান, নিজেও ব্যাধবৃত্তি করিয়া কষ্টেস্‌ষ্টে জীবিকানির্বাহ করে। মাতাপিতার মৃত্যুর পর সংসার বলিতে নিজে এবং স্ত্রী ফুল্লরা। ফুল্লরা যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই গৃহকর্ম্মনিপুণা। স্বামী বনের পশু মারিয়া গৃহে আনে, স্ত্রী মাথায় বহিয়া লোকের ঘরে ঘরে হাটে ও বাজারে সেই মাংস বিক্রয় করিয়া আসে। কেহ বা নগদ কড়ি দিয়া কিনে, কেহ বা ধারে। এই দরিদ্র দম্পতীর উপর দেবীর অনুকম্পা হইল। তিনি স্থির করিলেন, ইহাদের দিয়া তিনি পৃথিবীতে আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। একদিন কালকেতু মৃগয়ায় গিয়া কিছুই পাইল না, অনেক কষ্টে একটি স্বর্ণকান্তি গোধিকা জীবিত অবস্থায় ধরিয়া গৃহে লইয়া আসিল। ফুল্লরাকে ঘরে না দেখিয়া দাওয়ার খুঁটিতে গোসাপটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া সে স্ত্রীকে খুঁজিতে বাহির হইল। কালকেতু দরজা পার হইবামাত্র দেবী ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকার রূপ ধরিয়া বসিলেন। ফুল্লরা গিয়াছিল সখীগৃহে এক সের খুদ ধার করিয়া আনিতে। সে অন্য পথ দিয়া ঘরে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। বিস্ময় দমন করিয়া বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাঁহার পতি বৃদ্ধ ও উদাসীন, তাহার উপর কলহপ্রিয়া সতিনীর উপদ্রব, সেইজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে ব্যাধ কালকেতু তাঁহাকে "নিজ গুণে বাঁধিয়া" গৃহে লইয়া আসিয়াছে। শুনিয়া ফুল্লরার বিস্ময় ঘুচিয়া হতাশার সঞ্চার হইল। সে দেবীকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, স্বামী যতই

দুর্বৃত্ত, গৃহ যতই অশান্তিপূর্ণ হউক না কেন, স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গতি ; স্বামী-পরিত্যাগিনী পত্নীর ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। শেষে নির্ঘাত উপদেশ দিল,

সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি,
কোপে কৈলে বিষপান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতীনের কিবা হবে হানি।

তরুণী তাহাতেও ভিজিল না দেখিয়া ফুল্লরা অন্য পথ ধরিল। নিজের বারমাসিয়া দুঃখের নিখুঁত বর্ণনা করিয়া দেবীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহাদের গৃহে থাকিলে তাঁহার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। এত শুনিয়াও দেবী চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন না। তখন স্বামীর উপর ফুল্লরার দারুণ অভিমান হইল ; সে স্বামীকে খুঁজিয়া আনিতে চলিল। পথে দুইজনের দেখা হইল। ফুল্লরার কথায় কালকেতু বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গেল—এ বলে কি ? সে ত কোন সুন্দরী বালিকাকে গৃহে আনে নাই ? গৃহে ফিরিয়া কালকেতুর চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে সেও দেবীকে স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নির্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। এতক্ষণে দেবী স্বামী-স্ত্রীর সাধুতার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলেন। সীতার উদাহরণ দিয়া কালকেতু বলিল, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা তোমাকে হীনজাতি আমি কি উপদেশ দিব। তবে ভাবিয়া দেখ, " পুরাণ বসন-ভাতি অবলাজনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।" এত কথাতেও দেবী মৌন রহিয়াছেন দেখিয়া কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শরসন্ধান করিল। দেবীর দৃষ্টিপাতে কালকেতুর হাত স্তব্ধ হইয়া গেল। শেষে দেবী আত্মপ্রকাশ করিয়া ব্যাধদম্পতীকে আশীর্বাদ করিলেন এবং একটি মূল্যবান্ অঙ্গুরী উপহার দিলেন ও নিজের স্বরূপ দেখাইয়া তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন। অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া কালকেতু বহু ধন পাইল, সেই অর্থে জঙ্গল কাটাইয়া নূতন রাজ্য ও রাজধানীর পত্তন করিল। নানাজাতির লোক আসিয়া কালকেতুর রাজ্যে বসতি করিল। সেই সঙ্গে আসিল ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক ভাঁড়ু দত্ত। রাজার নিকট মিথ্যা পরিচয় দিয়া পসার জাঁকাইয়া ভাঁড়ু প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কালকেতু সংবাদ পাইয়া ভাঁড়ুকে অপমান করিয়া নিজের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। কালকেতু-প্রদত্ত অপমানের প্রতিশোধ লইবার বাসনায় ভাঁড়ু কালকেতুর প্রতিবেশী রাজাকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করাইল। কালকেতু বীরের মত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একস্থানে লুকাইয়া রহিল। ভাঁড়ু দত্ত ছলনা করিয়া ফুল্লরার নিকট সেই গুপ্ত স্থান জানিয়া লইয়া রাজাকে বলিয়া দিল। কালকেতু

বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কারাগারে অশেষ নির্য্যাতনে পড়িয়া কালকেতু দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করিতে লাগিল। দেবী রাজাকে স্বপ্ন দিলেন ; কালকেতুকে দেবীর বরপুত্র জানিয়া রাজা অবিলম্বে তাহাকে কারামুক্ত করিল। কালকেতু স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল। বহুদিন রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগের পর কালকেতু সস্ত্রীক স্বর্গে গমন করিল। ইহাই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের প্রথম উপাখ্যান।

উজানী নগরে এক ধনবান্ বণিক্ ছিল, নাম ধনপতি। প্রথম পত্নী লহনা নিঃসন্তান বলিয়া ধনপতি রূপসী ও গুণবতী বালিকা খুল্লনাকে বিবাহ করিল। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজার আদেশে তাহাকে বিদেশে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইল। এই অবসরে দাসী দুর্বলার কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া লহনা সপত্নী খুল্লনাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। অন্ন-বস্ত্রের কথা দূরে থাক, খুল্লনাকে মাঠে ছাগল চরাইতে যাইতে বাধ্য করা হইল। বনমধ্যে ছাগল চরাইতে চরাইতে একদিন একটি ছাগল হারাইয়া গেল। ছাগল খুঁজিয়া না পাইলে সপত্নী তাহাকে যাহা-নয়-তাই করিবে এই ভয়ে খুল্লনা ব্যাকুল হইয়া ছাগল খুঁজিতেছিল এমন সময়ে দেখিল যে বনমধ্যে একস্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতেছে। ইহারা বিদ্যাধরী। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিখাইবার জন্যই তাহারা দেবী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাদের কথায় খুল্লনা সেইখানে পূজা করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত গ্রহণ করিল। হারানো ছাগল আসিল। তাহার পর ধনপতি দেশে প্রত্যাগত হইলে খুল্লনার দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। কিন্তু সুখের দিনও চিরস্থায়ী হইল না ; কিছুদিন পরেই ধনপতিকে বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা তখন সন্তানসম্ভবা। যাত্রার পূর্বে ধনপতি মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেলিয়া দিল। দেবী কুপিত হইলেন। অজয় ও ভাগীরথী বাহিয়া ধনপতির বাণিজ্যতরী সমুদ্রে পড়িয়া যখন সিংহলের কাছাকাছি আসিয়াছে, তখন ধনপতি সমুদ্রগর্ভে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিল—সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসিয়া এক ষোড়শী তরুণী একটি হস্তীকে একবার গ্রাস করিতেছে, পরক্ষণে উদ্‌গীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এ অদ্ভুত দৃশ্য কিন্তু ধনপতি ছাড়া আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। সিংহলে পৌঁছিয়া ধনপতি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথারীতি উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে খুশি করিল এবং পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল। দুরদৃষ্টক্রমে ধনপতি কথাপ্রসঙ্গে একদিন রাজার নিকট সমুদ্রবক্ষে সেই অপূর্ব দৃশ্যের কথা বলিয়া ফেলিল। এই প্রকার অসম্ভাব্য ব্যাপার শুনিয়া রাজা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল। ধনপতির রোখ চাপিয়া গেল ; সে প্রতিজ্ঞা করিল যে রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইবে, আর না দেখাইতে পারিলে যাবজ্জীবন কারাবাস বরণ করিবে। রাজাকে লইয়া ধনপতি সমুদ্র-বক্ষে

সেই স্থানে গেল, কিন্তু সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ধনপতি চিরদিনের মত কারাগারে আবদ্ধ হইল। এ সবই দেবীর চক্রান্ত, তিনি ধনপতিকে কষ্ট দিয়া আপন ভক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এদিকে খুল্লনা এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিল; পুত্রের নাম হইল শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত। পিতৃহীন শিশু মাতার যত্নে বাড়িয়া উঠিল এবং উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীপতি নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান করিতে ব্যগ্র হইল। তাহার আগ্রহাতিশয্যে মাতা সমুদ্রযাত্রায় সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না। শ্রীপতি পিতার মত বাণিজ্যতরী লইয়া সিংহল-উদ্দেশে যাত্রা করিল। সিংহলের উপকূলের নিকটে শ্রীপতিও সেই অপূর্ব "কমলে কামিনী" দৃশ্য দেখিল। সিংহলে পৌঁছিয়া সে পিতার মতই হঠকারিতা করিয়া রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এবার কথা রহিল, না দেখাইতে পারিলে শ্রীপতির প্রাণদণ্ড হইবে। বলা বাহুল্য, শ্রীপতিও রাজাকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। শ্রীপতির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ওদিকে বাড়ীতে বসিয়া খুল্লনা পুত্রের বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া একান্তমনে দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিল। এইবার দেবী পিতাপুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। শ্রীপতিকে যখন শূলে চড়াইবার জন্য মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন দেবী শ্রীপতির অতি-বৃদ্ধপিতামহী রূপে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বালকের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলেন। রাজা স্বীকৃত হইল না। দেবী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ভূতপ্রেতপিশাচ-সেনাকে রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন; অল্পকাল মধ্যেই রাজসৈন্য পরাভূত হইল। রাজা দৈবীশক্তি জানিতে পারিয়া শ্রীপতিকে ছাড়িয়া দিয়া দেবীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিল। শ্রীপতি প্রথমেই কারাগারে গিয়া পিতাকে মুক্ত করিল। অন্ধ-কারার মধ্যে পিতাপুত্রের প্রথম মিলন হইল। দেবীর আদেশে রাজা তাহার কন্যা সুশীলার সহিত শ্রীপতির বিবাহ দিলে পুত্র, পুত্রবধূ এবং প্রচুর ধনরত্ন ও পণ্যদ্রব্য লইয়া ধনপতি দেশে প্রত্যাগমন করিল এবং দেবীর অনুগ্রহে পুত্র-পরিবার লইয়া সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। ইহাই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের দ্বিতীয় উপাখ্যান।

উপাখ্যান দুইটির উৎপত্তি মূলতঃ বিভিন্ন। কালকেতুর কাহিনী বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব পৌরাণিক উপাখ্যান। হলুদে গোসাপ যে কোন এক সুপ্রাচীন যুগে দেবীর প্রতীক অথবা বাহন ছিল তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে এই কাহিনীতে। নবম-দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ চণ্ডিকা-মূর্ত্তির পাদদেশে গোধিকা-মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। তাহা ছাড়া, কালকেতুকে বরদানকারিণী দেবী হইতেছেন পৌরাণিক মহিষমর্দ্দিনী। মনে হয়, এই কাহিনীর মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের আরণ্য অঞ্চলে বসতি-স্থাপনের ও দেবীপূজা-প্রচলনের ইতিহাস লুকানো আছে। একটি

প্রাচীন ব্রতকথায় এই উপাখ্যানের প্রাচীনতর রূপের আভাস পাওয়া যায়। কালকেতু শিকারে কিছু না পাইয়া—

বান্ধিয়া লইল গোধা করিয়া যতন,
গৃহিণীর স্থানে দিল করিতে রন্ধন।
কাটিবারে নিল যদি ব্যাধের রমণী,
গোধারূপ এড়ি হৈলেন ত্রৈলোক্যমোহিনী।

দেবী সিংহবাহিনী, পশুদের রক্ষয়িত্রী। তাই তিনি কালকেতুকে ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বলিলেন,

মঙ্গলচণ্ডিকা আমি ভুবনপূজিত,
মোর পশু হিংসা না করিব কদাচিত।

ধনপতির কাহিনী অপৌরাণিক মনসামঙ্গল-কাহিনীর মত। দেবী প্রথমে বণিক্-গৃহিণীর পূজা পাইয়া তবে জবরদস্তি করিয়া গৃহপতির নতি আদায় করিয়াছেন। ধনপতি-খুল্লনা-কাহিনী আসলে হইতেছে ব্রতকথা। খুল্লনার পূজিত মঙ্গলচণ্ডী, পৌরাণিক মহিষমর্দ্দিনী নহেন, লৌকিক দেবতা, সম্ভবতঃ মূলতঃ আরণ্যদেবতা, শাখোটবাসিনী বনদুর্গার মত। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত এখনো প্রচলিত আছে।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল জানা নাই। তবে কাব্যটি বিশেষ প্রাচীন, অন্ততঃপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত বলিয়া মনে হয়, কেন না মুকুন্দরাম ইঁহারই কাব্যকাহিনী-অবলম্বনে স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন —"মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ"। মাণিক দত্ত উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল হইতেছে ১৫০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পিতার নাম ছিল পরাশর; ইঁহাদের নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। বাঙ্গালা দেশ তখন আকবরের অধীনে আসিয়াছে। মাধব আচার্য্য আকবরকে বিক্রমে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মাধব আচার্য্যের কাব্য পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনিও একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, মাধব আচার্য্য দেশত্যাগ করিয়া গিয়া পূর্ববঙ্গে বসতি করেন। মাধব আচার্য্য-প্রণীত একটি গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক গঙ্গামঙ্গল-কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কাব্য ক্ষুদ্র। এই মাধব আচার্য্য এবং চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল মাণিক দত্তের ও কবিকঙ্কণের কাব্যের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। ইহাতে শিবায়ন অর্থাৎ হর-গৌরীর কাহিনী নাই। কালকেতুর কাহিনীও বাহুল্যবর্জিত।

চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন কবিকঙ্কণ-উপাধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ইনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম। মুকুন্দরামের কাব্য প্রচারিত হইবার পর অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য আর আসর জমাইতে পারে নাই। মুকুন্দরামের অঙ্কিত সব চরিত্রই যেন জীবন্ত।

মুকুন্দরামের পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ রমানাথ (মতান্তরে রামানন্দ)। ইঁহাদের বহুপুরুষ হইতে নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণপূর্বসীমান্তে দামুন্যা বা দামিন্যা (বর্ত্তমান দামিনে) গ্রামের উত্তরপ্রান্তবাহিনী রত্না স্রোতস্বিনীর তীরে, গ্রামের দেবতা চক্রাদিত্য শিব অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবিরা বোধ হয় চক্রাদিত্যের সেবক ছিলেন। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

গঙ্গা-সম নিরমল তোমার চরণ-জল
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে,
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন একদিকে পাঠান-শক্তি অস্তগমন করিতেছে এবং অপর দিকে মোগল-শক্তির উদয়ন ঘটিতেছে, তখন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে যে নিদারুণ অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, তাহার জলন্ত বর্ণনা পাই মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে। রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মুকুন্দরাম সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার বর্ণনা ভুক্তভোগীর বাস্তবতায় দেদীপ্যমান। আত্মকাহিনীর পরিচয় দিতেছি।

দামুন্যা ছিল সেলিমাবাদ শহরবাসী গোপীনাথ নিয়োগীর তালুক। এই তালুকে কবিরা সুখে স্বচ্ছন্দে ছয়-সাত পুরুষ বাস করিতেছেন কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া। কাব্যরচনাকালে রাজা মানসিংহের সুশাসন স্মরণ করিয়া কবি দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে তখন

অধর্ম্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ।

ডিহিদারের উপযুক্ত উজীর হইল রায়জাদা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্, বৈষ্ণব কাহারও স্বস্তি নাই। অবিচারের চূড়ান্ত। জমির দৈর্ঘ্য মাপা হইতে লাগিল কোণাকোণি। পতিত ভূমির উপর খাজনা ধার্য্য হইল উর্ব্বর জমির

সমান। ঘুষ সর্বত্র, এমন কি কাজ না পাইলেও। টাকা ভাঙ্গাইতে গেলে বাটা লাগিত আড়াই আনা। সুদ টাকা-পিছু প্রত্যহ এক পাই করিয়া। রোজ দিলেও মজুর পাওয়া যায় না। "ধান্য গোরু কেহ নাহি কিনে।" কবির মুরুব্বি গোপীনাথ নন্দীও "বিপাকে হইলা বন্দী, কোন হেতু নাহি পরিত্রাণে"। দেশ ছাড়িয়া সহজে পালানোর উপায় নাই, কেন না

পেয়াদা সবার কাছে প্রজা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা

সুতরাং

প্রজা হৈল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকাকের বস্তু দশ আনা।

চণ্ডীবাটী গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁ ও মীর খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মুকুন্দরামকে সপরিবারে পলাইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দিল। স্ত্রী, শিশু-পুত্র, ভাই রমানাথ (পাঠান্তরে রামানন্দ) ও দুই একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া কবি চুপিচুপি দেশত্যাগ করিলেন। ভাইয়ের হাতে ছিল রাহা-খরচ। ছেলে মানুষকে ভুলাইয়া ঠকে তাহা অচিরে হস্তগত করিল। কবি বলিতেছেন,

ভাই নহে উপযুক্ত রাম রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা,
লইয়া আপন ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।

মুড়াই নদী পার হইয়া কবি ভেঙুট্যা গ্রামে পৌঁছাইলেন। তাহার পর দ্বারকেশ্বর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন মামার বাড়ী। সেখানে মাতুলপুত্র গঙ্গাদাস যত্ন করিয়া কিছু দিন রাখিল। পরে নৌকায় দামোদর পারাইয়া হাজির হইলেন গুচড্যা গ্রামের উপকণ্ঠে। কবি ও তাঁহার বয়স্ক সঙ্গীরা পুখুরের জল পান করিয়া পেট ভরাইলেন বটে কিন্তু "শিশু কাঁদে ওদনের তরে"। রুক্ষ স্নান করিয়া পুখুরের আড়ায় ঠাকুর রাখিয়া কবি শালুকের মূল নৈবেদ্য দিয়া ও শালুক ফুল লইয়া পূজা করিলেন। তাহার পর ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে কবি পুখুরের পাড়েই ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন,

উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়রদেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে। . . . .
করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত,
পড়্যাছি অনেক তন্ত্র নাহি তথা সেই মন্ত্র
মহামন্ত্র জপি নিতে নিত।

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৪৮৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, কেন না গ্রন্থ-শেষে মুকুন্দরাম বলিয়াছেন,

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা,
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।

চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া কবি শিলাই নদী পার হইয়া ব্রাহ্মণভুম পরগনায় আরড়া গ্রামে গিয়া স্থানীয় ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের শরণাগত হইলেন। মুকুন্দ-রামের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া বাঁকুড়া রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দশ আড়া (অর্থাৎ সাড়ে বাইশ মণ) ধান দিবার হুকুম দিলেন এবং পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। কবি সংসার-চালানোর চিন্তা হইতে মুক্তি পাইলেন।

এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। বয়ঃপ্রাপ্ত রঘুনাথ পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইলেন এবং কবিকে "গুরু করি করিল পূজিত।" দেবীর স্বপ্না-দেশের কথা মুকুন্দরামের মনে কচিৎ উদয় হয়। অনুচর দামোদর (পাঠান্তরে গোপালদাস বা রামা নন্দী) এ কথা জানিত। সে প্রায়ই স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু দুর্দৈব কবিকে অভাগ্যের পথে টানিতেছে। জ্ঞান হইলে কবি রঘুনাথের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করিলেন,

আমন নূতন ধান কত আছে স্থানে স্থান
বান্ধিল ধাগালি সাজ-নুনি,
থাকিতে এ সব ধান না করিয়া অনুমান
আওয়ান কাল্যা ধান বুনি।
কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ
গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা,
শুন রঘু নরপতি দুঃখ কর অবগতি
আকালে বিকাল্য মোর হাল।

রঘুনাথ মুকুন্দরামকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং কাব্য রচিত হইলে কবিকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিলেন। কবির কথায়

কানে সোনা করে বালা গলে দিল কণ্ঠমালা
করাঙ্গুলি রতনভূষণ,
শিরে পাগ পরিতে জোড়া দিল চড়নের ঘোড়া
গায়নের যত আভরণ।

মুকুন্দরাম আর দেশে ফিরিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। শোনা যায়, তাঁহার পুত্র শিবরাম দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। দামুন্যা গ্রামে তাঁহাদের

পৈতৃক দেবতা গোপাল ও সিংহবাহিনী এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।

আত্মজীবনীর মধ্যে মুকুন্দরাম "গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধীপ" মানসিংহের নাম করিয়াছেন। মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারি পান ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং কাব্যটি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অথবা অল্প কিছুকাল পরে রচিত হইয়াছিল। এমনও হইতে পারে যে মূলকাব্য-রচনার পরে আত্মকাহিনী-অংশ লিখিত ও সংযোজিত হয়।

১৩

ভারত-পাঁচালী

পাণ্ডববিজয়-কাব্য বা মহাভারত-পাঁচালী ষোড়শ শতাব্দীতে একান্তভাবে রাজ-সভার বা ভূস্বামিবর্গের পোষকতায় রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীনতম মহাভারত-পাঁচালী হইতেছে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পাণ্ডববিজয়-কাব্য। কাব্যটি লেখা হয় লস্কর পরাগল খানের "মহানুগ্রহগৌরবাৎ।" পরাগলের পুত্র "ছুটি খান"-এর আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি ভারত অবলম্বনে অশ্বমেধ-পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অদ্বিতীয় সেনাপতি যুবরাজ শুক্লধ্বজ বা "চিলা-রায়" রামসরস্বতীকে দিয়া মহাভারতের বনপর্ব্ব অনুবাদ করাইয়াছিলেন। একথা পূর্বে বলিয়াছি। কোচবিহারের পরবর্ত্তী রাজারা ক্রমশঃ অপর পর্ব্বগুলিকেও পাঁচালী-রূপ দেওয়া-ইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অন্ততঃ আরও দুইজন কবি অশ্বমেধ-পর্ব্ব-পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। লস্কর রামচন্দ্র খান ছিলেন হোসেন শাহার একজন সেনাপতি, দক্ষিণ বঙ্গের ফৌজদার। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচল যাইতেছিলেন তখন "দক্ষিণ রাজ্যের" অধিকারী রামচন্দ্র খান তাঁহাকে নির্বিঘ্নে উড়িষ্যা-সীমান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র খান একখানি অশ্বমেধ-পর্ব্ব-পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ছিলেন কায়স্থ, নিবাস উত্তর রাঢ়ে দণ্ড-সিমলিয়া গ্রামে। পিতার নাম কাশীনাথ (পাঠান্তরে মধুসূদন), মাতার নাম পুণ্যবতী।

"দ্বিজ" রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাঁচালী লেখা হয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে। উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেবের সভায় কাব্যটি কবি কর্ত্তৃক পঠিত বা গীত হইয়াছিল। মুকুন্দদেব যুদ্ধে নিহত হন ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে।

পরবর্তী দুই শতাব্দীতে মহাভারতের অন্তর্গত উপাখ্যান লইয়া বহু পাঁচালী লেখা হইয়াছিল। ইহারও সূত্রপাত পাই ষোড়শ শতাব্দীতে। ১৪৬৮ ("রস ঋতু বেদ চন্দ্র") শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর দাস নল-দময়ন্তী কাহিনী অবলম্বনে একটি নাতিবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। "ভারতের পুণ্যকথা রচিব সংক্ষেপে"—কবির এই উক্তি হইতে এমনও মনে করা যাইতে পারে যে সমগ্র ভারত-পাঁচালী লেখা তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। কবির বৈষ্ণবোচিত অহঙ্কারহীনতা উপভোগ্য।

> ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কথা পুণ্যবতী,
> পয়ার প্রবন্ধে রচো হেন কৈল মতি।
> নহো আমি পণ্ডিত [না করোঁ] অহঙ্কার,
> বদ্ধির স্বভাবে হের রচিলো পয়ার।

১৪

মনসামঙ্গল কাব্য

বংশীবদন বা বংশীদাস চক্রবর্তীর মনসামঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। এই অনুমানের একমাত্র হেতু হইতেছে মুদ্রিত গ্রন্থে প্রাপ্ত রচনাকাল—"জলধির মাঝেতে ভুবন মাঝে দ্বার।" ইহা হইতে ১৪৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে, কেন না প্রথমতঃ প্রাচীন বা অর্বাচীন কোন পুঁথিতে এই কালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ কষ্টকল্পনা ছাড়া ইহার মানে হয় না। বংশীবদনের কাব্যের ভাষায় প্রাচীনত্বের কোন ছাপ নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে তাঁহার জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফেলিতে হয়। কবির বংশলতিকাও এই অনুমানের সমর্থন করে। আমরা সন্দেহের সুবিধা দিয়া কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রসঙ্গেই আলোচনা করিলাম।

বংশীবদনের নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পাটবাড়ী (বা পাতুয়ারী) গ্রামে। কবি দরিদ্র ছিলেন, মনসার পাঁচালী গাহিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বংশীবদনের পত্নীর নাম সুলোচনা। একমাত্র সন্তান কন্যা চন্দ্রাবতী উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত ছড়া কিছু কিছু ময়মনসিংহ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, মনসামঙ্গল-রচনায় বংশীবদন চন্দ্রাবতীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর সহিত জয়চন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকুমারের বিবাহ স্থির হয়। জয়চন্দ্র

কিন্তু এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। চন্দ্রাবতী আর বিবাহ করেন নাই। এই কাহিনী ময়মনসিংহ অঞ্চলে আধুনিক কালে প্রচলিত এক পল্লীগাথায় বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে রচিত বিস্তর মনসামঙ্গল-কাব্যের খণ্ড পালা পাওয়া গিয়াছে। কবির সংখ্যাও অজস্র। তবে ইঁহাদের প্রায় বারো আনাই ছিলেন গায়ন মাত্র। পূর্ববঙ্গে রচিত মনসার পাঁচালীর মধ্যে বংশীবদনের কাব্যই শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও বংশীবদন কোথাও অযথা পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন নাই। অপরদিকে ইঁহার কাব্য গ্রাম্যতা দোষ হইতে একেবারে মুক্ত। তবে এই উৎকর্ষ কতটা বংশীবদনের আর কতটা আধুনিক কালের গ্রন্থ-সংস্কর্ত্তার তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। এক বংশীদাস একটি শ্রীকৃষ্ণচরিতকাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল-কাব্য-রচনার কাল দেওয়া নাই, তবে কাব্যটি পড়িলে প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা না হইবার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। ইনিও ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার লোক। ইঁহার নিবাস ছিল বোরগ্রামে। কবির পূর্ণ নাম ছিল রামনারায়ণ দেব, এবং উপাধি ছিল সুকবিবল্লভ। জাতি কায়স্থ। কবির পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। কাব্যহিসাবে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ নিন্দনীয় নহে। পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল সাধারণতঃ পদ্মাপুরাণ নামেই উল্লিখিত হইত।

নারায়ণ দেবের আরও একখানি কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কাব্যটির নাম কালিকাপুরাণ। ইহাতে হর-গৌরীর গৃহস্থালীর কথা এবং গৌরীর পিতৃগৃহে আসিয়া শরৎকালীন পূজা গ্রহণ ইত্যাদি বাঙ্গালাদেশ-প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি মনসামঙ্গলের উপোদ্ঘাতস্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল-কাব্যগুলি সব যেমন আগাগোড়া একই কবির লেখা, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন মনসামঙ্গল-পাঁচালীগুলি তেমন নয়। আদ্যন্ত একটিমাত্র কবির ভণিতাযুক্ত কোন মনসামঙ্গলের পুথি পূর্ববঙ্গে পাওয়া যায় নাই। এইভাবে বিচার করিলে আমরা পূর্ববঙ্গে দুইটি প্রধান মনসামঙ্গল-পাঁচালী সমষ্টি বা School পাই। একটি বিজয় গুপ্ত-প্রভৃতির, অপরটি নারায়ণ দেব-প্রভৃতির। নারায়ণ দেবের কাব্যের প্রসার উত্তর-বঙ্গ হইতে আসাম অবধি প্রচারিত হইয়াছিল। বিজয় গুপ্তের কাব্য সঙ্কীর্ণ-সীমাবদ্ধ। বংশীবদন প্রভৃতির পাঁচালী নারায়ণ দেব প্রভৃতির পাঁচালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

রচয়িতা-বিষয়ে একত্ব না থাকার জন্য এবং প্রামাণিক প্রাচীন পুথির অভাব হেতু পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল-লেখকদের কাব্যবিচার প্রায়ই অনৈতিহাসিকতার পর্য্যায়ে রহিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দী

১৫

আদি মোগল শাসন—ঐতিহাসিক উপক্রমণিকা

মোগল সৈন্যের দ্বারা বিজিত হইয়া বাঙ্গালাদেশ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাটের শাসনাধীনে আসে, কিন্তু পাঠান সুলতানদিগের সেনাপতিরা এবং সামন্ত রাজারা সহজে মোগল-শাসন মানিয়া লয় নাই। শেষ পাঠান সুলতান দাউদ খান কর‍্রাণীর রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই দেশে উপদ্রব অশান্তি সুরু হইয়াছিল। স্থানীয় শাসনকর্তারা এবং খাজনা আদায়কারী কর্ম্মচারীরা প্রজা-দিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মুকুন্দরাম স্বীয় আত্ম-কাহিনীর মধ্যে এইরূপ অত্যাচারের একটি সুন্দর বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন।

মোগল-রাজত্বের অপেক্ষাকৃত উপদ্রবহীন সুশাসনের মাঝে আসিয়া লোকে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির সর্বাঙ্গীণ জাগরণের উন্মেষ হইয়াছিল। এই সুযোগে বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্ফুটতর হইতে লাগিল। বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নিজের পথ খুঁজিয়া লইয়া স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; রাজার বা রাজ-দরবারের সাহায্য তাহার পক্ষে আর আবশ্যক হইল না। মোগল-শাসনের যোগাযোগে বাঙ্গালাদেশ স্বতন্ত্র রাজ্য না থাকিয়া উত্তরাপথের প্রদেশবিশেষ হইয়া পড়িল। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার কতিপয় প্রধান পারিষদের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সহিত বাঙ্গালাদেশের সংযোগ নিকটতর হইয়াছিল। এখন রাষ্ট্রীয় এবং বাণিজ্যিক সংযোগও স্থাপিত হইল। ইহার ফল কিন্তু অবিমিশ্রভাবে মঙ্গলজনক হইল না। বাঙ্গালার যে সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য ছিল তাহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রভাবে পড়িয়া নষ্ট হইবার পথে বসিল। মোগল-দরবারের ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বর বাঙ্গালী জমিদার-ধনীদিগের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিল এবং তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ভোগবিলাসের পথে নামাইয়া দিয়া ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিল।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের এক প্রবল জোয়ার আসিল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বা তাঁহাদের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদিগের দ্বারা ভক্তিধর্ম্মের যে প্রচার ও প্রসার হইতেছিল তাহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। ভক্তিবাদের মূলকথা বৈষ্ণব অবৈষ্ণব

সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সাধারণ লোকে নিজের নিজের ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণবীয়ভাবে জীবনযাপন করার মধ্যে কোন অসঙ্গতি খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু এই সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম (দত্ত) দাস এবং শ্যামানন্দ দাসের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার কতকটা উগ্ররূপ ধারণ করিল। এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্রীনিবাস ছিলেন মুখ্য। ইনি স্বীয় আধ্যাত্মিকতার ও পাণ্ডিত্যের বলে বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজ্যে বৈষ্ণবতার প্লাবন আনেন এবং তাহার ফলে অল্পকালের মধ্যে দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করিয়া দুর্ধর্ষ সীমান্ত অঞ্চলগুলি, বৈষ্ণবধর্ম্মের বন্যায় আপনহারা হইয়া ভাসিয়া গেল। নরোত্তম মুখ্যভাবে প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অনবদ্য চরিত্র এবং শিষ্যগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বরেন্দ্রভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। রসকীর্ত্তন বা পদাবলীকীর্ত্তনের রূপ-স্থষ্টি নরোত্তমের অক্ষয় কীর্ত্তি। কীর্ত্তন-গানে বৈষ্ণব-পদাবলী-কাব্য-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সুরমাধুর্য্যের ও মৃদঙ্গ-তাল-বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের এই নিজস্ব সঙ্গীতকলা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের তুলনায় শ্যামানন্দের ব্যক্তিত্ব বিশেষ স্পষ্ট না হইলেও ইঁহার ও ইঁহার প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের প্রযত্নে মেদিনীপুর-অঞ্চলে এবং উড়িষ্যার প্রত্যন্তে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

শ্রীনিবাসের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে যাজিগ্রামে। ইনি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ, শান্তিপুর, পুরী ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুচর যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহাদের দর্শনলাভ করেন; তাহার পর বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোপাল ভট্টের শিষ্য হন এবং জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শিক্ষা করিয়া ব্যুৎপন্ন হন। বৃন্দাবনে নরোত্তমের ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময়ে জীব গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটি সিন্দুক ভরিয়া বৃন্দাবনে রচিত বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গালাদেশে প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। পথে বিষ্ণুপুরের নিকট জঙ্গলে রাজার অনুচর দস্যুরা ধনরত্ন আছে মনে করিয়া সেই সিন্দুকগুলি লুণ্ঠন করে। ইহাতে শ্রীনিবাস মনে দারুণ আঘাত পান, এবং যতদিন পুস্তকগুলি পাওয়া না যায় ততদিন সেই দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, স্থির করেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের যুবরাজ হাম্বীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বীর হাম্বীর তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবতায় মুগ্ধ হন এবং সপরিবার ও সানুচর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বীর হাম্বীরের প্রযত্নে পুস্তকগুলির উদ্ধার হইল ও অনতিকালমধ্যে বিষ্ণুপুর-রাজ্য ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল পুরাপুরি বৈষ্ণব হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাসের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে, কীর্ত্তন-গানে, মহোৎসবে দেশ মাতিয়া উঠিল।

শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ, ঈশ্বরী দেবী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবী। ইঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক পুত্র এবং দুই-তিনটি কন্যা ছাড়া সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নরোত্তম পদ্মাতীরবর্ত্তী খেতরী গ্রামের কায়স্থবংশীয় জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ (রায়) দত্তের পুত্র ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম নারায়ণী। বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম ঈশ্বরনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর খুল্লতাতপুত্র সন্তোষ (রায়) দত্তের উপর বিষয়কর্ম্মের ভার দিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তথায় ইনি স্বীয় ভক্তিনিষ্ঠায় এবং আন্তরিকতায় লোকনাথ গোস্বামীর চিত্ত জয় করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বলাভ করিয়া ধন্য হইলেন। নরোত্তম জীব গোস্বামীর এবং বৃন্দাবনের অপরাপর বৈষ্ণব মহান্তদিগেরও স্নেহসৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। এইখানেই শ্রীনিবাসের এবং শ্যামানন্দের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তম দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ঘরে বসিয়া ভজনসাধনায় মন দেন। ইঁহার এবং ইঁহার শিষ্যগণের প্রচেষ্টার ফলে উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া পড়ে। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে নরোত্তম নিজগৃহে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ এবং রাধাকৃষ্ণের কয়েকটি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট্ মহোৎসবের আয়োজন করেন। খেতরীর এই উৎসবে বাঙ্গালা দেশের সকল প্রধান বৈষ্ণব আগমন করেন। তখনও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর কেহ কেহ জীবিত ছিলেন; তাঁহাদেরও পরম সমাদরে আনয়ন করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যেই ভাবুক নরোত্তমের এবং মার্দ্দঙ্গিক দেবীদাসের চেষ্টায় রসকীর্ত্তন সৃষ্ট হইয়াছিল। নানা দিক্ দিয়া বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে এই উৎসব একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। খেতরীর উৎসব বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল।

খেতরী-উৎসবে প্রবর্ত্তিত প্রাচীনতর কীর্ত্তন-পদ্ধতি স্থানীয় পরগনার নাম অনুসারে (?) গড়ানহাটী বা গরানহাটী নামে প্রসিদ্ধ হয়। পরে মধ্য রাঢ়ে রানীহাটী বা রেনেটী পদ্ধতি, দক্ষিণ রাঢ়ে মান্দারনী বা ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতি এবং উত্তর রাঢ়ে মনোহরশাহী পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। এখনকার দিনে মনোহর-শাহীরই চলন।

শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। ইঁহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায় ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামে। ইনি বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় শ্রীনিবাস এবং নরোত্তম হইতে হীন ছিলেন না। শ্রী-চৈতন্যের অন্যতম আদ্য অনুচর অম্বিকা-কালনা-নিবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ ছিলেন ইঁহার গুরু। মেদিনীপুরে এবং উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে শ্যামানন্দ তাঁহার ধনী শিষ্য রসিকানন্দের সবিশেষ সহায়তা পাইয়াছিলেন।

১৬

বৈষ্ণব-পদাবলী, বৈষ্ণব-জীবনী ও কৃষ্ণলীলা-কাব্য

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বৈষ্ণব গীতিকাব্যের বিশেষ করিয়া চর্চা হইতেছিল। এই-সময়ের পদকর্ত্তারা প্রায় সকলেই হয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের, নয় নরোত্তমের, নতুবা শ্রীখণ্ডের নরহরি-রঘুনন্দনের শিষ্য-প্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাস নিজেও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি বেশি পদ রচনা করেন নাই। নরোত্তম ছিলেন বিশিষ্ট পদাবলী-রচয়িতা। ইনি কয়েকখানি বৈষ্ণব-সাধনবিষয়ক ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সর্বোৎকৃষ্ট। নরোত্তমের প্রার্থনাপদগুলি বড় মর্ম্মস্পর্শী। আধ্যাত্মিক আকুলতা ও ভক্তহৃদয়ের গভীর বিশ্বাস এই পদগুলির মধ্যে ব্যাকুল ঝঙ্কার তুলিয়াছে। নরোত্তমের শিষ্যদিগের মধ্যে বড় পদকর্ত্তা ছিলেন বসন্ত রায় এবং শিবরাম। শ্রীনিবাসের শিষ্যদিগের মধ্যে কবি-হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী, মোহনদাস, রাধাবল্লভদাস এবং যদুনন্দন।

গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষ্ণব গীতিকবিদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অন্যায় হয় না। ইনি কেবল ব্রজবুলিতেই পদ রচনা করিতেন। ইঁহার পদগুলি ভাষার গাঢ়তায় ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যে বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে তুলনীয়। ছন্দের ঝঙ্কারে গোবিন্দদাস তাবৎ প্রাচীন বাঙ্গালী কবিকে পরাস্ত করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম পিতামহের মত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে পদরচনা গতানুগতিক পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে যে-ভাবে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই-ভাবেই সকলে পদ রচনা করিয়া যাইতেন; নূতনত্ব বা স্বাতন্ত্র্য দেখাইবার কোন চেষ্টা বা প্রবৃত্তি ছিল না। সেই জন্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের রচিত পদের তুলনায় এ যুগের পদাবলী কাব্যসৌন্দর্য্যে প্রায়ই নিকৃষ্ট ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামগোপাল দাস, জগদানন্দ, জয়কৃষ্ণ, মনোহর দাস এবং "হরিবল্লভ"-ছদ্মনামধারী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মহান্তদিগের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল। দুই একখানি ছাড়া সবগুলিতেই মুখ্যতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্যের এবং গৌণতঃ নরোত্তম দাসের জীবনী ও কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বইটিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত আছে। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিমাণও নিতান্ত

অল্প নহে। যাহা হউক, বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রেমবিলাসের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। নিত্যানন্দদাসের আসল নাম ছিল বলরাম দাস, নিত্যানন্দদাস নাম গুরুদত্ত। ইনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের অনুচর ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরাম দাস। প্রেমবিলাস রচনা করিবার পূর্বে নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্রেরও একখানি জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। বইটির নাম ছিল বীরচন্দ্রচরিত। এই বইয়ের কোন পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই। প্রেমবিলাসের মধ্যে গ্রন্থকার বীরচন্দ্রচরিতের উল্লেখ করিয়াছেন।

গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত বিরচিত হয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভার্য্যা গৌরাঙ্গপ্রিয়ার আদেশে। কবি গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্য ছিলেন। বইটিতে শ্রীনিবাসের জন্ম হইতে তাঁহার পুত্র গতিগোবিন্দের জন্ম পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমামৃত প্রেমবিলাসের পরে রচিত হয়, কেননা ইহাতে নিত্যানন্দদাসের গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্যদিগের মধ্যে যদুনন্দন নামধারী দুইজন ছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ এবং অপরজন বৈদ্য। বৈদ্য যদুনন্দন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একজন বড় কবি ছিলেন। ইনি অনেক ভাল ভাল পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং রূপ গোস্বামীর দুইখানি নাটক —বিদগ্ধমাধব এবং দানকেলিকৌমুদী, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্য এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। বইটির নাম কর্ণানন্দ। কাব্যটি হেমলতা দেবীর অনুরোধে রচিত হইয়া ১৫২৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। অনেকের মতে কর্ণানন্দ প্রক্ষিপ্ত রচনা। এই শ্রেণীর আর একখানি বই—বৈষ্ণবামৃত —সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ যদুনন্দনের (নামান্তর যদুনাথ) রচনা।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ বীররত্নাবলী নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। রাজবল্লভ-বিরচিত বংশীবিলাস বা মুরলীবিলাস নামক গ্রন্থে কবির প্রপিতামহ শ্রীচৈতন্য-পারিষদ বংশীবদন চট্টের এবং খুল্লতাত ও গুরু রামচন্দ্র গোস্বামীর ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্মোপদেশ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্য এবং বীরচন্দ্র-সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন সংবাদ আছে। বৈষ্ণব-সাধনার ইতিহাসের পক্ষে বইখানি মূল্যবান্।

গোপীবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গলে শ্যামানন্দের প্রধানতম শিষ্য রসিকানন্দ বা রসিক মুরারির জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। গ্রন্থকার ছিলেন রসিকানন্দের শিষ্য।

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-সহচরদিগের অন্যতম ছিলেন জগদীশ পণ্ডিত। ইঁহার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে জগদীশচরিত্রবিজয় গ্রন্থে। শিষ্যপরম্পরায় গ্রন্থকার আনন্দদাস জগদীশ পণ্ডিত হইতে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত শ্রীনিবাস আচার্য্য-সম্বন্ধে সর্বশেষ পুস্তক হইতেছে মনোহরদাস-রচিত অনুরাগবল্লী। বইখানি ক্ষুদ্র। বৃন্দাবনে ১৬১৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বইটি সম্পূর্ণ হয়। মনোহর কবির গুরুদত্ত নাম।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বনে "দ্বিজ" ঘনশ্যাম একটি "চতুষ্কাণ্ডপরিমিত" কৃষ্ণলীলাকাব্য লিখিয়াছিলেন। কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার লিপিকাল ১৬০৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। ভনিতায় কবি প্রায়ই "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর," "কৃষ্ণকিঙ্কর," "কিঙ্কর দ্বিজ" অথবা শুধু "কিঙ্কর" নাম ব্যবহার করিয়াছেন। পরশুরাম চক্রবর্তীর কাব্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। অভিরামের গোবিন্দবিজয়, "দ্বিজ" হরিদাসের মুকুন্দমঙ্গল, এবং কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। হরিদাস শ্রীনিবাস-আচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব অবলম্বনে ইনি একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভবানন্দের হরিবংশ একটি নূতন ধরণের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। উহার সহিত সংস্কৃত হরিবংশ-পুরাণের কোনই সম্পর্ক নাই। কবি উত্তর-পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। কাব্যটিতে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় আছে, তবে ভাবের দিক্‌ দিয়া সব সময়ে এখনকার পাঠকদিগের রুচিকর নহে। ভবানীদাস ঘোষ রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন পালার পুঁথি অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অবলম্বনে ছোট ছোট বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বই অনেকগুলিই রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে নন্দকিশোর দাসের রসপুষ্পকলিকা বা রসকলিকা, রামগোপাল দাসের রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী বা রসকল্পবল্লী, এবং রামগোপালের পুত্র পীতাম্বরের রসমঞ্জরী এবং অষ্টরসব্যাখ্যা। রসকল্পবল্লী সম্পূর্ণ হয় ১৫৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-সংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে এইটি প্রাচীনতম বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বৈষ্ণবসাধন-ঘটিত অজস্র ছোটখাট বইয়ের মধ্যে মনোহরদাস-বিরচিত দিনমণিচন্দ্রোদয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মনোহরদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের নীলাচলবাসী ভক্ত রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র। ব্রজমোহন দাসের চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপও একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

১৭

মহাভারত ও রামায়ণ পাঁচালী

প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরে কাশীরাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কাশীরাম ছিলেন জাতিতে কায়স্থ, উপাধি দেব। ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকখানি মহাভারত পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কোন কোনটির প্রচারও হইয়াছিল। কাশীরামের কাব্য এই লেখকদের কবিযশ লুপ্ত করিয়া দিল। পৈতৃক আদি নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রাণী পরগনার মধ্যে সিঙ্গি গ্রামে। ইঁহাদের পিতা কমলাকান্ত সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চলিয়া যান। সম্ভবতঃ সেখানে ইঁহাদের আত্মীয়স্বজন ছিল। কাশীরামের কথা হইতে জানা যায় যে ইঁহাদের গুরু মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিহরপুরের বাসিন্দা ছিলেন। কমলাকান্ত যখন দেশত্যাগ করেন তখন হয়ত কাশীরামের কাব্য খানিকটা রচিত হইয়াছে।

কাশীরামেরা ছিলেন তিন ভাই ; জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, কনিষ্ঠ গদাধর। তিন ভাই-ই সুকবি ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বাল্যকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করেন। ইঁহার লেখা দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। একখানি শ্রীকৃষ্ণবিলাস—শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত বর্ণনামূলক কৃষ্ণলীলা কাব্য। দ্বিতীয়টির নাম ভক্তিভাবপ্রদীপ—এখানি হইতেছে তাঁহার গুরু জয়গোপাল-রচিত ভক্তিভাবপ্রদীপ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। জয়গোপালের পিতা ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম পারিষদ সুন্দরানন্দ।

সমগ্র মহাভারত-পাঁচালী কাশীরামের নামে সুপ্রচলিত হইলেও কাশীরাম চারি পর্বের বেশি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

> আদি সভা বন বিরাটের কত দূর,
> ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।

এই প্রবাদ যে অমূলক নয় তাহা সম্প্রতি প্রতিপন্ন হইয়াছে নন্দরাম দাসের উদ্যোগ পর্বের একটি প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার হইতে। নন্দরাম লিখিয়াছেন,

> কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা,
> ভারথ ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা।
> ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত,
> প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।
> আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক,
> রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।

ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে,
রচিবে পাণ্ডব-কথা পরম সাদরে।
আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেই ক্ষণ,
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ।
কাশীদাস মহাশয় আশীর্ব্বাদ দিল,
তাঁহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।

নন্দরামের পিতার নাম নারায়ণ। ইনি বোধ হয় কাশীরামের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন।

নন্দরামও পাণ্ডববিজয় সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কাশীদাসি মহাভারতের শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্ব দুইটি অন্ততঃ কৃষ্ণানন্দ বসুর রচনা। পরবর্ত্তী কালে সর্বত্র কাশীরামের ভনিতা আসিয়া গিয়াছে।

কাশীরামের পাণ্ডববিজয় বা ভারত-পাঁচালী বাঙ্গালায় লেখা মহাভারত কাব্যসকলের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ। রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় অবধি ইহা সমান সমাদর ও মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস কাশীরামের কাব্য।

কাশীরামের ভারত-পাঁচালীর আদি-পর্ব সম্পূর্ণ হয় ১৫২৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার দুই বৎসর পরে বিরাট-পর্ব সম্পূর্ণ হয়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের রচিত কাব্যের নাম জগন্নাথমঙ্গল, সংক্ষেপে জগৎ-মঙ্গল। এই বইতে পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যসূচক পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জগন্নাথমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১৫৬৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। সপ্তদশ শতাব্দীর অপর জগন্নাথমঙ্গল কাব্য হইতেছে উত্তরপূর্ববঙ্গ-নিবাসী চন্দ্রচূড় আদিত্য রচিত গ্রন্থ। কাব্যটি উৎকল-খণ্ড অবলম্বনে লেখা হইয়াছিল ১৫৯৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের মধ্যেও একটি ক্ষুদ্র জগন্নাথমঙ্গল পালা আছে।

কাশীরাম ছাড়া আরও দুই-চারিজন কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণানন্দ বসুর পাণ্ডববিজয় কাব্যের শুধু শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। "দ্বিজ" হরিদাসের অশ্বমেধ-পর্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঘনশ্যামদাস, অনন্ত মিশ্র এবং চন্দনদাস (দত্ত) মণ্ডল—ইঁহারাও শুধু জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। বিশারদের বন-পর্ব ও বিরাট-পর্ব মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বিরাট-পর্ব সম্পূর্ণ হয় ১৫৩৩ বা ১৫৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১২ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে। উড়িষ্যাবাসী কবি সারলও বিরাট-পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত কাব্য পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। রাজেন্দ্র দাসের

শুধু আদি পর্ব্বের এবং রামনারায়ণ দত্তের শুধু দ্রোণ পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

কোচবিহারের রাজাদের সভায় পড়িবার জন্য মহাভারত অবলম্বনে একাধিক কাব্য রচিত হইয়াছিল। মহারাজ বীরনারায়ণের রাজ্যকালে (১৬২৭-৩২) রামকৃষ্ণ কবিশেখর কিরাত-পর্ব রচনা করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের আদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ সমগ্র মহাভারত পাঁচালী রচনা শুরু করেন। এই কাজে সহায়তা ও অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন দ্বিজ রামেশ্বর ও তৎপুত্র কৃষ্ণ মিশ্র। উত্তরবঙ্গে এই কাব্যটি সুপ্রচলিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে দুই একখানি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অদ্ভুত-আচার্য্যের কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুত-আচার্য্যের বই উত্তরবঙ্গে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। এমন কি, কৃত্তিবাসের প্রচলিত সকল সংস্করণেই অদ্ভুত-আচার্য্যের কাব্যের কোন না কোন অংশ ঢুকিয়া গিয়াছে। কবির প্রকৃত নাম ছিল নিত্যানন্দ। ইঁহার নিবাস ছিল পাবনা জেলায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে পাঁচালী লিখিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। এই কারণে রামশঙ্কর আচার্য্যও তাঁহার কাব্যে অদ্ভুত-আচার্য্য ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন। "দ্বিজ" লক্ষ্মণ এবং কৈলাস বসুও অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

১৮

মনসামঙ্গল, দেবীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গল কাব্যখানি লেখা হইয়াছিল। যদিও ইহার পূর্ব্বে এবং পরে আরও কয়েক খানি মনসামঙ্গল রচিত হইয়াছিল তথাপি আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠতার জন্য পশ্চিমবঙ্গে এইটিই এখন পর্য্যন্ত একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কাব্যটির রচয়িতা ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ ছিলেন কায়স্থ। অনেক স্থলে ভনিতায় ইনি নিজেকে কেতকাদাস—অর্থাৎ কেতকার (মনসার) সেবক—বলিয়াছেন। ক্ষমানন্দের নিবাস ছিল পূর্ব-দক্ষিণ রাঢ়ে, দামোদরের তীরে কোন গ্রামে, সম্ভবতঃ সেলিমাবাদের নিকটে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্ত্তা বারা খানের মৃত্যুর অল্প কিছু কাল পরে কাব্যটি রচিত হয়।

"মঙ্গল"-কাব্য প্রায়ই দেবতার স্বপ্নাদেশে রচিত—অন্ততঃ কবিরা তাহাই বলেন। মুকুন্দরামের পর হইতে যে সকল রাঢ়ীয় কবি মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা প্রথা দাঁড়াইয়া যায় দেবতার নিগ্রহ-অনুগ্রহ উপলক্ষ্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ

দেওয়া। এই বিবরণে প্রায়ই দেখা যায় যে, কবি স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃপক্ষের বা জমিদারের লাঞ্ছনায় অথবা ঘরের লোকের তাড়নায় গৃহ-পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন এবং পথে দেবতা তাঁহাকে প্রথমে নিগৃহীত করিয়া পরে অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছেন এবং স্বীয় মাহাত্ম্যকাব্য বা "মঙ্গল" রচনা করিতে আদেশ দিতেছেন। এই ধরণের আত্মপরিচয় ক্ষমানন্দের কাব্যেও পাওয়া যায়। ক্ষমানন্দ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

কবিরা বাস করিতেন চন্দ্রহাসের পুত্র বলিভদ্র (পাঠান্তরে বলভদ্র) মহাশয়ের তালুকে। বলিভদ্রের মৃত্যু হইল তিন নাবালক পুত্র রাখিয়া। ইহাদের অভিভাবক হইলেন আস্কর্ন (বা আস্কনি) রায়। তালুকের ভার পড়িল ইহাদের গুরুমহাশয় প্রসাদের উপর। প্রসাদ ছিল মুকুন্দরামের সময়ের রায়জাদা উজীরের মত।

তিন পুত্র অল্প-বয় প্রসাদ গুরুমহাশয়
তালুকের করে লেখাপড়া,
তাহার কলম বশে প্রজা নাহি রহে দেশে
সর্বনগর হইল কাঁথড়া।

সেলিমাবাদ পরগনার ফৌজদার (?) বারা খাঁ এই সময়ে যুদ্ধে নিহত হইলে অরাজকতার অন্ত রহিল না। তখন ক্ষমানন্দের পিতা শঙ্কর মণ্ডল গ্রাম পরিত্যাগ করা স্থির করিলেন। ইঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আস্কর্ন (পাঠান্তরে আস্কনি) রায়ও তাহা অনুমোদন করিলেন,

শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি
গ্রাম ছাড় রাত্রের ভিতরে।

প্রসাদ খবর পাইয়া খুশি হইল।

প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্গিত পাইল মাত্র
পলাইবে শঙ্কর মণ্ডল,
প্রসাদ হরিষ হইয়া যুক্তি দিল আশ্বাসিয়া
ধান্য কিছু না দিল সম্বল।

সপরিবারে শঙ্কর মণ্ডল দক্ষিণমুখে চলিলেন।

নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথপুর পাই
প্রাতঃকাল নিশি অবসান,
তথা তেলি লম্বোদর উত্তরিতে দিল ঘর
হাঁড়ি চালু সিধা গুয়া পান।

সেখানে রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই রামতারণ মণ্ডল তাঁহাদিগকে অল্প কিছু ভূসম্পত্তি দিয়া স্থিত করাইলেন। একদিন কবির মা তাঁহার দুই পুত্রকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন,

তোমরা কি রাজার বেটা, ঘরে নাই খড়-কুটা,
দেখ পুত্র পরের আশ্রম।

যাও, তদারক করিয়া খড় কাটিয়া আন গিয়া।
মাতার ভর্ৎসনায় কবিরা দুই ভাই তখন চলিলেন খড় কাটিতে। কবি লিখিতেছেন,

মনে করি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয়,
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই,
অবসান দেখি বেলা, গ্রামের উত্তরে জলা,
খড় কাটিবারে দোঁহে যাই।

সেখানে গিয়া ক্ষমানন্দ দেখিলেন, পাঁচ ছয় জন ছেলে খোলা দিয়া জল সিঁচিয়া মাছ ধরিতেছে। কবি খড় কাটিবার কথা ভুলিয়া গিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া মাছধরা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারও লোভ হইল মাছ ধরিতে।

আগে কহিলাম গিয়া মৎস্য ধর আমা লৈয়া
তারা বলে ইহা নাহি হয়,
যত মৎস্য ধর্যাছিল সকল কাড়িয়া নিল
অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয়।

বয়স অল্প হইলেও ক্ষমানন্দের বুদ্ধি অপরিপক্ক ছিল না। তিনি ভাইকে দিয়া মাছ ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেরা খানিকক্ষণ গালাগালি দিয়া শেষে যে যাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। নির্ভীকচিত্তে কবি একেলা সেই জলায় রহিয়া গেলেন খড় কাটিবার জন্য। আচম্বিতে ঝড় উঠিল। মাঠে যাহারা খাটিতেছিল তাহারা পগারে আশ্রয় লইল। কবি যাইব কি যাইব না ভাবিতেছেন এমন সময়ে কোথা হইতে এক বস্ত্রবিক্রয়কারিণী মুচিনী আবির্ভূত হইল।

সে ভূমের কর্ম্মকেরা পগারে গোড়ায় তারা
খড় কাটিবারে রহি আমি,
মুচিনীর মূর্ত্তি ধরি বলে মাতা বিষহরি
জিজ্ঞাসিলা কোথা থাক তুমি।

ক্ষমানন্দকে সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলে ভাবিয়া মনসা কাপড় বেচিতে চাহিলেন।

বিচিত্র বসনখানি বিষহরি বিনোদিনী,
কাপড় কিনিবা বলি যাচে,
বসন দেখাইয়া মোরে কপট চাতুরি করে
ফিরয়া চাহি নাহি দেখি পিছে।

মাঝ-মাঠে কাপড়ওয়ালীর কাণ্ড দেখিয়া ক্ষমানন্দের তাক লাগিয়া গিয়াছে। পিঁপিড়ার কামড়ে চটক ভাঙ্গিয়া গেল।

চরণে পিপীড়া খায়, ক্ষমানন্দ ফিরয়া চায়,
সমুখে মুচিনী অদর্শন,
মুচিনীরে না দেখিয়া মনে সবিস্ময় হৈয়া
ভাবি দুঃখ এই কোন জন।

তখন সদয় হইয়া দেবী তাঁহাকে স্বরূপ দেখাইলেন।

দেবী বলিলেন, আমার এই যে রূপ দেখিলে, ইহা কাহারও কাছে বলিও না, বলিলে তোমার ভাল হইবে না ; তুমি আমার কাহিনীকাব্য রচনা করিয়া গাহিয়া বেড়াও, তোমার ভাল হইবে। কবি বলিতেছেন,

দেখিলাম যেই দৃষ্টে মানা কৈল প্রকাশিতে
কহিলে না হবে তোর ভাল,
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা করহ ছন্দ
আমার মঙ্গল গাইয়া বুল।

ক্ষমানন্দ যে শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন তাহার পরিচয় কাব্যটিতে যথেষ্ট আছে। চাঁদ সদাগর ও বেহুলার চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। ছোট বড় কোন ভূমিকাই অতিমানুষ বা অমানুষ হয় নাই।

অন্য এক ক্ষমানন্দ-রচিত একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র মনসামঙ্গল কাব্য মানভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে। কাব্য-হিসাবে এটিও নিন্দনীয় নহে।

বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলের পুঁথি বীরভূম ও মানভূম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এই কাব্যটিতে নানা বিশেষত্ব আছে। এটি ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

কালিদাসের মনসামঙ্গল ১৬১৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইনি বর্দ্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলের অধিবাসী জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে।

"দ্বিজ" হরিরামের কাব্য এবং "দ্বিজ" জনার্দ্দন-বিরচিত ব্রতকথা-জাতীয় নিতান্ত ক্ষুদ্র কাব্য মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালী ছাড়া আর কোনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় নাই। এই কাব্য দুইটিতে শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে, কালকেতুর উপাখ্যান নাই। এই সময়ে রচিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক প্রায় সকল কাব্যই মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। "দ্বিজ" কমললোচনের চণ্ডিকা-মঙ্গল বা চণ্ডিকাবিজয়, অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, এবং রূপ-নারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল এইজাতীয় কাব্য। কমললোচনের নিবাস ছিল রঙ্গপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগনায়। ভবানীপ্রসাদ এবং রূপনারায়ণ দুইজনেই ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলও এই ধরণের কাব্য। উপরন্তু ইহাতে বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান, মীননাথের কাহিনী এবং বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। কাহারও কাহারও মতে গোবিন্দদাসের কাব্য ১৫৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

শিবের গৃহস্থালীবিষয়ক অথবা শিবমাহাত্ম্যসূচক ছোটখাট কাব্যও দুই-একখানি পাওয়া গিয়াছে। "দ্বিজ" রতিদেবের ক্ষুদ্র কাব্য মৃগলুব্ধ ১৫৯৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইনি চাটিগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কবিচন্দ্রের শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বিষ্ণুপুরের রাজা বীরসিংহের রাজ্যকালে—অর্থাৎ ১৫৬৯-৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে—রচিত হইয়াছিল।

১৯

রায়মঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের এক কবি উচ্চ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন না হইলেও কাব্যের বিষয়বস্তু-নির্বাচনে অসামান্যতা দেখাইয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণরাম দাস, জাতিতে কায়স্থ, বাসস্থান কলিকাতার উত্তরে বেলঘরিয়ার নিকটে নিমিতা বা নিমতা গ্রাম। ইঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস, এবং পুত্রের নাম নীলকণ্ঠ। কৃষ্ণরামের রচিত পাঁচখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—প্রথম কাব্য কালিকামঙ্গল; ইহাতে দেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার-ব্যপদেশে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি সায়িস্তা খানের সুবেদারির সময়ে (১৬৬৯-৭০ বা ১৬৭৯-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ প্রথম দফাতেই) রচিত হইয়াছিল। কবির বয়স তখন বিশ বৎসর। দ্বিতীয় রচনা ষষ্ঠীমঙ্গল ব্রতকথাজাতীয় ক্ষুদ্রকাব্য। ইহা রচিত হয় ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় কাব্য রায়মঙ্গল একেবারে নূতন জিনিষ। ইহাতে সুন্দরবন অঞ্চলে উপাসিত ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আনুষঙ্গিকভাবে ঐ অঞ্চলের কুম্ভীর-দেবতা

কালুরায়ের এবং পীর বড় খাঁ গাজীর কাহিনীও দেওয়া আছে। দক্ষিণরায়ের পূজা সুন্দরবন অঞ্চলে অর্থাৎ চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, এবং এই প্রদেশে বড় খাঁ গাজীর গান এখনও উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। গাজী সাহেবের এবং কালুরায়ের গান ময়মনসিংহ অঞ্চলেও অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বরিশাল অঞ্চলে ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর দেবতা এখনও পূজা পাইতেছেন বাস্তুদেবরূপে। নিম্নবঙ্গে যখন জঙ্গল কাটিয়া বসবাস ও আবাদ শুরু হয় তখন প্রধান বিপদ্ ছিল ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই দেবতার পূজা ঐ অঞ্চলেই প্রচলিত হইয়াছিল। সাপের ভয় সর্বত্র, তাই মনসার পূজা অধিকতর ব্যাপক হইয়াছিল।

রায়মঙ্গল কাব্য ১৬০৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু দক্ষিণরায়ের বিষয়ে এইটিই প্রথম কাব্য নহে। কৃষ্ণরাম তাঁহার পূর্ববর্ত্তী এক কবি মাধব-আচার্য্যের কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

রায়মঙ্গলের মূল আখ্যায়িকা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

বড়দহের বণিক্ দেবদত্ত জলপথে সিংহল হইতেও দূরবর্তী তুরঙ্গ সহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর ধনপতি যেমন সমুদ্রবক্ষে "কমলে কামিনী" দৃশ্য দেখিয়াছিল, পথে দেবদত্তও তদনুরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিল—সাগরমধ্যে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি। কথায় কথায় এই দৃশ্যের ব্যাপার দেবদত্ত তুরঙ্গের রাজা সুরথকে জানাইল এবং তাঁহাকেও দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু দেবদত্ত প্রতিজ্ঞামত রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ফলে জীবনের মত কারারুদ্ধ হইল। এদিকে বহুদিন কাটিয়া গেল; দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার কোন বার্ত্তা না পাইয়া নিজেই তুরঙ্গ সহরে যাইতে প্রস্তুত হইল। জাহাজ গড়িবার জন্য রতাই নামক "বাউল্যা" বা কাঠুরিয়াকে বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতে হুকুম করিল। সেই বনে দক্ষিণ-রায়ের অধ্যুষিত একটি বড় গাছ ছিল। সে গাছটি কাটাতে দক্ষিণরায়ের এক অনুচর রায়ের নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া রায় বড় বড় ছয় বাঘকে পাঠাইলেন; তাহারা রতাইয়ের ছয় ভাইকে মারিয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণী দিলেন যে, তাঁহার প্রিয় তরু ছেদন করিয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহার ছয় ভাইকে বধ করিয়াছেন; রতাই যদি পুত্রবলি দিয়া দক্ষিণরায়কে পূজা করে তবে তাহার ছয় সহোদর পুনর্জীবিত হইবে। রতাই শুনিয়া তদ্দণ্ডেই দক্ষিণরায়কে পূজা করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়া রতাইয়ের পুত্র ও ছয় ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন।

রতাই কাঠ লইয়া আসিল। হনুমান এবং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া নৌকা গড়িয়া দিল। পুষ্পদত্ত সাত ডিঙ্গা ভাসাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। মাতা সুশীলার

স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া দক্ষিণরায় পুষ্পদন্তকে সঙ্কটে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পথে পুষ্পদন্ত পীর বড় খাঁ গাজীর মোকাম এবং দক্ষিণরায়ের পূজা-স্থান দেখিল। এ বিষয়ে পুষ্পদন্ত কিছুই জানে না বলিয়া জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিলে কর্ণধার পীর ও দক্ষিণরায়ের কাহিনী, তাঁহাদের বিরোধ ও মিলনের ইতিহাস, এইরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল—

ধনপতি নামে পূর্বে এক সদাগর ছিল। সে বাণিজ্যে যাইবার পথে এই স্থানে নামিয়া দক্ষিণরায়ের পূজা করিল। পীরের পূজা না করায় অনেক ফকীর আসিয়া তাহাকে পীরের পূজা করিতে বলিল। বণিক্ কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ফকীরদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহারা গাজীর নিকট গিয়া নালিশ করিল যে, দক্ষিণরায় আর তাহার ব্যাঘ্র অনুচরদিগের প্রতাপে আর কেহ পীরের সমাদর করিতেছে না; তাহারা অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গাজী ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, দক্ষিণরায়কে বাঁধিয়া আন। গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ফকীরেরা গিয়া দক্ষিণরায়ের প্রতিমা ও পূজাস্থানের ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণকে মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল। এদিকে বটে বেনে আসিয়া দক্ষিণরায়কে এই কথা জানাইল। দক্ষিণ-রায় তাঁহার ব্যাঘ্র-সৈন্য লইয়া গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গাজীরও সৈন্য সব বাঘ। রায়ের সেনাপতি বাঘ হীরা, গাজীর সেনাপতি বাঘ দাউদ খান। উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল, গাজীর দল হারিয়া পলাইয়া গেল। গাজী তখন স্বয়ং রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন; উভয়ের মধ্যে ঘোর লড়াই বাধিল। পরাজিতপ্রায় হইয়া গাজী রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাত হাজার বাঘ মারিয়া অবশেষে রায়ের গলায় কোপ বসাইলেন। দক্ষিণরায়ের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধড়ে লাগিয়া যেমন ছিল তেমনই হইল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধের প্রকোপে পৃথিবী রসাতলে যায় দেখিয়া ঈশ্বর অর্দ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধ-পয়গম্বর বেশে আবির্ভূত হইয়া দুইজনকে ক্ষান্ত করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়া দিলেন। মিটমাটের সর্ত্ত হইল যে পীরের মোকামে তাঁহার পূজা নির্বিঘ্নে চলিবে এবং দক্ষিণরায়ের মুণ্ডের প্রতিমা দক্ষিণ দেশে পূজিত হইবে, আর কালুরায়ের অধিকার হইবে হিজলী অঞ্চলে দরিয়ার পীররূপে।

এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদন্ত সে স্থান হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমুদ্রে পড়িয়া রামেশ্বর ছাড়িয়া কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে পিতার মত সেও সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিল।

ইহার পর গল্পের পরিণতি চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ। পুষ্পদন্ত প্রতিজ্ঞায় হারিয়া গিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। অবশেষে দক্ষিণরায়ের স্মরণ লওয়ায় তিনি আসিয়া পিতাপুত্রকে উদ্ধার করিলেন। তাহার পর যথারীতি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পিতার সহিত পুষ্পদন্তের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আর একখানি রায়মঙ্গল কাব্যের পুঁথির কয়েকখানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। কবির নাম রুদ্রদেব। কাব্যের রচনাকাল বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দী।

কৃষ্ণরামের অপর রচনা হইতেছে শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল।

২০

বাঙ্গালী মুসলমান কবি

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব পদাবলী-রচনার বন্যাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভাবধারায় সমগ্র দেশের চিত্তভূমি পরিষিক্ত হইয়া সরস ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাতেই গীতিকাব্য এরূপ প্রাচুর্য্য লইয়া পুষ্পিত ও বিকশিত হইতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালার মুসলমানগণ পূর্ব্ব হইতে মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান কবিরাও যে বাঙ্গালায় ও ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্য রচনা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন নসীর মামুদ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলি রাজা এবং আলাওল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও যে মুসলমান এক কবি বাঙ্গালা কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যুবরাজ ফীরুজ শাহার আদেশে কবিরাজ দ্বিজ শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়াছিলেন, একথা যথাস্থানে বলিয়াছি। দ্বিতীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য লেখেন এক মুসলমান কবি শা বিরিদ (? বারিদ) খান। এই কাব্যটিরও খণ্ডিত পুঁথি পাইয়াছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। রচনাকাল জানা যায় নাই বটে তবে রচনারীতির সাক্ষ্য অনুসারে কাব্যটিকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের পরে ফেলা যায় না। ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত প্রাচীন। যেমন,

> বেলি শেষে অস্ত জাএ সূর,
> বাসাখানি মাগি তোহ্মাপুর।
> জবে আর ভিন্ন দেশী পাই,
> যত্ন করি তাহাক রহাই।
> মনে ভীত বাসি তোহ্মা দেখি
> মহারাজ-সুত হেন লখি।. .
> অবেলাএ অতিথি পাইয়া
> অসাধু রহএ উপেখিয়া।
> সাএ ধনি বুঝাই তোহ্মাএ
> উপেক্ষিতে আহ্মা না জুআএ।

কবি বেশ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার কাব্যশক্তিও ছিল। শা বিরিদ খানের এই যে পরিচয়টুকু তাঁহার কাব্যে পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও পাঠের গোলমাল আছে বলিয়া মনে হয়—

পীআর মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান,
তান পুত্র জি ঠাকুর তিন সিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুছা খান।..
তান সুত গুণাধিক নানু রাজা ময়াল্লিক
জগতপ্রচার যশ খ্যাতি,
তান পুত্র অরজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী।

কবি কি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন?

পাঠান-রাজগণের এবং তাঁহাদের পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের অনুকরণে আরাকান রাজসভা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। আরাকান রাজসভার মারফৎ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আরব্য-উপন্যাসজাতীয় গল্প বা লৌকিক কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী হইয়াছিল। আরাকান রাজসভায় সংবৰ্দ্ধিত সব কবিই মুসলমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছেন দৌলৎ কাজী। আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্ম্মার (রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) কর্ম্মচারী আশ্‌রফ খানের আদেশে ইনি সতী ময়নামতী বা লোরচন্দ্রানী কাব্যের পত্তন করেন, কিন্তু শেষ করিবার পূর্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। বহুকাল পরে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল বাকি অংশ রচনা করিয়া দিয়া কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

আরাকানের, এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। আলাওল তাঁহার কাব্যগুলিতে নিজের জীবনকথা যাহা বলিয়াছেন তাহা বৈচিত্র্যবিহীন নয়। তাঁহার পিতৃভূমি এবং জন্মস্থান ছিল ফতেহাবাদ পরগনায় জালালপুর গ্রামে। নিজের দেশের প্রশংসায় কবি পঞ্চমুখ হইয়াছেন—

গৌড়মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ,
আলিম ওলমা হিন্দু বৈসয় বিশেষ।
বহুল দানিশমন্দ খলিফা আলিম,
আলিম জনের কথা দিতে নাহি সীম।
হিন্দুকুলে ব্রাহ্মণ সজ্জন যতী সতী,
মধ্যেতে গোপাল আর শিব ভাগীরথী।

দেশের অধিকারী ছিলেন মজলিস কুতুব। আলাওল ছিলেন তাঁহার এক অমাত্যের পুত্র। পিতাপুত্রে কোন কার্য্যবশতঃ নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন, পথে পোর্ত্তুগীস জলদস্যু "হার্মাদ"-এর হাতে পড়িলেন। দুই পক্ষে লড়াই হইল। বহু যুদ্ধ করিয়া কবির পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কবি বলিয়াছেন, নিজে মরিলে গোল চুকিয়া যাইত, কিন্তু "না পাইল শহীদ-পদ আছে আয়ুলেশ।" তিনি একেলা অনেক কষ্টে রোসাঙ্গে (অর্থাৎ আরাকানে) চলিয়া আসিলেন এবং সেখানে রাজার অশ্বারোহী সেনায় ভর্ত্তি হইলেন। শীঘ্রই রোসাঙ্গে আলাওলের পাণ্ডিত্যের এবং সঙ্গীত-নৈপুণ্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতে লাগিল।

তালিব-আলিম বলি আমীরে ফকীরে,
অন্নবস্ত্র দিয়া আমা পোষেন্ত আদরে।

অচিরে রোসাঙ্গের রাজার অন্যতম মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের সহিত আলাওলের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। মাগন ঠাকুর গুণী লোক ছিলেন। বহু কবি পণ্ডিত সঙ্গীতবেত্তা ইঁহার সাহায্য পাইত। ইঁহার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,

মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন,
তান গুণসূত্র হৈল গ্রীবাতে বন্ধন।
গুণিগণ থাকন্ত তাঁহার সভা ভরি,
গীত-নাট যন্ত্রতন্ত্র রঙ্গভঙ্গ করি।

মাগন ঠাকুরের মারফৎ অপর মন্ত্রী সুলেমানের সঙ্গেও কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। মাগনের ও সুলেমানের অনুরোধে কবি কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন।

শাহ্ শুজা আরংজেবের ভয়ে পলাইয়া রোসাঙ্গ-রাজের আশ্রয় লইলে আলাওল শুজার সহিত পরিচিত হন। কোন কারণে রাজার অসন্তোষ-ভাজন হইয়া শুজা নিহত হন। ইতিমধ্যে আলাওলের কবিখ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার খাতির সর্বত্র, বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর,
নাট-গীত সঙ্গত শিখাইনু বহুতর।
বহুল মহন্তলোক কৈল গুরুভাব,
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহু লাভ।
মোর বাক্য এথা প্রচারিল সব ঠামে,
রসগ্রন্থ প্রচারিনু মহন্ত সব নামে।

তাহার পর কবি বলিতেছেন,

এই মতে সুখে গোঙাইনু কত কাল,
বৃদ্ধকালে অবশেষে হইল জঞ্জাল।
হই পরদেশী আমি আলাওল হীন,
গোসাঙ্গে হইনু বন্দী আপনা কুদিন।

শাহ্ শুজার সঙ্গে আলাওলের ঘনিষ্ঠতার ছল ধরিয়া কবির প্রতিপক্ষ মীর্জা নামক এক রাজকর্ম্মচারী রাজার কান ভাঙ্গাইল। কবি লিখিয়াছেন,

পাপিষ্ঠের কূটচক্র রাজা না বুঝিয়া,
কারাগারে দিল মোরে ক্রোধান্বিত হইয়া।

পঞ্চাশ দিন কারাগারে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া কবি অবশেষে মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু রাজরোষে পড়ায় তাঁহার ধনসম্পদ্ ও খ্যাতিপ্রতিপত্তি নষ্ট হইল। কবি বলিতেছেন,

আয়ু ছিল শেষ আমায় রাখিল বিধাতাএ,
সবে ভিক্ষা জীবরক্ষা ক্লেশে দিন যাএ।
মন্দকীর্ত্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ,
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ।

কিন্তু গুণীর গুণ কবির যশ বেশিদিন চাপা পড়িয়া থাকিবার নয়। সৈয়দ মুসা নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আলাওল বন্ধুরূপে পাইলেন। কারাগারে ঢুকিবার পূর্বে কবি মাগন ঠাকুরের আদেশে একটি কাব্যের পত্তন করিয়াছিলেন। কারাগার হইতে বাহির হইয়া কবি যে দুর্দ্দশায় পড়িলেন তাহা কাব্যচর্চার পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না। শেষে দীর্ঘ নয় বৎসর পরে সৈয়দ মুসার অনুরোধে কাব্যটি সমাপ্ত করেন। সৈয়দ মুসার অনুরোধ প্রথমে কবি স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধকালে আর বই লেখা উচিত নয়।

রচিনু বহুল গ্রন্থ নানা আলঝাল,
রহিতে ঈশ্বরভাবে যুক্ত এহি কাল।

সৈয়দ মুসা উত্তর করিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তাই বটে, কিন্তু তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, "অন্যজন নহ তুমি আলাওল গুণী"—

যাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ,
তাহার মৌনতা যুক্ত না হএ বিশেষ।
তুমি না রচিলে খণ্ডবাক্য রহে পোথা,
এরূপ রচিতে আর কেবা আছে এথা।

তাহার পর তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার পক্ষে তিনটি অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিলেন—

তিন মতে কাব্য সাঙ্গ করিতে উচিত,
প্রথমে বচনমাত্র মাগন বিদিত।
দিয়জে কুমাররাজ রহিল বন্ধনে,
পড়িলে পুস্তক দুঃখ উপজএ মনে।
তৃতীয়ে আমার প্রেম রাখিতে জুয়াএ,
এড়াইতে নারিবা রচিবা সর্বথাএ।

কবি মহৎ লোকের অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া "গ্রন্থকর্ম্মে" প্রবেশ করিলেন।

রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মসুদ শাহ ছিলেন সূফীমতের কাদেরী সম্প্রদায়ের গুরু। আলাওল ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই সাহায্যে কবি রোসাঙ্গ-রাজের অনুগ্রহ পুনরায় লাভ করিলেন। রাজার অনুগ্রহে আলাওল বাকি খাজানা সব শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হইলেন। রোসাঙ্গ-রাজ "নবরাজ মজলিস" শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার সভায় অনেক গুণিব্যক্তি থাকিলেও আলাওলের খাতির হইল সর্বাধিক। কবি বলিয়াছেন,

বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভাএ,
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অতি ভাএ।

রাজা একদিন সম্ভ্রান্ত অনুচর এবং পোষ্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া উত্তমরূপে খাওয়াইলেন। সকলে তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল যে রাজা ধন্য, যেহেতু তিনি হিন্দুদের মত লোকহিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

হিন্দুজাতি নানা দুঃখে উপর্জএ মাল,
মন্দির পুষ্করণী দেয় কতেক জাঙ্গাল।
সুজনে বাড়ায় বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য,
অন্তকালে নাম রহে সেই ধন্য ধন্য।

রাজা বলিলেন, যতই ভাল হউক কেবল স্বদেশে এ সব কীর্ত্তি খ্যাতি-লাভ করে, এবং ইহা চিরস্থায়ীও নয়; কবির কীর্ত্তির সঙ্গে গাঁথা থাকিলেই রাজার নাম চিরস্মরণীয় হয়। রাজা তখন আলাওলকে আদেশ করিলেন, "মম নামে গ্রন্থ রচ কহিনু বিশেষ।" কবি মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন, একে তাঁহার বৃদ্ধকাল, তাহার উপর "বিশেষে রাজার দায় অধিক জঞ্জাল," সর্বোপরি "নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।" রাজা বুঝিলেন কবিকে সংসারপোষণ-

দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি না দিলে তাঁহার কবিত্বস্ফূর্ত্তি হইবে না, তিনি কবির উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। রাজা হইতেছেন

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুইনতে বাপ,
না রাখিলে তান বাক্য গুরুতর পাপ।

তাই আলাওল কবি নিজামীর ফারসী কাব্য ইস্‌কন্দর-নামা অবলম্বনে দারা-সিকন্দর-নামা কাব্য রচনা করেন।

শুধু আরাকানের নয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। ইঁহার প্রথম রচনা পদ্মাবতী ইঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। আরাকান-রাজ থদো মিন্‌তারের (রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২) মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মলিক মুহম্মদ জায়সী হিন্দী ভাষায় পদ্মাবতী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই অবলম্বন করিয়া আলাওল তাঁহার প্রথম কাব্যটি রচনা করেন। কিন্তু ইহা হিন্দীর অনুবাদ মাত্র নয়। আলাওল পদ্মাবতীর কাহিনীকে কিছু নূতনতর রূপ দিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন,

এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে করি ভক্তি,
স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজ মন-উক্তি।

হিন্দু পুরাণ-কাহিনী আলাওল জানিতেন গভীরভাবে। পদ্মাবতী কাব্যে রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীর ইঙ্গিত অজস্র আছে। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাও তাঁহার অপরিচিত ছিল না। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব পদ্মাবতীর গানগুলিতে বিশেষ করিয়া পড়িয়াছে। গোরক্ষনাথের ও গোপীচন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীরও আভাস আছে। সংস্কৃত অলঙ্কার ও সঙ্গীত-শাস্ত্র কবির ভাল করিয়া পড়া ছিল। সর্ব্বোপরি আলাওল ছিলেন সূফী সাধক। তাই তাঁহার এই রোমান্টিক কাব্যটিতে প্রচলিত কাব্যকলার সঙ্গে অধ্যাত্ম-অনুভূতির মিলনে অভিনব রসসৃষ্টি হইয়াছে। নিজের সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,

প্রেম-কবি আলাওল প্রভুর ভাবক,
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রভুর আশক।

কবির কথার আমরা প্রতিধ্বনি করিতে পারি—

তাহার পিরীতি-রসে চন্দন-তুলন যশে
বশ হৈল গুণিগণ-মন,
হীন আলাওল-বাণী সুরস পয়ারখানি
পদে পদে অমৃতসিঞ্চন।

আরাকান-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার মন্ত্রী সুলেমানের অনুরোধে আলাওল দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্য লোরচন্দ্রানী সমাপ্ত করেন (১৬৫৯)। সৈফু-লু-মুলুক্ বদিউ-জ্-জমাল, হপ্ত পয়্কর, এবং দারাসিকন্দর-নামা—এই তিনখানি কাব্যের কথাবস্তু ফারসী হইতে গৃহীত হইয়াছিল। প্রথম কাব্যটি মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার পর মাগন ঠাকুরের মৃত্যু এবং কবির কারাবাসের জন্য কাব্যটি অসমাপ্ত রহিয়া যায় ও অবশেষে দীর্ঘ নয় বৎসর পরে সৈয়দ মুসার অনুরোধে সমাপ্ত হয় (১৬৬৮ বা ১৬৬৯)। হপ্ত পয়্কর রচিত হয় শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের অনুরোধে। তৃতীয় কাব্যটি রচিত হয় স্বয়ং শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আদেশে (আনুমানিক ১৬৭১)। আলাওলের পঞ্চম গ্রন্থ তয়ফা বা তোহ্‌ফা (১৬৬৩-৬৪) কাব্যও ফারসীর অনুবাদ। ইহার বিষয় হইতেছে মুসলমান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কৃত্য ইত্যাদি।

সৈফু-লু-মুলুক্ বদিউ-জ্-জমাল এবং দারাসিকন্দর-নামা কবির সর্বশেষ রচনা। আলাওলের মন তখন অধ্যাত্মচিন্তায় তৎপর। তাই প্রথম বইটির উপসংহারে পাঠকের কাছে তিনি এই কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

> যদি মোর কবি-রসে সুখ লাগে মনে,
> আশীর্বাদ কর মোরে ফকীরি কারণে।
> ঈশ্বরেতে মুক্তি মাগ আমার লাগিয়া,
> পড়িও ফতেহা একমুষ্টি অন্ন খাইয়া।

দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পদের ভনিতার শেষে আলাওল গুরুর দোহাই দিয়াছেন।

আলাওলের কবিত্বশক্তি সে যুগের পক্ষে অসাধারণ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় এবং সাহিত্যে অধিকার তাঁহার প্রগাঢ় ছিল। সর্বোপরি কবির গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার আদিরসাত্মক কাব্যগুলিকে একটি সংযত-শ্রী দান করিয়াছে। আলাওলের রচনাভঙ্গি সরল অথচ অলঙ্কৃত, এবং আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য আদৌ নাই। দৌলৎ কাজীর মত আলাওলও অনেকগুলি চমৎকার বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন।

সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নামেই এই গ্রামের নাম। কবিও পরাগলের বংশধর ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া সৈয়দ সুলতানের লেখা তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ এবং শবে মেয়েরাজ বা ওফাৎ রসুল বা হজরৎ মহম্মদ-চরিত। জ্ঞানপ্রদীপ যোগসাধনার বই। নবীবংশ বিরাট কাব্য, ইহাতে বারজন নবী অর্থাৎ অবতার বা মহাপুরুষের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নবীদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং শ্রীকৃষ্ণও

আছেন। পুরাণের অনুকরণে রচিত এই কাব্যটিতে কবি বিশেষ সুক্ষ্মদর্শিতা সহকারে হিন্দু এবং ইস্লাম ধর্ম্মের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় কাব্যখানি বোধ হয় স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, নবীবংশেরই শেষ ভাগ।

শেখ চাঁদের রসুলবিজয় কাব্যও হজরৎ মহম্মদের জীবনী লইয়া বিরচিত। কাব্যটি বিশেষত্বহীন নহে। শাহ মহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখাও সুন্দর কাব্য। মহম্মদ খানের মক্তুল্‌-হোসেন (রচনাকাল—হিজিরা ১০৫৬ সাল) কাব্যে কারবালার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

২১

ধর্ম্মঠাকুরের ছড়া ও ধর্ম্মপুরাণ-কাহিনী

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা-দেশে যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহা পরে তান্ত্রিক সহজযানে রূপান্তরিত হয়। এই সহজযানের সাধকদিগের রচিত গীত বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন। বৌদ্ধ গানগুলি সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি। বৈদিক সূর্য্যপূজার সঙ্গে নাথপন্থী শৈব যোগীদিগের ধর্ম্মমত এবং অনার্য্য ধর্ম্ম-বিশ্বাসও কিছু কিছু মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্মপূজার উদ্ভব হইয়াছিল। ধর্ম্মপূজক-দিগের নিজস্ব সৃষ্টিতত্ব এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী দেশে পূর্বাপর প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে, বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গলে এবং অন্যান্য প্রাচীনতর বাঙ্গালা কাব্যে আমরা ধর্ম্মপূজকদিগের নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনীর কিছু কিছু পরিচয় পাই। ধর্ম্মঠাকুরের পূজা সমাজের নিম্নস্তরের জাতিদিগের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে ধর্ম্ম-পূজা ও ধর্ম্মের গান গাওয়া ছিল নিতান্ত গর্হিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানিক গাঙ্গুলী বলিয়াছেন, "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।" এককালে অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এবং তাহার পূর্বে ধর্ম্মপূজা সমগ্র পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। এখনও পূর্ববঙ্গে ধর্ম্ম ঠাকুরের গাজনের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে চৈতপরবের "পাট"-পূজায়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইহা কেবল রাঢ় দেশে, বিশেষ করিয়া দামোদর ও অজয় নদের তীরবর্ত্তী ভূভাগে, সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। এখনকার দিনের ধর্ম্মঠাকুরের বড় বড় স্থান প্রায় সবই এই অঞ্চলে। সম্ভবতঃ এই স্থানেই ধর্ম্মপূজার বিকাশ হয়। ধর্ম্মপূজকদিগের পুরাণের মতে সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী বল্লুকা, যাহার তীরে ধর্ম্মের আদিস্থান "হাকন্দ" বা "হাখণ্ড" অবস্থিত, তাহা দামোদরের

প্রাচীন উপনদী বাঁকার শাখানদী ছিল। এই নদীর শুষ্ক খাত বর্দ্ধমান জেলার পূর্বাংশে মেমারীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনও স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যাহা হউক, সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ধর্ম্মঠাকুর শিব অথবা বিষ্ণু অথবা উভয়ের সহিত একীভূত হইতে আরম্ভ করেন, এবং ধীরে ধীরে ধর্ম্মপূজা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যে অজ্ঞাতসারে আপন স্থান অধিকার করিয়া লইতে থাকে। ধর্ম্মঠাকুরের কোন প্রতিমা নাই, কূর্ম্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডই ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক। এখন যে সকল স্থানে ধর্ম্মঠাকুর আছেন তাঁহারা প্রায়ই শিবরূপে পূজিত হইতেছেন; এই সব স্থানে ধর্ম্মের গাজন শিবের গাজন রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইসব ঠাকুর যে মূলে শিব-ঠাকুর ছিলেন না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি অনুষ্ঠানে—শিবের গাজনে পাঁঠা বলি হয় না, কিন্তু ধর্ম্মের গাজনে শুধু পাঁঠা কেন, হাঁস পায়রা ও শূকর বলিও হইয়া থাকে।

ধর্ম্মপূজাঘটিত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে। এক শ্রেণীর গ্রন্থে ধর্ম্মপূজার শাস্ত্র ও বিধান এবং তদনুযায়ী মন্ত্র ও ছড়া ইত্যাদি আছে—এগুলিকে ধর্ম্মপূজকের কড়চা বা সাধুভাষায় ধর্ম্মপুরাণ বলা যাইতে পারে। অপর শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেছে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য—ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; এগুলি ধর্ম্ম-পূজার সময়ে অথবা অন্য সময়ে রামায়ণ চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদির মত নিষ্ঠাসহকারে গাওয়া হইত এবং এখনও অনেক স্থানে হইয়া থাকে।

ধর্ম্মপুরাণ বা ধর্ম্মায়ন ধর্ম্মপূজার সংহিতা। ইহার তিন ভাগ—(ক) সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, (খ) ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তনকাহিনী, এবং (গ) ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি। প্রথম দুই ভাগকেই যথার্থ শূন্যপুরাণ বলা যাইতে পারে। কোন কোন পুঁথিতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অংশকে "শূন্যশাস্ত্র" বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মপুরাণে যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। অনুমান হয় যে এদেশের প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসীদের শাস্ত্রে অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে বর্ণিত সৃষ্টির আদিকথার সঙ্গে ইহার কিছু মিল আছে। ধর্ম্মপুরাণে কথিত সৃষ্টিকাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।

সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, কেবল ছিলেন শূন্য। শূন্যরূপ সনাতন ব্রহ্ম তখন জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তাঁহার ইচ্ছার ফলে অকস্মাৎ এক বৃহৎ বুদ্বুদের উৎপত্তি হইল।

> ফটিক-ধবল হইল বিম্বুর বরণ,
> বিম্বুর উপরে ধর্ম্ম করিল আসন।

ডিম্বাকৃতি বিম্বুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া শূন্যরূপী ধর্ম্ম ভ্রূণে পরিণত হইলেন

এবং কালক্রমে পরিণত আকার ধারণ করিয়া বিম্ব ভেদ করিয়া বাহির হইলেন। তখন তিনি বিপদে পড়িলেন,

নিরাকার ছিলেন শূন্যেতে কর‍্যা ভর,
আকার হইতে ধর্ম্ম হইলা ফাঁফর।

তখন ভর করিবার জন্য স্থান-নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইল। তাহার পূর্বে তিনি আদ্যাশক্তিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়াই ধর্ম্মের তপস্যা করিতে মন হইল। তিনি তিন-কোণ পৃথিবীর দুইভাগ ছাড়িয়া একভাগের মধ্যস্থলে বল্লুকানদীর সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার তীরে এক বটগাছের কাছে সিদ্ধপীঠস্থান প্রস্তুত করিলেন। অনাদ্যদেব তখন বল্লুকার জলে যোগ-ধ্যানে বসিলেন, বাহন উলূকও বটগাছের ডালে বসিয়া যোগ করিতে লাগিল। এদিকে অনাদ্যের বিরহে আদ্যাদেবী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য হইতে কামের জন্ম হইল। দেবী কামদেবকে বল্লুকায় পাঠাইয়া দিলেন ধর্ম্মের ধ্যানভঙ্গ করিতে। কামের প্রভাবে ধর্ম্মের ধ্যানভঙ্গ হইল। অকালে তপস্যাভঙ্গ হওয়ায় "বল্লুকায় কালকূট বিষ উপজিল।" উলূক মাটির ভাঁড়ে সেই বিষ ধরিয়া রাখিল এবং অন্যত্র রাখা নিরাপদ্ নয় ভাবিয়া আদ্যার কাছে গিয়া বিষভাণ্ড দিয়া কহিল,

দেখিলে হইবে ভয় খাইলে সে মরণ,
হেন বিষ পাঠাইয়া দিল নিরঞ্জন।

উলূক বল্লুকায় গিয়া পুনরায় যোগে বসিল। ধর্ম্মের বিরহে দেবীর মন আরও উচাটন হইলে তিনি সেই কালকূট বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। আদ্যা তিন গণ্ডূষে সেই বিষ ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু যাহা ভাবিয়া বিষ খাইলেন তাহা হইল না।

বিষপান কৈল দেবী মরিবার তরে,
ত্রিদেবা জন্মিয়া গেল দেবীর উদরে।

রজঃ, সত্ব এবং তমঃ তিন গুণে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের জন্ম হইল। তিন ভাই পিতাকে না দেখিয়া কাতর হইয়া দেবীকে তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বল্লুকার উদ্দেশ বলিয়া দিলেন। তাঁহাদের আগমন বুঝিয়া ধর্ম্ম নিরাকার হইয়া গেলেন। বল্লুকায় অনাদ্যকে না দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বল্লুকার জলে বসিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন। তপস্যায় বার বৎসর কাটিয়া গেলে ধর্ম্মের মনে দয়া হইল। তখন

বুঝিতে তিনের মন দেব ধর্ম্মরায়,
ছয় মাসের মড়া হইয়া জলে ভেসে যায়।

ব্রহ্মার নিকটে সেই পচা মড়া ভাসিয়া আসিতে তিনি জল নাড়িয়া দূরে ঠেলিয়া দিলেন। মড়া-রূপী ধর্ম্ম বিষ্ণুর নিকটে গেলেন, বিষ্ণুও ঠেলিয়া দিলেন। তাহার পর শিবের নিকট যাইতে তিনি ধর্ম্মকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন

> ব্রহ্মা বিষ্ণু বল্যা শিব উচ্চস্বরে ডাকে,
> শীঘ্রগতি আইস হেতা তপ কর কাকে?

শিবের কাছে সকল কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহাকে নির্বুদ্ধি বলিয়া উপহাস করিলেন।

> এত শুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু কহেন শিবকে,
> জন্ম ভরি দেখা নাই পিতা বল কাকে?
> নির্বুদ্ধি হইলে শিব না সোঁদ্যায় কানে,
> পিতা বল্যা বল্য নাই কেহ পাছে শুনে।
> এইমত ভাস্যা গেছে আমাদের কাছে,
> জলের মড়া কান্ধে কর্যা পিতা বল্যা নাচে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবকে অনুনয় করিয়া মড়া জলে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। শিব তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দিব্যজ্ঞান দিলেন, তাঁহারা সকল কথা বুঝিতে পারিলেন। এমন সময়ে বটগাছ হইতে উলূক তাঁহাদের কাছে উড়িয়া আসিয়া মড়াকে ধর্ম্ম-ঠাকুর বলিয়া সনাক্ত করিল। তখন তিন দেব উলূককে মৃতদেহ-সংকারের স্থান নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। উলূক ভাবিয়া দেখিল, "আপোড়া পৃথিবী সংসারের মধ্যে নাই," তবে দক্ষিণদিকে সমুদ্রের কূলে বার আঙ্গুল অদগ্ধ স্থান আছে। কিন্তু সেখানেও হইবে না, কেন না সেস্থানে কলিযুগে ধর্ম্মঠাকুর অবতার হইবেন বলিয়া রক্ষিত আছে। শেষে উলূক এই উপায় বলিয়া দিল যে শিবের জানুর উপরে দাহ করা যাইতে পারে যদি বিষ্ণু কাষ্ঠ হইতে রাজী হন। বিষ্ণু আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন। সব ঠিকঠাক হইলে তাঁহাকে কোন কাজে লাগান হইল না বলিয়া ব্রহ্মা দুঃখিতচিত্তে নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে কাঠে আগুন ধরিয়া গেল। এদিকে আদ্যা দেবী ধর্ম্মের সংকার হইতেছে মনে মনে জানিতে পারিয়া ত্বরিতগতিতে চলিয়া আসিয়া অনুমৃতা হইলেন। ধর্ম্মের নাভিপদ্ম বল্লুকার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, এবং আদ্যার অস্থি শিব গলায় বান্ধিয়া রাখিলেন। তিন দেবতার এই পরীক্ষায় সৃষ্টিকাহিনী শেষ হইল। তাহার পর কশ্যপ মুনির তপস্যা এবং কুন্তলা অপসরা কর্ত্তৃক তাঁহার ধ্যানভঙ্গের কথা। এই অংশটি সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় নাই।

ধর্ম্মপুরাণোক্ত এই সৃষ্টিপত্তনকাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম্মমঙ্গলের এবং কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলের প্রারম্ভে পাওয়া যায়। সহজিয়া কড়চা-গ্রন্থেও ক্বচিৎ মিলে।

ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তনকাহিনী-ভাগের দুই অংশ—(১) সদা-খণ্ড এবং (২) সাংজাত-খণ্ড। এই ভাগ কোন কোন পুঁথিতে "গীতপুরাণ"—অর্থাৎ ধর্ম্মপুরাণের গীত অংশ—বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সদা-খণ্ডে সদা ডোমের ধর্ম্মপূজার কাহিনী বলা হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম বলিতেছি

ঘোর কলিযুগে ধর্ম্মের পূজা যাহাতে প্রচলিত হয় সেজন্য অনাদ্যদেব বিশেষ চিন্তিত হইলেন। উলূক তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে আদিত্যকে পৃথিবীতে পাঠান হউক ধর্ম্মপূজা প্রচার করিতে। ধর্ম্ম সম্মত হইলেন। আদিত্য জাজপুরে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল রামাঞি পণ্ডিত। রামাঞি পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তন করিবার পূর্বে ধর্ম্ম নিজেই চলিলেন আদি ভক্ত সদা ডোমের কাছে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া উলূককে চেলা করিয়া ভাঙ্গা ছাতা মাথায় দিয়া ধর্ম্ম কাঞ্চননগর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বেনা পুকুরের পাড়ে সদার কুটীরের সমুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "সদা সদা" বলিয়া হাঁক দিয়া ঠাকুর বলিলেন,

মাঠেতে পাইলাম ঝড়্যা ভয়ে প্রাণ গেল ছেড়্যা,
ভাঙ্গা ছাতা বায়ে উড়্যা গেল,
উত্তরে চিকুর পড়ে ছাতা উড়াইল ঝড়ে,
ছাতার পাঙর সার হৈল।
সদাই ভিক্ষার আশে ভ্রমি নানা দেশে দেশে,
ছাতা মোর জীবনের দোসর,
যথোচিত মূল্য নেও, ছাতাটি ছাইয়া দেও,
ছাতা রৌদ্র-শিশিরের ঘর।

তিনি আরও বলিলেন যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, তিন দিন উপবাস গিয়াছে।

সদা প্রাণপণ যত্নে ছাতা সারাইয়া দিল এবং তাহার উপরে বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া দিল। ছাতা পাইয়া ধর্ম্মঠাকুর খুশী হইয়া সদার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,

ধন্য ধন্য সদানন্দ ধন্য তোর ভাগ্য,
নির্ম্মাণ করিয়াছ ছাতা দেবতার যোগ্য।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি ভ্রমি নানা ঠাঞি,
অবশ্য দেখিব ছাতা শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি।

ছাতা পাইয়া সন্ন্যাসী মূল্য হিসাব করিবার ছলে দেরী করিয়া শেষে সদার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সদা বিপদ্ গণিল।

সদা বলে হায় হায় বৃথা প্রাণ ধরি,
এক পুয়া নাই যে আতিথ্য সেবা করি।

সদার স্ত্রী পরামর্শ দিল, "থাকুক সন্ন্যাসী, চল পলাইয়া যাই।" ডোমনীর পরামর্শে ভুলিয়া সদা পলাইল। কিন্তু ধর্ম্মের মায়ায় দিশাহারা হইয়া তাহারা আবার কুটীরেই ফিরিয়া আসিল। ডোমনীকে সদা বলিল, দিনের বেলায় পালানো ভুল হইয়াছে।

দিবসে পালাবে বল্যা কোথাও না শুনি,
ডোম জাতি আমরা পালাতে নাই জানি।

ঘরে ফিরিয়া তাহারা দেখিল "বিচিত্র-নির্ম্মাণ পাখা কুড়্যার ভিতরে।" সদা বলিল, এ পাখা কোথা হইতে আসিল, "আমার হাতের কীর্ত্তি নহে পাখাখান।"

ডোমনী বলেন মোর বাপের গড়ন,
আমরা কেন নাই দেখি কর্য্যাছে গমন।

সদা বলিল, এখন ওসব কথা থাকুক। তুমি বাজারে পাখা বেচিয়া আইস, আমরা অতিথিসেবা করি। ডোমনী রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে বহুমূল্যে পাখা বেচিয়া দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল।

এদিকে ধর্ম্মঠাকুর পূজায় বসিলেন, সদাও ফুল-জলে ধর্ম্মপূজা করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর ফুল জল শূন্যে চলি যায়,
সদার পুষ্প জল পড়ে সন্ন্যাসীর পায়।

পূজা শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর সদাকে বলিলেন, "এই মতে পূজ নিত্য ধর্ম্মের চরণ।" ডোমনী সিধা যোগাড় করিয়া দিলে সদা ঠাকুরকে বলিল, আপনি জল তুলিয়া আনিয়া রন্ধন চড়াইয়া দিন। ঠাকুর উত্তর করিলেন, আমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছি তাই নিজের হাতে রান্না করিতে পারি না। আর,

ভক্তের অধীন হয়্যা সংসারেতে ফিরি,
অন্নব্রহ্ম হয়্যাছে রন্ধন নাই করি।

তাহার পর ঠাকুর কথার ছলে ডোমনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কর্য্যা কও তোমার বালকের নাম কি?" সদা কাতর হইয়া বলিল, "সংসারের মধ্যে মোর বেটা-বেটি নাই।" ইহা শুনিয়া

কানে হাত দিয়া সন্ন্যাসী বলেন হরি হরি,
আটকুড়ার ঘরেতে পারনা নাই করি।

সদার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িয়া গেল, ধিক্কারে সে গলায় কাটারি দিতে গেল।

ঠাকুর তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মের দোহাই যদি কাতি দেও গলে।" তাহার পর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ধর্ম্মের কাছে মানসিক কর, তাহা হইলে ধর্ম্মের দয়ায় এবং আমার আশীর্বাদে তুমি পুত্র লাভ করিবে এবং তখন আমি আসিয়া তোমার গৃহে পারনা করিব। ডোমনী বলিল, যদি পুত্র হয় তবে "পুত্র কেট্যা অবশ্য পূজিব ধর্ম্মরায়।" সন্ন্যাসী বলিলেন, যখন মানসিক শোধ দিবে "সেইকালে আসি আমি করিব পারনা।" বালক হইলে তাহার নাম লুইয়া (বা লুইধর) রাখিতে বলিয়া ধর্ম্মঠাকুর কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে সদা ডোমের পুত্র লুইধর জন্মগ্রহণ করিল। তাহার বয়স যখন বারো তখন একদিন সে রাজা হরিশচন্দ্রের চোখে পড়িল।

লুইধর সতত গুলতাই হাতে আছে,
তীর কাঁড় বাটুল মারএ গাছে গাছে।

রাজা সদা ডোমকে ডাকাইয়া বলিল, উপযুক্ত পুত্রকে কেন ঘরে বসাইয় রাখিয়াছ? আজ হইতে আমি তোমার পুত্রকে গ্রামের উত্তরে যে বাগান আছে সেখানকার রক্ষক নিযুক্ত করিলাম, তোমার "ফি-রোজ মাহিনা হইল সিকা সিকা।"

লুইধরে শিরোপা দিলেন মহারায়,
গুলতাই হাতে লুয়্যা বাগানে বেড়ায়।
কাকপক্ষ এসে যেই বসয়ে বাগানে,
লুয়্যার বাটুলে সেই হারায় পরাণে॥

একদিন ধর্ম্মের উলূক ফুলের সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই বাগানের উপরে উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক গাছের উপর বসিল। সঙ্গে সঙ্গে লুইধরের নির্ঘাত বাটুল আসিয়া তাহার বুকে বাজিল। নিতান্ত কাতর হইয়া উলূক গিয়া ধর্ম্মের চরণে নালিশ করিল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া দিয়া

ঠাকুর বলেন বাণী, শুন হে উলূক মুনি,
সেই লুয়্যা আমারে মাননা,
আমার মনে নাই ছিল, লুয়্যা ভাল জানাইল,
চল বাছা যাব দুইজনা।

সদার ভক্তির ও সত্যনিষ্ঠার পরীক্ষা লইতে ধর্ম্মঠাকুর কৈলাস ছাড়িয়া পৃথিবীতে উপনীত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বেশ হৈল দেব নৈরাকার,
ব্যাঘ্র-ছাল পরিধান শিরে জটাভার।
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হৈল আসা ধরি হাথে,
কুশা-হাতে চলিল উলূক চেলা সাথে।

সদার গৃহদ্বারে আসিয়া ঠাকুর ডাক দিলেন। ঘরের ভিতর হইতে সদা সন্ন্যাসীর স্বর চিনিতে পারিল, ভাবিল, "পারনের সন্ন্যাসী আইল এত দিনে।" তবে

সন্ন্যাসীর মনে কি আর এতদিন আছে,
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হইল সব ভুলে গেছে।

ডোমনীর সহিত যুক্তি করিয়া সদা ঘরে লুকাইয়া রহিল, কোন সাড়াশব্দ দিল না। সন্ন্যাসীর ঘন ঘন ডাকের উত্তরে ডোমনী বলিল, ঘরে কেহ নাই। উলূক সদার চালাকি বুঝিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ঘরে যদি থাক সদা প্রতিফল পাবে।"

ধর্ম্মের অনুমতি লইয়া উলূক ঝড় হইয়া সদার কুঁড়ে ঘর উড়াইয়া লইয়া বল্লুকার জলে ফেলিয়া দিল এবং সদার সন্ধানে গিয়া দেখিল, সে তালপাতা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া আছে। ধরা পড়িয়া সদা সন্ন্যাসীর পায়ে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর বলিলেন, আমাকে দেখিয়া কেন ঘরের ভিতর লুকাইয়া ছিলে? সদা উত্তর করিল, বেগারের ভয়ে। কেননা

সন্ন্যাসী মহন্ত যায় এই পথ সোজা,
ধর‍্যা নিয়া আমার ঘাড়েতে দেই বোঝা।

সন্ন্যাসী বলিলেন,

একাদশী গেছে কালি আন বাছা পারন-ডালি,
ক্ষুধায় আকুল মোর হিয়া,
শুন সদানন্দ বাছা, খাইতে বড়ই ইচ্ছা,
পারনা করিব মাংস দিয়া।

ইহার পর কাহিনীর অংশটুকু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু গল্পের পরিণতি সুস্পষ্ট। সন্ন্যাসী মৎস্যমাংসে তুষ্ট হইবেন না, শেষে লুইধরকে কাটিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিতে হইবে। তখন সন্ন্যাসী আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী সদা-খণ্ডের শেষাংশের অনুরূপ। অনুমান হয় যে কাহিনীর মূল রূপে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের শুনঃশেফ উপাখ্যানের মত, সদার পুত্র লুইধর হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্রের পরিবর্ত্তে বলি হইবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল এবং শেষে ছাগ অনুকল্প দিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল।

সাংজাত-খণ্ডে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের আদেশ পাইয়া আদিত্যদেব ব্রাহ্মণবংশে প্রচণ্ড (বা বিষ্ণুনাথ বা বিশ্বনাথ) মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে মুনি পরলোক গমন করিলেন; রামাই তখন বালক মাত্র। বিশ্বনাথ মুনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী এবং কঠোরভাষী ও বাক্‌সিদ্ধ। মার্কণ্ডের প্রভৃতি মুনিরা তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহারা

এখন পরামর্শ করিলেন যে মুনির সৎকার-কার্য্যে তাঁহারা রামাইকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন না। উপযুক্ত সময়ে সৎকার না হইলে মুনির শব বাসি-মড়া হইবে এবং তাহা হইলে রামাইকে জাতিচ্যুত করা যাইবে। রামাই আসিয়া পিতার পরলোক-গমন-সংবাদ জানাইলে "কপটে মার্কণ্ড মুনি কান্দিতে লাগিল।" মার্কণ্ডেয় সকল মুনির কাছে খবর দিতে বলিলেন। খবর দিতে দিতে প্রাতঃকাল হইয়া গেল, এবং "প্রাতঃকালেতে মুনির সৎকার করিল।"

তাহার পর মার্কণ্ডেয়কে সভাপতি করিয়া মুনিদের বৈঠক বসিল। মার্কণ্ডেয় সভা উদ্বোধন করিয়া বলিলেন,

মুনির কাছে কাহারো মর্য্যাদা নাঞি ছিল,
তার প্রতিফল পাইলেক বাসি মড়া হৈল।

মার্কণ্ডেয়ের এই নীচতায় একজন মুনি তাঁহাকে অপ্রিয় সত্য কথা শুনাইয়া দিলেন, "মড়াকে খাঁড়ার ঘা খুব ত মর্দ্দানা।" আর এক মুনি বলিলেন, এখন রামাইকে ঠেকান দায় হইবে,

মুনির ঠাঞি সভার মর্য্যাদা ছিল কিছু,
রামাঞের ঠাঞে এখন বসিবে গিয়া পাছু।

রামাইয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মুনি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে

সভাই বলেন এখন এক হইয়া থাক,
মুনির নন্দন রামে শূদ্র কর্য়া রাখ।

কিছু দিন কাটিয়া গেলে রামাইয়ের পইতা লইবার সময় হইল। রামাইয়ের মা তাহাকে মার্কণ্ডেয়ের কাছে গিয়া পইতা লইতে বলিলেন। রামাই মার্কণ্ডেয়ের কাছে যাইতে মার্কণ্ডেয় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি উপবীত ধারণ করিবার পূর্ব্বেই বেদ পাঠ করিয়া অন্যায় করিয়াছ; এখন অকাল যাইতেছে, তোমাকে পাঁচ ছয় বৎসর চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। অন্য মুনিদের কাছে গেলে তাঁহারাও সেই কথাই বলিলেন।

সবাকার কথা তখন এক হইয়া গেছে,
অকালে পৈতা রাম কোন্ শাস্ত্রে আছে।

রামাই কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট ফিরিয়া আসিল।

তাহার পর জননীর আদেশে রামাই মাতুলালয়ে চলিল উপবীত গ্রহণ করিতে। পথে যাইতে যাইতে মনে হইল, মামারাও যদি পতিত বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে তবে তো লজ্জার সীমা থাকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া রামাই ধর্ম্মকে কাতরভাবে স্মরণ করিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তের কাতর

প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি প্রতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তাম্র-উপবীত ধারণ করাইয়া ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি বলিয়া দিলেন। রামাই আনন্দিতচিত্তে গৃহে ফিরিয়া ধর্ম্মপূজায় নিরত হইল।

রামাইয়ের ধর্ম্মপূজার কথা মার্কণ্ডেয়ের কানে গেল। তিনি রামাইকে উপহাস করিয়া বলিলেন, তুই নিজেও অধঃপাতে গেলি আর বাপেরও নাম ডুবাইলি,

শালগ্রাম ছেড়্যা ধর্ম্ম পূজা ভেড়্যা
নীচ যার সেবা করে,
মদমাস দিয়া পূণিত করিয়া
সদা ডোম পূজে যারে।

মার্কণ্ডেয়ের কটূক্তি রামাইয়ের অন্তর বিদ্ধ করিল। ঠাকুর তাহার মনের বেদনা জানিয়া বলিলেন, তুমি দুঃখ করিও না, ঘর যাও, আমি তোমার সহায় আছি; আজ হইতে তোমাকে বাক্‌সিদ্ধ করিয়া দিলাম।

ধর্ম্মঠাকুরের নিন্দা করায় মার্কণ্ডেয়ের সর্বাঙ্গে ধবল দেখা দিল। মার্কণ্ডেয়ের পত্নী বলিলেন, নিশ্চয়ই কেহ তোমাকে শাপ দিয়াছে। মুনি বলিলেন, রামাই ছাড়া তো কেহ আমার কাছে আসে নাই। তবে,

ভেক কর‍্যা ভিক মেগ্যা বুলে ঘরে ঘরে,
রামা বেটা কোন্ ছার কিবা ভয় তারে।

ব্রাহ্মণী বলিলেন, অমন কথা বলিও না,

রামাঞে বলহ বেটা মুখে নাঞি লাজ,
রামাঞি পণ্ডিত যেই সেই ধর্ম্মরাজ।

তুমি রামাইয়ের পায়ে পড় গিয়া।

মুনিরা মার্কণ্ডেয়কে ঝুড়িতে বসাইয়া কাঁধে করিয়া রামাইয়ের কাছে লইয়া গেলেন। মার্কণ্ডেয় তাহার কাছে কাকুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামাইয়ের দয়ায় মার্কণ্ডেয়ের রোগ দূর হইল। মুনিরা সকলে রামাইকে ভক্তি করিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিরা রামাইয়ের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিয়া লইলেও উচ্চ-বর্ণের সমাজে রামাই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। তবে ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজায় রামাই ছিল এক এবং অদ্বিতীয় পুরোহিত। হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম্মপূজায়ও রামাই পৌরোহিত্য করিয়াছিল।

কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রামাই কেশবতী নাম্নী অন্ত্যজজাতীয়া এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিল। ইহার গর্ভে রামাইয়ের একমাত্র পুত্র ধর্ম্মদাসের জন্ম হয়।

রামাই পণ্ডিতের কাহিনী ইতিহাস নহে, গল্প। ধর্ম্মপুরাণে রামাইয়ের ভনিতা আছে। তাহাতে এক পূর্বতর রামাঞির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মপুরাণের রচয়িতা রামাই ধর্ম্মঠাকুরের আদি-পুরোহিত রামাঞি হইতে পারেন না। হরিশ্চন্দ্র রাজাও ঐতিহাসিক নয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে শুনঃশেফ আখ্যানে যে বেধস্‌-পুত্র রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ পাই তাহার মত এই হরিশ্চন্দ্রও গল্পেরই পাত্র।

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুথিগুলিতে ধর্ম্মঠাকুরের নিত্যপূজার এবং "ঘরভরা" গাজনের বিধি বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ধর্ম্ম-পুরোহিতদিগের কড়চা মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে সূর্য্যের ছড়া এবং শিবের চাষ প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনীও ধর্ম্মপূজার অঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামাঞি ধর্ম্মপূজার আদি-পুরোহিত বলিয়া ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির ছড়া এবং মন্ত্রগুলিও রামাই পণ্ডিতের নামে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আদিতে যে কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি অথবা ধর্ম্মায়নসংহিতা রচিত হয় নাই তাহার একটি বড় প্রমাণ আছে। যতগুলি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি দেখিয়াছি তাহাতে ভাবের মিল থাকিলেও ছড়াগুলির মধ্যে ভাষার এমন সাদৃশ্য নাই যাহাতে সেগুলিকে এক মূল গ্রন্থের পাঠভেদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মপূজা মূলে ছিল পুত্রেষ্টি ব্রতবিশেষ। সেই হিসাবে ইহার পদ্ধতি বহুকাল হইতে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, এবং এই মৌখিক রূপই বিভিন্ন ধর্ম্মপূজক কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে পরবর্ত্তী কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যতগুলি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিরই লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পুর্বে যায় না। কোন কোন ছড়ার ভাবে এবং ভাষায় প্রাচীনত্বের লক্ষণ থাকিলেও রচনা হিসাবে ধর্ম্মপূজার ছড়াগুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ফেলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মপূজার ছড়ার মূলরূপের প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন হিসাবে গাজনের শেষে "ঘরভাঙ্গা" অনুষ্ঠানের গানটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভাল গো ডোমের ঝি সরোবর রাখ,
সুহংস চরিয়া যায় তাহা নাই দেখ।
পখুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া,
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।
ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়,
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।

হংসা হংসী দুইজনে আকাশের জ্যোতি,
হংস চরিয়া যায় দোজ প্রহর রাতি।

ইহার মধ্যে কাহ্নুপাদের

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া,
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।

ইত্যাদি চর্য্যাগীতিটির ভাবগত প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট।

সাহিত্য হিসাবে ধর্ম্মপূজাবিধানগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। নানা কারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে তথাকথিত শূন্যপুরাণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনটি বিভিন্ন ধর্ম্মপূজাবিধান পুথি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া "শূন্যপুরাণ" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। বইটির বানান একটু অদ্ভুত রকমের; তাহা হইতে এবং বিষয়বস্তু হইতে অনেকের ধারণা হইয়া গেল যে বইটি খুবই প্রাচীন। কেহ বলিলেন, একাদশ শতাব্দী; কেহ বলিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দী; অপরে বলিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নহে। কিন্তু শূন্যপুরাণ একখানি বই নয়। ইহাতে কতকগুলি মন্ত্র, কতকগুলি ছড়া এবং কতকগুলি কাহিনীর টুকরামাত্র সঙ্কলিত আছে। এগুলি বিভিন্নকালে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। যে পুথিগুলি অবলম্বনে শূন্যপুরাণ সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের পূর্ব্বে লেখা হয় নাই, এবং সম্পাদক কর্ত্তৃক শব্দের বানানে এবং রূপে হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও সেগুলিকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ফেলা যায় না। নিরঞ্জনের উষ্মা ব্যতীত শিবের চাষ ও সূর্য্যের ছড়া অংশ দুইটিও মূল্যবান্। এগুলি সব ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতেই পাওয়া যায়।

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি গ্রন্থে এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম্মঠাকুরের যে বর্ণনা পাই তাহা বিচার করিলে ধর্ম্মঠাকুরের ইতিহাসে দুইটি পৃথক্ সূত্রের সন্ধান পাই। প্রথম সূত্র হইতেছে বৈদিক সূর্য্য দেবতার পূজা যাহার সহিত সুপ্রাচীন অনার্য্য প্রস্তর-পূজা ও কূর্ম্মপূজার সংযোগ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সূত্র অর্বাচীন; বিদেশী, সম্ভবতঃ মুসলমান যোদ্ধৃশক্তি-পূজা যাহার সহিত পরবর্ত্তী কালে ঈরান হইতে আমদানি সূর্য্যপূজার সংমিশ্রণ হইয়াছে। প্রথম সূত্রে পাই রথারোহী ধর্ম্ম-ঠাকুরের কূর্ম্মাকৃতি শিলাপ্রতিমা বা আসন, দ্বিতীয় সূত্রে পাই শ্বেত অশ্বারোহী বুটপরা সিপাহীবেশী যোদ্ধ-পুরুষ। প্রথম মূর্ত্তিতে ঠাকুর হইতেছেন শস্যের ও আরোগ্যের দেবতা, দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে তিনি পৌরাণিক কল্কি-অবতারের মত অধার্ম্মিকদ্বেষ্টা ও ধার্ম্মিকপোষ্টা। সিপাহীবেশী ধর্ম্মঠাকুরের বর্ণনা রামদাস আদকের আত্মবিবরণীতে পাই,

শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম্ম রাউতের বেশে,
দয়া করি দেখা দিল দীন রামদাসে।

ধর্ম্মঠাকুরের উপর রাজশক্তির আরোপ সম্ভবতঃ মুসলমান-প্রভাবের পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। সকল ধর্ম্মঠাকুরের নামের শেষাংশ হইতেছে "রায়"; ইহা লক্ষণীয়। অনেক প্রাচীন এবং প্রভাবশালী ধর্ম্মঠাকুরের নাম "যাত্রাসিদ্ধি" এবং "অনুকূল-কোলা"; ইহাতে অনুমান হয় যে ধর্ম্মঠাকুর অংশতঃ ছিলেন ডোম বা অনুরূপ যোদ্ধা জাতির রণদেবতা। পরে তুর্কী-অভিযানের প্রচণ্ডতা ধর্ম্মঠাকুরকে সহজেই সিপাহী বানাইয়া দিয়াছিল।

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির শেষাংশে যে "ছোট জানালি" বা "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক ছড়াটি পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান হয় যে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার অন্তর্গত (?) জাজপুরে—ধর্ম্মের গাজনের সময়ে মুসলমান আক্রমণকারীরা পূজা নষ্ট করে ও পূজাস্থান ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাদের অধিনেতা কোন ধর্ম্মান্ধ ফকীর সম্ভবতঃ নিজেকে ধর্ম্মঠাকুরের অনুগৃহীত বলিয়া জাহির করেন। তাহার ফলে ধর্ম্মোপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে—ধর্ম্মপূজা তখনও তথাকথিত নীচ জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল—ধারণা হইয়া যায় যে স্বয়ং ধর্ম্মঠাকুরই গৌড়ের সুলতানরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

> হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা,
> অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা।
> হিন্দুকুলে বোলাইলে ধর্ম্ম অবতার,
> মোমিনকুলে বোলাইলে খোদায় খোন্‌কার।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মিলনের প্রথম প্রচেষ্টা ইহারই মধ্যে দেখিতেছি। বহুকাল পরে এই প্রচেষ্টা সত্যনারায়ণ পাঁচালীর মধ্যে নবরূপ লাভ করিয়াছিল।

২২

ধর্ম্মমঙ্গল-কাহিনী

ধর্ম্মমঙ্গলগুলি যথার্থই কাব্য। সকল ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে একই উপাখ্যানের সাহায্যে "আদিদেব" ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানের মূলে আছে কতকগুলি উপকথা বা গল্প এবং হয়ত অল্পস্বল্প ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস। অনেকে ধর্ম্মমঙ্গলের পাত্রপাত্রী ও ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক বলিয়া মনে করেন। এ অনুমানের বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। ধর্ম্মমঙ্গলগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ রাঢ়ের কবির রচনা, এবং সম্ভবতঃ দুইখানি ছাড়া সবগুলিই লেখা হইয়াছিল দামোদরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বর্দ্ধমান জেলায় অথবা বর্দ্ধমান-হুগলী-বাঁকুড়ার সীমান্ত প্রদেশে। দক্ষিণ রাঢ়ের

কবিদিগের একটা বড় বিশেষত্ব আছে; ইঁহাদের প্রায় সকলেই আত্মবিবরণের সঙ্গে কাব্যরচনার ইতিহাস বা "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" কিছু না কিছু দিয়াছেন। কোন ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাই ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

গৌড়েশ্বরের অধীন ঢেকুর গড়ের সামন্তরাজ কর্ণসেনের ছয় (মতান্তরে চার) পুত্র বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে বৃদ্ধবয়সে কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহাপাত্র মন্ত্রী মহামদ বা মাহুদ্যার সম্পূর্ণ অমত ছিল। রঞ্জাবতী ছিলেন ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তিমতী উপাসিকা। তিনি পিতৃগৃহে বর্ষীয়সী সহচরী সামুলার (পাঠান্তরে সাকুলা) নিকট ধর্ম্মপূজা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুকঠোর তপশ্চর্য্যা করিবার পর ধর্ম্মের অনুগ্রহে রঞ্জাবতীর গর্ভে বৃদ্ধ কর্ণসেনের পুত্র জন্মিল লাউসেন। রঞ্জাবতীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া মহামদের ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাহার চেষ্টা হইল, কি করিয়া শিশুকে নষ্ট করা যায়। লাউসেন দেবতাদের অনুগ্রহ পাইয়া মহামদের সকল চক্রান্ত বিফল করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং লেখাপড়ায় ও যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। এখন গৌড়ে গিয়া রাজার নিকট নিজের বাহুবল-কৌশল প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করিতে তাঁহার বাসনা হইল। পুত্রের নির্বন্ধাতিশয্যে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী লাউসেনকে গৌড়ে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। পোষ্য-ভ্রাতা কর্পূরধবলকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন গৌড়ের উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে প্রথমে পড়িল জালন্দার গড়। এখানে কামদল বা কামদ (অর্থাৎ "কেঁদো") বাঘ স্থানীয় রাজা-প্রজাকে হত্যা করিয়া নির্বিঘ্নে বাস করিতেছিল। লাউসেন তাহাকে দমন করিলেন, এবং তাহার পর তারাদীঘিতে কুম্ভীরকে পরাজিত করিয়া জামতিতে এক অসতী নারীর কোপে এবং গোলাহাটে এক গণিকার হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মের কৃপায় হনুমানের সহায়তায় নিস্তারলাভ করিলেন। তাহার পর লাউসেন গৌড়ে পৌঁছিলেন। মহামদের চক্রান্ত সত্ত্বেও তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের বাহুবল দেখাইয়া রাজার নিকট উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিলেন। দেশে প্রত্যাগমনের পথে কালু ডোমের ও তাহার স্ত্রী লখ্যার সৌহার্দ্দ্য ও আনুগত্য লাভ করিলেন। কালু ডোম সপরিবারে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিয়া দক্ষিণ ময়না রাজ্যে বসতি করিল।

এদিকে মহামদের একমাত্র চিন্তা হইয়াছে, কি করিয়া লাউসেনকে বিনষ্ট করা যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রাজাকে বলিয়া লাউসেনকে পাঠাইল কামরূপরাজকে দমন করিতে। লাউসেন কামরূপে গিয়া সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিলেন এবং তাঁহার কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন

করিলেন। পথে তাঁহার আরও দুইটি ভার্য্যা লাভ হইল—মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা এবং বর্দ্ধমানের রাজকন্যা বিমলা।

পুনরায় লাউসেনকে কঠিনতর অভিযানে প্রেরণ করা হইল। সিমুলের রাজা হরিপালের কানড়া নাম্নী অশেষ রূপগুণসম্পন্ন এক দুহিতা ছিল। কানড়াকে বিবাহ করিতে গৌড়েশ্বরের বাসনা ছিল বহুকাল হইতেই। কিন্তু এক কারণে এই বাসনা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। কানড়া ছিলেন দেবীর অনুগৃহীত; যাহাতে যে-সে লোক তাঁহাকে বিবাহ করিতে না পারে এইজন্য দেবী একটি লৌহনির্ম্মিত গণ্ডার দিয়া বলিয়াছিলেন, যে খড়্গাঘাতে গণ্ডারের মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারিবে সেই কানড়ার পাণিগ্রহণ করিবে। রাজা বা মহামদের সাধ্য ছিল না যে এ কার্য্য করে। দেবীর অনুগ্রহে লাউসেন লৌহ-গণ্ডারের শিরশ্ছেদ করিয়া কানড়াকে বিবাহ করিলেন এবং নব-বিবাহিতা স্ত্রী এবং তাঁহার পরিচারিকা ধুমসীকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল পরে লাউসেনের পুত্রসন্তান জন্মিল। তাহার নাম হইল চিত্রসেন।

তাহার পর লাউসেনের তৃতীয় অভিযান। অজয়তীরবর্ত্তী ঢেকুর গড়ের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষ দেবীর বরলাভ করিয়া বিশেষ স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়েশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করায় পূর্বে কর্ণসেনের ছয় পুত্র তাহাকে দমন করিতে প্রেরিত হয় এবং তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। এখন লাউসেনকে প্রেরণ করা হইল ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে। অজয় নদের তীরে দুই বীরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে একাধিকবার জয়পরাজয়ের পর শেষে বিষ্ণুর কৃপায় লাউসেন বিজয়ী হইলেন। ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোষ গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল।

পুনরায় লাউসেনের ডাক পড়িল। গৌড়ে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবন উপস্থিত, লাউসেনকে এই দৈবদুর্যোগ কাটাইয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মের কৃপায় লাউসেন বৃষ্টি ও জলপ্লাবন প্রশমিত করিলেন।

ইহাতেও লাউসেনের নিস্তার নাই। এইবার তাঁহাকে যে সঙ্কটে ফেলা হইল তাহা যেমন উৎকট তেমনি অসম্ভব। লাউসেনকে বলা হইল, পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয় দেখাইতে হইবে নতুবা তাঁহার পিতামাতাকে হত্যা করা হইবে। কি করেন, পিতামাতাকে গৌড়েশ্বরের হস্তে বন্ধক-হিসাবে সমর্পণ করিয়া লাউসেন মাতার পুরাতন সহচরী ধর্ম্মের উপাসিকা সামুলাকে লইয়া ধর্ম্মের পীঠ-স্থান হাকন্দে (বা হাখণ্ডে) গমন করিলেন। সেখানে সুতীব্র তপশ্চর্য্যার পর আত্মাহুতি দিয়া তিনি ধর্ম্মকে সন্তুষ্ট করিলেন। ধর্ম্মঠাকুর পশ্চিম-দিগন্তে সূর্য্যোদয় করাইলেন। এই অসম্ভব অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের সাক্ষী রহিল হরিহর বাইতি।

ইতিমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিয়াছে। লাউসেনের প্রাসাদরক্ষীদিগের নেতা কালু ডোম উৎকোচে বশীভূত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে স্ত্রীর কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিল এবং সপুত্র নিহত হইল। তখন কালুর স্ত্রী অন্তঃপুর রক্ষা করিবার জন্য একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেও অচিরে নিহত হইল। রাণী কলিঙ্গাও যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সব যায় যায় হইল, এমন সময়ে রাণী কানড়া এবং তাঁহার সহচরী ধুমসী অস্ত্রধারণ করিল। মহামদ পরাজিত হইয়া বেত্রাহত কুকুরের মত পলাইল।

লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন। মহামদ হরিহর বাইতিকে অশেষ প্রলোভন দেখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করিতে লাগিল। প্রথমে উৎকোচের বশীভূত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত হরিহর সত্য সাক্ষ্যই দিল যে সে স্বচক্ষে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় দেখিয়াছে। লাউসেনের জয়জয়কার হইল। ক্রোধে ক্ষোভে মহামদ হরিহরের নামে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাহাকে শূলে চড়াইল; ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া হরিহর নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুবরণ করিল।

পিতামাতা সমভিব্যাহারে লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে কালু, লখ্যা এবং অন্যান্য সকলে যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছে। তখন তিনি ধর্ম্মের স্তব করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার প্রাসাদ-রক্ষায় প্রাণ দিয়াছিল ধর্ম্মের অনুগ্রহে তাহারা সকলেই বাঁচিয়া উঠিল। লাউসেন নিরুদ্বেগে ময়নায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাহার পর যথাকালে পুত্র চিত্রসেনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া লাউসেন সপরিবারে স্বর্গারোহণ করিলেন।

প্রধানতঃ উপকথার সমষ্টি হইলেও এবং কৃষ্ণলীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলেও ধর্ম্মমঙ্গল-আখ্যায়িকার মধ্যে মহাকাব্যোচিত ঐক্য আছে। কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলিও বেশ পরিস্ফুট। খেলারাম ধর্ম্মমঙ্গলকে "গৌড়কাব্য" বলিয়াছেন; আমরা বলি, ইহা রাঢ়ের জাতীয় কাব্য।

২৩

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য

ধর্ম্মমঙ্গল-কাহিনী খুব প্রাচীন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সকল ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার কোনটিকেই সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নেওয়া যায় না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে খেলারাম চক্রবর্ত্তীর কাব্য প্রাচীনতম। কিন্তু খেলারামের কাব্যের কোন পুঁথি আমরা পাই নাই। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে হারাধন দত্ত খেলারামের কাব্যের অতি জীর্ণ একটি পুঁথি

দেখিয়াছিলেন আরামবাগ মহকুমার শ্যামবাজার গ্রামে। সেই পুঁথি হইতে তিনি এই যে কয় ছত্র টুকিয়া লইয়াছিলেন ইহাই খেলারামের কাব্যের আলোচনায় আমাদের একমাত্র সম্বল।

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন,
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ।
হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম,
গৌড় কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়,
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্মপরিচয়।

"ভুবন শকে বায়ু মাস" ইহা হইতে কষ্টকল্পনায় ১৪৪৯ শকাব্দ (১৫২৭-২৮) খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে রচনাকাল জ্ঞাপন সন্দেহজনক। দত্ত মহাশয়ের পাঠভ্রান্তি অসম্ভব নয়।

স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে খেলারামের নিবাস ছিল আরামবাগ মহকুমার পশ্চিমপাড়া গ্রামে। শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল খেলারামের পুঁথির খোঁজে পশ্চিমপাড়ায় গিয়াছিলেন। সেখানে খেলারামের ভিটা বলিয়া একখণ্ড পতিত স্থান আছে। সেখানে কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে এক বৃদ্ধের মুখে তিনি এই দুই ছত্র শুনিয়াছিলেন,

খেলারাম চক্রবর্ত্তী শণ কাট্‌ছেন বসে,
ধর্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে।

সকল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেই ময়ূরভট্টকে ধর্ম্মসঙ্গীতের আদি কবি বলা হইয়াছে। ময়ূরভট্টের কাব্য পাওয়া যায় নাই, সুতরাং তাঁহার জীবন ও কাব্যের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই। মনে হয় ইনিই সংস্কৃত সূর্য্যশতক কাব্যের কবি ময়ূরভট্ট।

একটি কাব্যের খণ্ডিত পুঁথিতে রামাই পণ্ডিত বা "দ্বিজ" রামের ভনিতা পাওয়া যায়। এই কাব্যের শুধু হরিশ্চন্দ্রের পালা পাওয়া গিয়াছে। রচনাভঙ্গি অষ্টাদশ শতাব্দীর অনুযায়ী। পালাটি সম্ভবতঃ ধর্ম্মপূজাবিধানের অংশ।

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের মধ্যে তিন-চারিখানি নিশ্চিতভাবে এবং একখানি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। বাকিগুলি সমস্তই পরবর্ত্তী শতাব্দীতে লেখা হয়। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্য বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত বর্দ্ধমান-বীরভূমের সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ইঁহার কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

অদ্যাবধি যতগুলি ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে রূপরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্যকে সর্বপ্রাচীন বলিতে হয়। পরবর্ত্তী প্রায় সকল ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাই রূপরামকে আদি কাব্যকর্ত্তার সম্মান দিয়াছেন।

রূপরাম তাহার কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ হেঁয়ালিতে

> শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয়,
> তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
> রসের উপরে রস তায় রস দেহ,
> এই শকে গীত হৈল লেখা কর‍্যা নেও।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাইয়াছিলেন ১৫২৫ শকাব্দ। এই তারিখ মানিয়া লইতে কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এক প্রাচীন পুঁথিতে শাহ্ শুজার উল্লেখ পাইতেছি।

> রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা,
> পরম কল্যাণে যত আছিল ত প্রজা।
> সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর,
> দ্বিজ রূপরামে গায় শ্রীরামপুরে ঘর।

১৫২৫ শকাব্দে বাঙ্গালা দেশে শুজা কোথায়? সুতরাং নূতন করিয়া গণনা করিতে হইল, এইভাবে

শাকে সীমে	১০ × ১১ × ১২ = ১৩২০
তিন বাণ চারি যুগ বেদ	১৫ + ১৬ + ৪ = ৩৫
রস রস রস	৬ × ৬ × ৬ = ২১৬
	১৫৭১

১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ হইলে সব দিকে সঙ্গতি থাকে। সুতরাং ইহাই রূপরামের কাব্যের রচনাসমাপ্তি-কাল।

আত্মপরিচয় এবং কাব্যরচনার ইতিহাস রূপরাম যাহা দিয়াছেন তাহা সরল করুণ এবং হৃদয়গ্রাহী। সেকালের বাঙ্গালী জীবনের এমন পরিপূর্ণ বাস্তব ও মনোরম চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। বিবরণটি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা গেল।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে কাইতি গ্রামের সন্নিকটে শ্রীরামপুর গ্রামে পুরুষানুক্রমে কবির নিবাস ছিল। রূপরামের পিতা শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী ছিলেন পরম পণ্ডিত, তাঁহার টোলে "বিশা-শয়" পড়ুয়া পড়িত। মায়ের নাম ছিল "দৈমন্তী" বা দময়ন্তী। "কর্ণের সমান দাতা অভিরাম রায়" ছিলেন রূপরামের বাড়ীর প্রধান যজমান ও সহায়ক।

বাড়ীতে থাকিয়া রূপরাম অমরকোষ এবং জুমরনন্দীর টীকাসহ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তখন তাঁহার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না। রূপরাম তাঁহার ছোট ভাই রামেশ্বরকে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু দাদা রত্নেশ্বর মোটেই সুবিধার লোক ছিল না।

ছোট ভাই রামেশ্বর প্রাণের সমান,
বড় ভাই রত্নেশ্বর বুদ্ধি হইল আন।

কঠোরহৃদয় রত্নেশ্বর "খাইতে শুইতে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন।" এবং গৃহে "বারমাস দ্বন্দ্ব হয় বিহান বিকালে।" একদিন বাক্যবাণ অসহ্য হইয়া উঠিল। সেদিন বুধবার। রূপরাম মনের দুঃখে ভাবিলেন, উদাসীন হইব। সংকল্পমাত্র খুঙ্গি-পুঁথি বাঁধিয়া লইয়া কবি গ্রামত্যাগ করিলেন। সম্বল শুধু অভিরাম রায়ের পুত্র (?) মণিরাম রায় প্রদত্ত তসরের ধুতি একখানি এবং "পঞ্চ" আনা কড়ি। তখন পাসণ্ডার ভট্টাচার্য্যদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। রূপরাম নিকটবর্ত্তী আড়ুই গ্রামে পাসণ্ডা-নিবাসী রঘুরাম ভট্টাচার্য্যের টোলে গিয়া হাজির হইলেন। পথশ্রান্ত নিরাশ্রয় বালককে দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মায়া হইল, তিনি রূপরামকে "বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে," এবং "আনন্দে পড়ান পাঠ হরষিত মনে।"

রূপরামের আগ্রহে এবং বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়া ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে সব সময়েই পাঠ বলিয়া দিতে লাগিলেন। রূপরাম লিখিয়াছেন, ব্যাকরণে তাঁহার কুশলতা দেখিয়া

সাতমাসে সাত টীকা পড়াইল গোসাঞি,
বিদ্যা বিনু ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু নাঞি।
যেখানে সেখানে করি টীকার বিচার,
চক্রবর্ত্তী সকল মানিল পরিহার।

টোলে রূপরামের ভারি খাতির। কবি গর্ব করিয়া বলিয়াছেন,

বিশা-শয় পড়ুয়া মধ্যে আমি পড়ি আগে,
বিটঙ্ক ভারতী সুধা মকরন্দ ভাগে।

রূপরামের অধ্যাপক রঘুরাম ভট্টাচার্য্য ছিলেন সুপুরুষ, সহৃদয় ও সুপণ্ডিত। দোষের মধ্যে কেবল একটু বদ্‌রাগী।

আড়ুইয়ে পড়ান গোসাঞি চৌপাড়ির ঘর,
শ্যামল-উজ্জ্বল তনু পরমসুন্দর।

পরমপণ্ডিত গুরু বড় দয়াময়,
ভট্টাচার্য্য কণাদ মানিল পরাজয়।
বেদান্ত দেখিলে পথে ডানি-বামে যান,
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য সভার প্রধান।

ব্যাকরণপাঠ শেষ করিয়া রূপরাম

মাঘ রঘু নৈষধ পড়িল হরষিত,
পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত।

একদিন রূপরাম একান্তে বসিয়া কোন কাব্য হইতে সীতাহরণ-কাহিনী পাঠ করিতেছিলেন। অলক্ষিতে রঘুরাম রূপরামের সুকণ্ঠের আবৃত্তি শুনিয়া আর্দ্র চিত্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। রূপরাম লিখিয়াছেন,

ভট্টাচার্য্য গুরু মোর বুক নাহি বান্ধে,
সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে।

গুরুশিষ্যের এমন মধুর সম্পর্কে ধর্ম্মের মায়ায় অকস্মাৎ গুরুতর বিচেছদ-রেখা পড়িল। সেদিন শনিবার, রূপরাম গুরুর কাছে পাঠ লইতেছেন। গুরুর ব্যাখ্যায় সংশয় আসিলেও তাহা বলিতে শিষ্যের সাহসে কুলাইতেছে না—"পূর্বপক্ষ শুনাইতে গুরুকে ডরাই।" তবুও সমাস-টীকার একস্থানের ব্যাখ্যায় রূপরাম প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

সমাস-টীকার হেতু বাড়িল জঞ্জাল,
পূর্বপক্ষ ধরিতে বিধাতা হৈল কাল।

প্রতিবাদ করায় গুরু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। তবুও রূপরাম তর্ক করিতে ছাড়িলেন না। বারবার তিন বার পূর্বপক্ষ তোলাতে রঘুরাম ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া "ঐমনি পুঁথির বাড়ি বসাইল গায়," এবং চীৎকার করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,

গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন,
পড়াবার বেলা হয় এহার অধীন।
বিশা-শয় পড়ুয়া থাকে মোর মুখ চায়্যা,
দুই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া।
গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বর্ণ কয়,
সদাই পাঠের বেলা জঞ্জাল লাগায়।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তোমাকে আর পড়াইতে পারিব না। তুমি হয় বাড়ী যাও, নয় নবদ্বীপে অথবা শান্তিপুরে পড়িতে যাও।

ক্রুদ্ধ ভট্টাচার্য্যের যে চিত্র রূপরাম আঁকিয়াছেন তাহা উজ্জ্বল বাস্তব।

রূপরাম বলিতেছেন, "সূর্য্যের সমান গুরু পরমসুন্দর," তদুপরি তাঁহার ক্রোধ-রক্ত সুন্দরমুখে বসন্তের দাগগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া এক অপূর্ব দীপ্তি অর্পণ করিয়াছে,

বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা,
বিটঙ্ক মুখের শোভা বসন্তের চিনা।

দুঃখিতচিত্তে রূপরাম পুঁথিপত্র গুছাইয়া লইয়া নবদ্বীপে পড়িতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন অকস্মাৎ "হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল মনে," তাই "পুনর্বার যাত্রা হইল শ্রীরামপুরের গনে।" আড়ুই গ্রাম পশ্চাতে ফেলিয়া ডাহিন দিকে বাঁশা গ্রাম রাখিয়া তিনি গ্রামের সোজা অথচ দুর্গম পথ ধরিলেন।

আড়ুয়্যা করিল পাছে ডানি দিকে বাশা,
পুরানো জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা।

পুরাতন জাঙ্গাল ধরিয়া কিছুদূরে গিয়া রূপরাম পথ হারাইলেন এবং দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পলাশনের বিলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ নজর হইল, "দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে" এবং নীচে "দুটা বাঘ দুদিগে বসিয়া নেজ নাড়ে।" দেখিয়াই রূপরাম ভয়ে দৌড় দিলেন এবং "গোটা দুই আছাড় খাইল গোপলাদিঘির পাড়ে।" তাঁহার পুঁথিপত্র চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলি পুঁথি কুড়াইয়া লইয়া দেখা গেল যে দুই-একটি পুঁথি নাই। এমন সময়ে ধর্ম্মঠাকুর আবির্ভূত হইয়া সুবন্ত ও কারক-টীকার পুঁথি কুড়াইয়া রূপরামের হাতে দিলেন। রূপরাম লিখিয়াছেন,

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা,
সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা।

অপূর্ব তাঁহার রূপ ও ভূষা—

সুবর্ণ-পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর
কলধৌত কাঞ্চন-কুণ্ডল ঝলমল।

তাঁহার

গলায় চাঁপার মালা আসা-বাড়ি হাথে,
ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে।

অকস্মাৎ এহেন মূর্ত্তি চাক্ষুষ করিয়া রূপরামের মন ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর বলিলেন, তোমার পুঁথিপত্র তুলিয়া রাখিও, উহাতে আর তোমার কাজ নাই। কাল হইতে তুমি আমার "বারমতি" গান গাহিয়া বেড়াইবে। তোমাকে

চামর মন্দিরা দিব সুবর্ণ তোড়র,
বার দিন গাইবে গীত আসর ভিতর।

তাহার পর নিজের পরিচয় দিয়া ভরসা দিলেন, তোমার পূর্বজন্মের পুণ্যে আমি তোমাকে দেখা দিলাম। তুমি নিশ্চিন্তমনে আমার গান রচনা কর এবং গাহিয়া বেড়াও—

যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত,
সদাই গাইবে গুণ আমার চরিত।
যখন শুনিব তব মন্দিরার ধ্বনি,
তুমি উপলক্ষ্য গীত গাইব আপনি।

এই বলিয়া রূপরামের কানে মহাবিদ্যা-মন্ত্র দিয়া ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। রূপরাম ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চোখে অন্ধকার দেখিয়া দৌড় দিলেন। কবি লিখিয়াছেন,

তিমিরে তপনমালা দেখিতে না পাই,
গায়ে বড় জ্বর আইল আসি ধায়্যা-ধাই।
দিশাহারা হয়্যা ধায়্যা বুলি বেনা-বনে,
চঞ্চল বসন বেশ বড় ত্রাস মনে।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে রূপরাম যখন গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পেঁাছিলেন তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত ও আর্ত্ত কবি শাঁখারী-পুকুরে নামিয়া পেট ভরিয়া জল খাইয়া লইলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মনে আশা ছিল, দাদার অজানিতে ঘরে গিয়া চুপিচুপি "প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ।" নাছ-দুয়ারে রূপরামের দুই বোন সোনা ও হীরা (পাঠান্তরে রূপা) বসিয়াছিল, তাহারা আনন্দকোলাহল তুলিল, "রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি-পুঁথি লয়্যা।" উহাদের চীৎকারে রত্নেশ্বর বাহির হইয়া আসিল। দাদাকে দেখিয়া রূপরামের গায়ে যেন জ্বর আসিল,

তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা,
পালাবার পথ নাহি বুদ্ধি হইল হারা।

রূপরামকে বসিতে না দিয়া রত্নেশ্বর কুবচন বলিতে লাগিল, তাহার সার কথা —"কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইল ঘরে।" ভাইয়ের হাত হইতে খুঙ্গি-পুঁথি কাড়িয়া লইয়া রত্নেশ্বর দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল রূপরাম তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেইখান হইতেই বিদায় হইলেন। তাঁহার মনে এই দুঃখই জাগিতে লাগিল, "জননী সহিত নাহি হইল দরশন।" মা জানিলেন না যে কত দুঃখ পাইয়া তাঁহার গৃহপ্রত্যাগত সন্তান গৃহদ্বার হইতে ফিরিয়া গেল। তখনও "সোনা হীরা দুটি বনি আছিল দুয়ারে," কিন্তু দাদার ভয়ে তাহারা "জননীকে বারতা বলিতে নাহি পারে।"

উত্তরমুখে চলিতে চলিতে তিন দিন উপবাসের পর রূপরাম পেঁাছিলেন দামোদর তীরে শানিঘাট (পাঠান্তরে শালিডাঙ্গা) গ্রামে। পথের পথিকের কাছে খোঁজ করিয়া সেখানকার এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলেন ভিক্ষার জন্য।

ঠাকুরদাস পাল তায় বড় ভাগ্যবান,
না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান।
আড়াই সের ধানেতে কিনিল চিড়াভাজা,
দামোদরের জলেতে করিল স্নান-পূজা।

রূপরামের দুর্দ্দৈব তখনো পাছু লাগিয়া আছে। কবি লিখিয়াছেন,

জলপান করি তথা বড় অভিলাষে,
আচম্বিতে চিড়াভাজা উড়াইল বাতাসে।
চিড়াভাজা উড্যা গেল শুধু খাই জল,
খুঙ্গি-পুঁথি বয়্যা যাইতে অঙ্গে নাহি বল।

পথে কবি শুনিলেন যে দিগ্‌নগর গ্রামে তাঁতীদের বাড়ীতে ঘটা করিয়া লোক খাওয়ান হইতেছে। কবি সেখানে গিয়া জুটিলেন। সেখানে "চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন" হইলেও একটু খুঁত রহিয়া গেল, ফলারে খই থাকিলে আরও জুৎ হইত। কবি লিখিতেছেন,

মনে বড় সাধ ছিল খাব চিড়া দই,
তাঁতী-বাড়ি ধর্ম্মঠাকুর নাঞি দিল খই।

ভোজন শেষ হইলে গৃহস্থ

দক্ষিণা আনিয়া দিল দশগণ্ডা কড়ি,

কিন্তু বিধির কারণে তার কাণা দেড় বুড়ি।

সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া রূপরাম চলিতে চলিতে অবশেষে এড়াইল গ্রামে পেঁাছিলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ ভূস্বামী গণেশ রায় স্বপ্নে কবির আগমন-বার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিয়া ধর্ম্মের গান রচনা করিবার ও গাইবার সুযোগ দিলেন। রূপরাম লিখিয়াছেন,

তবে গিয়া এড়াল্যে দিলাম দরশন,
মহারাজা গণেশ রায় দেখিল স্বপন।
চামর মন্দিরা দিল নানা-বর্ণ সাজ,
আনন্দে গাইল গীত ধর্ম্মের সমাজ।

তাহার পর রূপরাম লিখিতেছেন যে তিনি যখন ধর্ম্মমঙ্গল গান রচনা করিয়া গাহিতে শুরু করেন তখন শাহ্ শুজা রাজমহলে বাঙ্গালার সুবেদার।

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা,
পরম কল্যাণে তবে আছিল ত প্রজা।
বর্দ্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম,
[? তাঁর পরা] জয় হইল দক্ষিণে মহিম।
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর,
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর ॥

রূপরামের আত্মবিবরণীতে যে বাস্তবচরিত্রাঙ্কনদক্ষতা এবং রসদৃষ্টির পরিচয় পাই তাঁহার কাব্যের মধ্যেও সে পরিচয় অসুলভ নয়। রূপরামের কাব্যের চরিত্রগুলির কোনটি অবাস্তব হয় নাই। শুধু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে নয়, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে রূপরামের কাব্য বাস্তবপরতার জন্য অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে।

প্রাচীনত্ব-হিসাবে রামদাস আদকের কাব্য রূপরামের কাব্যের ঠিক পরে। রামদাস আদকের আত্মকথা ও গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ বলিতেছি।

রামদাসের জন্মস্থান হায়াৎপুর গ্রাম ভুরশুট বা ভরশিট (প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠি) পরগনার অন্তর্ভুক্ত। এই পরগনার অধীশ্বর প্রতাপনারায়ণের অধীনে হায়াৎপুর গ্রামের মণ্ডল ছিল চৈতন্য সামন্ত। চৈতন্য সামন্ত ছিল অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত কর্ম্মচারী। একদা পৌষ কিস্তির খাজানা দিতে না পারায় কবির পিতা রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিতে চৈতন্য সামন্ত রামদাসকে কয়েদ করিয়া রাখে। রঘুনন্দন গৃহে ফিরিয়া রাজার সহিত দেখা করিয়া খাজানার দায় হইতে সেবারের মত রেহাই পান। এদিকে কবি কারাগার হইতে কোনরকমে মুক্তি পাইয়া জলযোগ করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন এবং ভোর বেলায় মামার বাড়ীর দিকে পলাইলেন। রামদাসের মাতুলালয় ছিল গোরুটি গ্রামে।

পথে যাইতে যাইতে কবি নানা শুভলক্ষণ দেখিতে পাইলেন। যেমন

মাথার উপর ঘুর্য্যা বুলে শঙ্খচিল,
চৌদুলী ধরেছে মাছে শুখায়েছে বিল।

শেওড়া গাছে সুন্দর চাঁপা ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রামদাস

তুলিল পাবকরুচি পুষ্প মনোহর,
বিনাসূত্রে হার হৈল পরম-সুন্দর।

সুতা ব্যতিরেকে আপনা আপনি হার গাঁথা হইতে দেখিয়া রামদাস অপদেবতার কাণ্ড মনে করিয়া

ভয়ে ভীত দূরস্থিত করিয়া তাহারে,
ত্বরা করি চলি যায় কম্পিত-অন্তরে।

চলিতে চলিতে কবি সাতমাসা পাউনান গড়-মান্দারণ পার হইয়া পাড়া-বাগনানের কাছে পৌঁছিলেন। তখন দেখেন যে এক সিপাহী আগাইয়া আসিতেছে সাদা ঘোড়ায় চাপিয়া। সিপাহী দেখিয়াই কবি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন,

দেশে খাজানার তরে পলাইয়া যাই,
বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই।

রামদাস লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চারিদিকে শুধু ধানক্ষেত, লুকাইবেন কোথায়? এদিকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফাটি যায় বুক,
ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাহি সুখ।
সম্মুখে সিপাই শোভে শমন-সমান,
হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তো যায় প্রাণ।

অনতিবিলম্বে সিপাহী রামদাসকে ধরিয়া ফেলিল এবং সরোষকণ্ঠে বলিল,

মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া,
এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া।
গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল,
এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল।

কবি বলিতেছেন,

ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি,
বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি।

রামদাসের ভাব বুঝিয়া সিপাহী শাসাইল,

আমার সম্মুখে যদি ফেলে দিস মোট,
দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট।

সিপাহীর এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া রামদাস ক্ষণকালের জন্য দুঃখে ক্ষোভে চক্ষু মুদিলেন। তাহার পর চাহিয়া দেখেন কোথায় বা সিপাহী কোথায় বা মোট। ভয়ে বিস্ময়ে রামদাসের জ্বর আসিল। তাহার পর কবি

মনে চিন্তে পথশ্রান্তে দুঃখ কেন পাই,
কানাদীঘীর জল খেয়ে মামাবাড়ী যাই।
সুযুক্তিসম্ভব বুঝি করিল গমন,
দীঘীর উত্তর ঘাটে দিল দরশন।

ঘাটে নামিয়া দেখেন পুকুরে জল নাই। চোখের জল আর বাধা মানিল না। বালক রামদাস ঘাটে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; নবীন ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভুত হইয়া কবিকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া সুস্থ করিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মের গান রচনা করিতে বলিলেন। রামদাস বলিলেন, প্রভু, খেলার ছলে ধর্ম্মপূজা করিয়াছি বটে, কিন্তু কিছুই তো জানি না।

পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া,
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া।
খেলাছলে ধর্ম্মপূজা কর্ম্মকাণ্ডহীন,
না জানি ধর্ম্মের গীত তায় অর্বাচীন।

ধর্ম্মঠাকুর তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন,

আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি,
জাড়গ্রামের কালু বামুন হই আমি।
আসরে জুড়িবে গীত আমা সোঙরণে,
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে।

এই বলিয়া রামদাসের ডাহিন করতলে মন্ত্র লিখিয়া দিয়া ও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া ধর্ম্মঠাকুর অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাহার পর কবি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া স্বগ্রামস্থ ধর্ম্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে প্রথম গান করিলেন "বেদ বসু তিন বাণ" (১৫৮৪) শকাব্দের ভাদ্র মাসে অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

রামদাস আদক জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত্ত। ইঁহার পিতার নাম রঘু। বাসস্থান ছিল আধুনিক হুগলী জেলার অন্তর্গত হায়াৎপুর গ্রামে। রামদাসের কাব্যে রূপরামের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের অপর এক বিখ্যাত কবি সীতারাম দাস আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ যাহা দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

কবির বাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় খণ্ডঘোষের নিকটবর্তী সুখসাগর গ্রামে। কিছুদিন যাবৎ কবি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন যে দেবী গজলক্ষ্মী তাঁহাকে ধর্ম্মের গান রচনা করিতে বলিতেছেন। এই স্বপ্নের কথা কবি খণ্ডঘোষ-নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তীকে বলিয়াছিলেন। তাহার পর কিছু কাল পরে একদা বৈশাখ মাসের প্রথমে মহাসিংহ আসিয়া সাহাপুর গ্রাম লুঠ করিল, এবং সীতারামেরও "ঘরদুয়ার পোড়াইয়া সব কৈল চুর।" সিপাহী-লস্কর চলিয়া গেলে কবির এক খুল্লতাত কুশলরাম সরকার তাঁহাকে বন হইতে কাঠ

কাটিয়া আনিতে বলিলেন। সীতারাম পরদিন প্রত্যুষে চলিলেন কাঠ কাটাইয়া আনিতে। কবি বলিতেছেন,

উষাকালে দেখিনু শৃগাল যায় বাম,
প্রাচীত পশ্চাৎ করি রাণীসায়ের গ্রাম।

কবি যখন কমলার মাঠে তখন সূর্য্য উঠিল।

প্রভাতপতঙ্গরুচি কমলার মাঠে,
মুখ প্রক্ষালন কৈল দারিদীঘীর ঘাটে।

সীতারাম যখন জামকুড়ির বনের উপান্তে পেঁাছিলেন তখন বেলা দুই দণ্ড হইয়াছে। শুভশকুন দেখা গেল—"শঙ্খচিল মাথায় উড়িছে ঘনে ঘন।"

বনের মুখেই জামকুড়ির চৌকী। সেখানে সীতারাম একটু বসিলেন এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইতে। বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতেছেন এমন সময়ে একটা লোক দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, ও পথে যাইও না, বেগার ধরিতেছে। কবি লিখিয়াছেন,

জামকুড়ির চৌকীতে তামাক খাই বস্যা,
ধাওয়াধাই একজন উত্তরিল আস্যা।
যেও নাই ও-পথে বেগার কত ধরে,
শুনিয়া তাহার কথা ডরাল্যাম অন্তরে॥

সীতারাম ভয় পাইলেও ক্ষান্ত হইলেন না। অন্য পথ তাঁহার জানা ছিল না; তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন। অবশেষে কবি সাহস করিয়া হোবপুকুরের বনে ঢুকিয়া রাঙ্গামেটের কাছাকাছি পেঁাছিলেন। সেখানে দেখিলেন যে বড় বড় গাছ জোড়া জোড়া খাড়া রহিয়াছে। বড় গাছ দেখিয়া সীতারামের আনন্দ হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণে যাহা দেখিলেন তাহাতে আনন্দ হতাশায় পরিণত হইল। কবি বলিতেছেন, "দেখিলাম সম্মুখে এক এরাকের ঘোড়া।" ঘোড়া দেখিয়াই কবির মনে হইল, তাহা হইলে তো কাছে সিপাহী আছে, বেগার ধরিবে। কবি পুকুরের গাবা দিয়া পলাইলেন। যাইতে যাইতে তিনি দেখেন, "অন্ধকার গহনে হরিণী বুলে ধায়্যা।" তখন প্রথম-বৈশাখ, বনের শোভা অপূর্ব—

বৈশাখ সময় তায় কুড়চির ফুল,
ঝুপ-ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল।
কথি কথি কাননে হরিণী কালসার,
ক্ষণেকে দিবস হয় ক্ষণেকে আন্ধার।

এমন সময়ে অকস্মাৎ ঝড় উঠিল। আতঙ্কিত কবি ঝড়ের শব্দকে ঘোড়ার দৌড়ের শব্দ মনে করিয়া জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিলেন। কিছু দূর গিয়া সম্মুখে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। আশ্বস্ত হইয়া সীতারাম আগাইয়া গিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী হাসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাইবে? সীতারাম বলিলেন,

> ঘরদুয়ার পোড়াইয়া গিয়াছে লস্করে,
> শাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে।
> পথ নাহি জানি আমি বনে দিশা লাগে,
> কহ মোরে হোবপুকুর যাব কোন দিগে।

সন্ন্যাসী বলেন, "বাছা, আইস মোর সঙ্গে, দুই জনে কথায় কথায় যাব রঙ্গে।" কিছু দূর গিয়া সীতারাম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কহ প্রভু আমারে কোথাকে যাবে তুমি।"

> সন্ন্যাসী বলেন আমি যাব বিষ্ণুপুরে,
> শুখসায়ের দিয়া তোরে খুঁজ্যা এল্যাম ঘরে।
> তোর স্থানে কার্য্য কিছু আমার আছিল,
> তে-কারণে তোর সনে বনে দেখা হইল।

শুনিয়া সীতারামের মনে ভয় হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোর স্থানে কিবা কার্য্য কহ মহাশয়।" সন্ন্যাসী তখন পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি "নিরঞ্জন নৈরাকার" ধর্ম্মঠাকুর, বহুদিন হইতে আমি ইন্দাস গ্রামের নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে বিশ্রাম করিতেছি; তুমি পূর্ব্বজন্ম হইতে আমার ভক্ত, সেই হেতু আমি তোমাকে বনে দেখা দিলাম; তুমি "গীত কর আমার না কর মন হীন; তোর কীর্ত্তি রহিব শিলের যেন চিন।" ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ-বর্ণের পক্ষে ধর্ম্মের গান করা তখন নিষিদ্ধ ছিল। তাই ধর্ম্মঠাকুরের এই কথায় সীতারামের ভয় হইল। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ধর্ম্মঠাকুর বলিলেন,

> কপালের লেখা তোর আমি কি করিব,
> বাহুড়িয়া ঘর চল তোর সঙ্গে যাব।

ধর্ম্মঠাকুরকে ঘরে লইয়া যাওয়া তো আরও সাঙ্ঘাতিক কথা। কবি বলিতেছেন,

> বাত শুনি আমার মনস্থ হয় নাঞি,
> রক্ষা কর মোরে প্রভু অনাদ্য গোসাঞি।
> অতি মূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে,
> গীত-নাট কি জানি করিব কোনমতে

ধর্ম্মঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন,

লিখিতে তোমার যখন না চলিবে পুথি,
হাথের কলম লয়্যা রেখ্য তুমি তথি।
সেইকালে সরস্বতী বসিব বদনে,
লেখ্যা যেও পুথি তুমি যেবা আইসে মনে।
তোর পুথি নিন্দিতে নারিব কোন নরে,
ভবানী বসিব তোর কলম উপরে।

সীতারামের হাতে আশীর্বাদী কুড়চি ফুল দিয়া ধর্ম্মঠাকুর পরম আশ্বাস দিলেন,

আজি হৈতে যে পথে চলিয়া যাবে তুমি,
সেই পথে তোমার সহিত যাব আমি।
যখন স্মরণ তুমি করিবে আমারে,
ইন্দাসি হইতে বাছা দেখা দিব তোরে।

ঠাকুর বিদায় চাহিলে সীতারাম তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিলেন,

নর-মধ্যে অধম আমার সম নাই,
তব বাক্য মহাপ্রভু লজ্ঘা গেল নাই।
পরকালে কি হব কহ না মহাশয়,
প্রাণ কাঁপে সঘনেতে শমনের ভয়।

"পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে"—এই সান্ত্বনা দিয়া হাসিয়া "জটিল দেব" অন্তর্হিত হইলেন। সীতারাম চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখেন, কোথায় ঝড়-বৃষ্টি? আকাশে সূর্য্য হাসিতেছে। সীতারাম তখন ঘর-মুখে ফিরিলেন।

যখন ঘরে পেঁাছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সীতারামের পিতা দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরের পিঁড়ায় শুইয়া ছিলেন। সীতারাম গৃহে প্রবেশ করিয়াই মায়ের নিকট আগে ভাত চাহিয়া পরে হাত-পা ধুইয়া আসিলেন। ভাত খাইতে খাইতে কম্প দিয়া সীতারামের জ্বর আসিল। মুখ ধুইয়া কবি গায়ে কাপড় দিলেন; জ্বর আসিলেও "ঘরে রহিবারে নাহি মনে ইচ্ছা যায়।" কবি গেলেন ছোট খুড়ার কাছে, তিনি তখন বাড়ীর নাছে বসিয়া আছেন! খুড়া কাঠের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সীতারাম বলিলেন, ভুলিয়া গিয়াছি।

রাত্রিতে কবি চণ্ডীমণ্ডপে শুইলেন। জ্বরের ঘোরে রাতদুপুরে স্বপ্ন দেখিলেন,

শিয়রে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা,
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা।

দেবী গীতরচনার সন্ধানও বলিয়া দিলেন। নিদ্রাভঙ্গে সীতারাম ধর্ম্মের গান লিখিতে বসিলেন। বিষয়বস্তু ভাল জানা নাই, তাহার উপর জ্বর। কবি বলিতেছেন,

চিত্ত নাহি স্থির হয় কি করি উপায়,
যত লিখি পুথি তত পদ ভেঙ্গে যায়।

এক দিকে ধর্ম্মঠাকুরের ও গজলক্ষ্মী দেবীর আদেশ অপর দিকে কবির অশান্ত চিত্ত। সীতারাম ঘর ছাড়িয়া পলাইলেন।

বাউল হয়্যা গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি নিরন্তর,
মনে ইচ্ছা নাহি হয় যাই নিজ ঘর।
বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম,
দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম।

ইন্দাসের নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের পরিচয় পাইয়া যত্ন করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে রাখিলেন। ধর্ম্মঠাকুর তখন নারায়ণ পণ্ডিতকে স্বপ্ন দিলেন সীতারামকে দিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করাইতে। নারায়ণ পণ্ডিতের নিকট কবি গীতরচনার সন্ধান ও উৎসাহ পাইয়া ঠাকুরঘরে বসিয়া গেলেন কাব্যরচনায়। কবি বলিয়াছেন,

লিখিতে বসিলাম পুথি প্রভুর ঘরেতে,
লিখি যাই পুথি আমি যেবা আইসে চিতে।
নারায়ণ পণ্ডিত মোরে লেখাইল গীত,
পুত্রসম পালন করিল নিত নিত।

স্থাপনা পালা লেখা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে কবির এক খুড়া ইন্দাসের কাছারিতে আসিয়া সন্ধান পাইলেন যে সীতারাম নারায়ণ পণ্ডিতের বাড়ীতে আছেন। তিনি আসিয়া সীতারামকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বাড়ীতে আসিয়া সীতারাম ধর্ম্মমঙ্গল-রচনা সম্পূর্ণ করেন।

তাহার পর কবি পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের পরিচয় দিয়াছেন। কবির পিতার নাম দেবীদাস দে, পিতামহের নাম মদন, প্রপিতামহের নাম গোপীনাথ। ইঁহারা ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় কায়স্থ। কবির এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, নাম সভারাম (বা শোভারাম)। সীতারামের মাতুলালয় ছিল ইন্দাসে। মাতামহ ছিলেন বাল্মীকি-গোত্রীয়, নাম শ্যামদাস, "ইন্দাসের অম্বগোষ্ঠি জানে সর্ব-লোকে।"

সীতারামের কাব্যরচনাকাল হইতেছে ১০০৪ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ—"এই পুথি হইল হাজার চারি সালে।"

সীতারাম দাস একটি মনসামঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যের রচনাকাল হইতেছে ১০১৪ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ধর্ম্মদাস, শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের মত, উত্তররাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার নিবাস ছিল বসর গ্রামে। জাতিতে বেনে। ভনিতায় নিজেকে প্রায়ই "শিশু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে কাব্য-রচনাকালে ধর্ম্মদাসের বয়স বেশী ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দী

২৪

নবাবী আমল—ভূমিকা

আরংজেবের মৃত্যুর পর হইতে বাঙ্গালার সুবেদার বা নবাবগণের উপর দিল্লীর শাসন শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। দিল্লীতে খাজানা পাঠাইয়া দিলেই সম্পর্ক একরকম চুকিয়া যাইত। কাগজে কলমে না হউক কার্য্যতঃ বাঙ্গালার সুবেদার ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে স্বাধীন নবাব হইলেন। এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বিদ্যার ও সাহিত্যের চর্চা পূর্ব্বেকার শতাব্দীর অনুযায়ী চলিতে থাকিল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রসারও বাড়িয়া চলিল। সাহিত্যে নূতনত্বের মধ্যে প্রথমে সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং পরে তর্‌জা ও কবিগানের সৃষ্টি হইল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজু-দ্‌-দৌলার পরাজয় ঘটিলে এই যুগের অবসান সূচিত হইল, এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের সাড়া পড়িয়া গেল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য-রচনার সূত্রপাত হয়। পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ বঙ্গে পোর্ত্তুগীস মিশনারী পাদ্রীরা তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রচারের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কড়চা-গ্রন্থের মত প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছোট পুস্তিকাও রচনা করিতে লাগিলেন। এই কার্য্য পোর্ত্তুগীস পাদ্রীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত করিতে থাকেন। তাহার পর ইংরেজের অভ্যুদয় ঘটিলে ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড দেশের পাদ্রীরা সেই কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একখানিমাত্র খ্রীষ্টানী বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বইটির লেখক ছিলেন একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মিশনারী,

নাম দোম্ আন্তোনিও। ইনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মগ জলদস্যুরা দেশ লুঠ করিতে আসিয়া ইঁহাকে হরণ করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। সেখানে জনৈক পোর্ত্তুগীস পাদ্রী টাকা দিয়া ইঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা দান করিয়া রোমান ক্যাথলিক মতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দোম্ আন্তোনিও-বিরচিত পুস্তকের সংক্ষেপে নাম "ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ।" ইহাতে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর মধ্যে বিচারবিতর্কের ব্যপদেশে খ্রীষ্টানধর্ম্মের সারবত্তা ও হিন্দুধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় পোর্ত্তুগীস ভাষায় মানোএল্ দা আস্‌সুম্‌প্‌সাওঁ নামক পোর্ত্তুগীস পাদ্রীর দ্বারা। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণখানি রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ব্যাকরণের সঙ্গে আস্‌সুম্‌প্‌সাওঁ বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীস এবং পোর্ত্তুগীস-বাঙ্গালা শব্দকোষও ছাপাইয়াছিলেন। ইনি একটি প্রশ্নোত্তরময় খ্রীষ্টানী গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বইটির নাম কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ (Crepar Xaxter Orth, bhed)। রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া এই গ্রন্থটি লিস্‌বন হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ গ্রন্থের শেষের কয়েকটি প্রস্তাব অমার্জিত পয়ার ছন্দে রচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের মূলধারাগুলি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত ছিল—সেই বৈষ্ণবপদাবলী, জীবনীকাব্য, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রামায়ণ-মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, এবং সংস্কৃতে রচিত পুরাণজাতীয় এবং অপরাপর বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ। এই সময়ে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর আদর খুব বাড়িয়া যায়। সত্যনারায়ণের পাঁচালী অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে উদ্ভূত হয়, এবং রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ধর্ম্ম- এবং প্রণয়-সঙ্গীতও লোক-প্রিয় হইয়া উঠে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান ও তর্‌জার উদ্ভব হয়, এবং শেষভাগে ইহা পরিণতি লাভ করে।

এই সময়ের কয়েকজন মুসলমান কবিরও সন্ধান পাইতেছি। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন উত্তরবঙ্গ-নিবাসী হায়াৎ মামুদ। ইঁহার চিত্ত-উত্থান কাব্য রচিত হয় ১১৩৯ সালে অর্থাৎ ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এটি হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। হায়াৎ মামুদের অন্যান্য গ্রন্থ হইতেছে—মহরমপর্ব (১১৩০ সাল), হিতজ্ঞানবাণী (১১৬০ সাল) এবং আম্বিয়াবাণী (১১৬৪ সাল)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সংস্কৃত হিতোপ-দেশের একটি কাব্যানুবাদ করেন জগন্নাথ সেন। "শাহিজাদা রায়"-বংশীয় গোপীনাথ ধবলের পুত্র অনন্ত ধবল ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক।

২৫

পদাবলী, পদসংগ্রহ-গ্রন্থ, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও বিবিধ বৈষ্ণব কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসংখ্য কবি বৈষ্ণবপদাবলী-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু দুই চারি জন ছাড়া তাঁহাদের কাহারও কবিত্ব-শক্তির বালাই বড় ছিল না। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলিতে চন্দ্রশেখর এবং তাঁহার ভ্রাতা শশিশেখর, দুইজন রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী, এবং দীনবন্ধু দাস। চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের গীতিকবিতায় বিলক্ষণ পদমাধুর্য্য লক্ষিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতকগুলি মুসলমান পদকর্ত্তা পাওয়া যাইতেছে। যেমন আফজল, আমান, মীর ফয়জুল্লা, শেখ কবীর, এবাদুল্লা, আলিমুদ্দীন, মোহম্মদ হামীর ইত্যাদি।

পদসংগ্রহ-গ্রন্থগুলি এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যিকদিগের বড় কীর্ত্তি। এইজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন; ইহার অনতিকালপূর্বেই গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়। "হরিবল্লভ" ভনিতায় বিশ্বনাথ অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি বইটিতে সঙ্কলিত আছে।

তাহার পর নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয়। এটি বেশ বড় বই ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর, মহারাজা নন্দকুমারের গুরু, অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা ও পণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর একটি পদাবলী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বইটির নাম পদামৃতসমুদ্র। রাধামোহন ইহার একটি সংস্কৃত টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য পদসংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃত, এবং রাধামুকুন্দ দাসের মুকুন্দানন্দ। কমলাকান্তের পদরত্নাকর এবং নিমানন্দ দাসের পদরসসার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকলেরই উপরে হইতেছে গোকুলানন্দ সেন ওরফে "বৈষ্ণবদাস" কর্ত্তৃক সঙ্কলিত গীতকল্পতরু বা পদকল্পতরু। পদকল্পতরু বৈষ্ণবপদাবলীর ঋগ্বেদ-সংহিতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে প্রায় দেড়শত কবি-রচিত তিন হাজারেরও অধিক পদ বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত রস-পর্য্যায়ে সজ্জিত হইয়া সংগৃহীত হইয়াছে। গোকুলানন্দের গুরু ছিলেন দ্বিতীয় রাধামোহন ঠাকুর। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর ও পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা নহেন; ইনি ছিলেন "দ্বিজ" হরিদাসের বংশধর।

ইনিও একজন ভাল পদকর্ত্তা ছিলেন। কাটোয়ার উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে গোকুলানন্দের নিবাস ছিল। পদসংগ্রহ-কার্য্যে ইঁহাকে স্বগ্রামবাসী বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার—ওরফে "উদ্ধবদাস"—সাহায্য করিয়াছিলেন। "বৈষ্ণব-দাস" ও "উদ্ধবদাস" ভনিতায় দুই বন্ধুর রচিত অনেকগুলি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যতগুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কবিচন্দ্রের কাব্যই সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল মল্লভূমে পানুয়া গ্রামে। কাব্যটি সম্ভবতঃ মল্লাবনীনাথ দুর্জনসিংহের রাজ্যকালে (১৬৮২-১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত হইয়াছিল। ইঁহার অপর তিন কাব্য শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, রামায়ণ এবং মহাভারত যথাক্রমে বীরসিংহ (১৬৫৬-৮২ খ্রীষ্টাব্দ), রঘুনাথসিংহ (১৭০২-১২ খ্রীষ্টাব্দ), এবং গোপালসিংহ (১৭১২-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), এই তিন মল্লরাজের রাজ্যকালে লিখিত হইয়াছিল। কবিচন্দ্র-বিরচিত ধর্ম্ম-মঙ্গল এবং অভয়ামঙ্গলও পাওয়া গিয়াছে। গোপালসিংহের ভনিতায় পুরাণের ছাঁদে রচিত একটি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে; এটি রাজার কোন সভাসদের রচনা হইবে। বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃতও পুরাণের ধরণে রচিত; ইহার রচনাকাল ১৬২৪ শকাব্দ, ১১০৮ সাল অর্থাৎ ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ। বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া কাব্যটি মূল্যবান্। ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস বৃহৎ কাব্য।

বৈষ্ণবগ্রন্থের অনুবাদকারিগণের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য কৃষ্ণদাস প্রধান। ইনি স্বীয় গুরুর অনেকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালা কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দ কাব্যের অন্ততঃ চারিখানি অনুবাদ এই সময়ে করা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী চানক-গ্রামনিবাসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি ১৭০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। বইটির নাম উজ্জ্বলচন্দ্রিকা। এই শতাব্দীর শেষের দিকে দ্বারকাদাস শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন গয়ারাম দাস ও রামলোচন। অনন্তরাম দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, প্রাণনারায়ণ ও রামসুন্দর—ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নন্দকিশোর দাসের বৃন্দাবনলীলামৃতকে বরাহপুরাণের ভাষানুবাদ বলা যাইতে পারে। ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৭১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। "দ্বিজ" সৃষ্টিধরের মহেশমঙ্গলও কাশীখণ্ডের অনুবাদ।

জয়নারায়ণ করুণানিধানবিলাস নামে এক অভিনব কৃষ্ণলীলাময় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বইটির রচনা শুরু হয় ১২১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে।

করুণানিধানবিলাস কাব্যটির নানাদিক্ দিয়া বিশেষত্ব আছে। সংস্কৃতেও একটি অনুরূপ কাব্য জয়নারায়ণ রচনা করাইয়াছিলেন। সেটির নাম জয়-নারায়ণকল্পদ্রুম।

পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যখ্যাপক তিনখানি জগন্নাথমঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কবি তিনজনের নাম বিশ্বম্ভর দাস, কবি কুমুদ এবং "দ্বিজ" মধুকণ্ঠ। বিশ্বম্ভর দাসের কাব্যে কলিকাতার মদনমোহনদেবের উল্লেখ আছে, সুতরাং ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে রচিত হয় নাই।

২৬

বৈষ্ণবজীবনী

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের দুইখানিমাত্র জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—ওরফে প্রেমদাস—১৬৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় অবলম্বনে চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী রচনা করেন। প্রেমদাস আর একখানি জীবনীজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন—বংশীশিক্ষা। ইহাতে কবির গুরুর পূর্বপুরুষ বংশীবদন চট্ট এবং তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। শ্রীচৈতন্যের এবং ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব মোহান্তদের সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন কথা আছে। বংশীশিক্ষা ১৬৩৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। পুরুষোত্তম মিশ্রের গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। এই নামেই তিনি গ্রন্থ দুইটি রচনা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্যকার ছিলেন নরহরি—ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী। ইঁহার পিতা জগন্নাথ ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। ইঁহাদের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে সৈয়দাবাদ গ্রামে। নরহরি বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার কবিত্বশক্তিও ছিল। ইঁহার রচিত পদগুলিতে বিশেষ ছন্দোনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। নরহরি বিবিধ বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি ছন্দের উদাহরণ দিয়া ছন্দঃসমুদ্র নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্কলিত পদসংগ্রহ গীতচন্দ্রোদয়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি। নরহরি তিন-চারিখানি জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বে যে অদ্বৈতবিলাসের কথা বলিয়াছি তাহা ইঁহার রচনা হওয়া সম্ভব।

নরহরির ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব-ইতিহাসের মহাকোষ বলা যাইতে পারে। অবিসংবাদিতভাবে এটি হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

প্রেমবিলাসের মত ইহাতে মুখ্যত শ্রীনিবাস আচার্য্যের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইলেও অন্যান্য বহু বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের বিষয়ে অনেক সংবাদ ইহাতে পাওয়া যায়।

নরোত্তমবিলাস বইটিকে ভক্তিরত্নাকরের পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহাতে নরহরি প্রধানভাবে নরোত্তমের জীবনী ও কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। নরোত্তমবিলাস এবং অধুনালুপ্ত শ্রীনিবাসচরিত্র এই দুইখানি গ্রন্থ ভক্তি-রত্নাকরের মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এ দুইটি পূর্ব্বেকার রচনা।

শ্যামানন্দের জীবনী-বিষয়ে দুইখানি ছোট ছোট নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে; দুইখানিরই নাম শ্যামানন্দপ্রকাশ। একখানির লেখকের গুরুদত্ত নাম "কৃষ্ণ-চরণ দাস।"

বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীর বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। কবি সম্ভবতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্য সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। জয়দেবচরিত্রে কেন্দুবিল্ব গ্রামে বর্দ্ধমানরাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই মন্দির নির্ম্মিত হয় ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং বনমালী দাসের কাব্য ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু কত পরে তাহা বলিবার উপায় নাই।

২৭

রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কয়খানি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে কবিচন্দ্রের কাব্যের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে অপর কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—রামগোবিন্দ দাস ওরফে হনুমন্ত দাস, ভবানীশঙ্কর বন্দ্য, "ভিক্ষু" রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র যতি, জগৎরাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্য, "দ্বিজ" ভবানীনাথ এবং "দ্বিজ" সীতাসুত। রামপ্রসাদ বন্দ্যের রামায়ণ-রচনা সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে। পিতার সাহায্যে ইনি আরও দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, একখানি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক—কৃষ্ণলীলামৃতরস, অপরটি শক্তিবিষয়ক—দুর্গাপঞ্চরাত্রি। শেষোক্ত কাব্যখানি সম্পূর্ণ হয় ১৬৯২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে; তখন কবির বয়স বাইশ বৎসর। কবির পিতা জগৎরামের ভনিতাও এই কাব্যটিতে দেখা যায়। জগৎরাম লঙ্কা-কাণ্ড ব্যতিরেকে সমগ্র কাব্য-রচনা আরম্ভ করেন,

এবং পুত্র রামপ্রসাদ বিস্তৃত লঙ্কা-কাণ্ড রচনা করিয়া দিয়া তাহা সম্পূর্ণ করেন। জগৎরাম শেষ বয়সে, ১৭০৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, আত্মবোধ নামে একটি অধ্যাত্মবিষয়ক কাব্য রচনা করেন। তাহাতে ইনি নিজের রামায়ণ-কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল দামোদর-তীরে, রাণীগঞ্জের অপর পারে ভুলুই গ্রামে। "দ্বিজ" সীতাসুতের কাব্যে মল্লরাজ গোপাল-সিংহের নাম আছে। নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে একটি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। ইনি আরও দুই একটি কাব্য রচনা করিয়া-ছিলেন।

কয়েকজন কবি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ অথবা রামায়ণের কাহিনীবিশেষ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—কৃষ্ণদাস, কৈলাস বসু এবং শিবচন্দ্র সেন। ফকীররাম কবিভূষণ অঙ্গদ-রায়বার রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা রামচরিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত হইতেছে রামানন্দ ঘোষের কাব্য। রামানন্দ ঘোষ ছিলেন নীলাচলের জগন্নাথদেবের উপাসক, তিনি আবার তান্ত্রিকমতে কালীপূজাও করিতেন এবং নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াও প্রচার করিতেন! অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে যে অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, রামানন্দ বোধ হয় সেই মতাবলম্বী ছিলেন।

এই যুগে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এই কয় জন—কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ইঁহার কাব্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি), ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস, "জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" বাসুদেব (ইনি কোচবিহার অঞ্চলের লোক ছিলেন) এবং ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী। পিতা ষষ্ঠীবরের সহযোগিতায় গঙ্গাদাস একটি মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। সদানন্দ নাথের ভারত-পাঁচালী কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনাও হইতে পারে।

ইহা ছাড়া দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, গোপীনাথ পাঠক, রাজীব সেন, গোপীনাথ দত্ত, চন্দনদাস দত্ত, "দ্বিজ" সীতারামের পৌত্র রামনারায়ণের পুত্র রামলোচন, উড়িষ্যা-বাসী কবি সারল, এবং আরও কয়েকজন কবির রচিত এক একটি পর্ব পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। "দ্বিজ" কৃষ্ণরামের অশ্বমেধ-পর্ব সুবৃহৎ কাব্য। লোকনাথ দত্ত এবং রামনারায়ণ ঘোষ মহাভারতীয় নলদময়ন্তী-কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র দাসের কাব্যের বিষয় হইতেছে শকুন্তলার উপাখ্যান।

২৮
মনসামঙ্গল কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে মনসামঙ্গল কাহিনীর বিশেষ সমাদর ছিল। এই দুই অঞ্চলের বহু কবি বা গায়ন মনসামঙ্গল কাব্য অথবা কাহিনী-বিশেষ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের নাম করার প্রয়োজন নাই। তবে প্রধান দুই তিন জন মনসামঙ্গল-কবির উল্লেখ করা যাইতেছে। সীতারাম দাসের মনসামঙ্গলের কথা পূর্বে বলিয়াছি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণের মনসামঙ্গল বিরচিত হয় ১৬২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি একখানি ছোট ব্রত-কথাজাতীয় কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন; কাব্যটির নাম আদিত্যচরিত বা সূর্য্যমঙ্গল। এই কাব্যটি ১৬৩১ শকাব্দে বা ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের "দ্বিজ" রসিকের মনসামঙ্গল সুবৃহৎ কাব্য। চম্পকপুরী-নিবাসী দ্বিজ বাণেশ্বর (বাণেশ্বর) রায় কাব্য রচনা শুরু করেন ১৬৪১ শকাব্দের অথাৎ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে। "শাজাদা রায়"-বংশীয় কবিচন্দ্রের মনসামঙ্গলের অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার পুত্রের নাম রঘুবীর। নিবাস শ্যামদাসপুর। উত্তরবঙ্গের কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ১৬৬৬ শকাব্দে ১১৫১ সনে অর্থাৎ ১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসার পাঁচালী রচনা করেন। অনেক অংশে ইনি পূর্ববর্ত্তী কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের অনুসরণ করিয়াছেন। তৎসত্বেও ইঁহার কাব্যে কিছু নূতনত্ব আছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলের একাধিক কবি এই সময়ে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ষষ্ঠীধর দত্ত ও "দ্বিজ" জানকীরাম। শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহও একখানি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইনি আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—রাগমালা এবং ভারতীমঙ্গল। ভারতীমঙ্গলে বিক্রমাদিত্য কাহিনীর উপলক্ষ্যে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

২৯
বিবিধ দেবীমাহাত্ম্য কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছোট বড় অনেক দেবীমাহাত্ম্যসূচক "মঙ্গল"কাব্য লেখা হইয়াছিল। দুই এক খানি ছাড়া সেগুলি কাব্য হিসাবে প্রায়ই মূল্যহীন।

গঙ্গাধর দাসের কিরীটিমঙ্গল কাব্যে কিরীটকোনার দেবী কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য এবং কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাব্যটির রচনাকাল হইতেছে ১৬৮৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। কতকগুলি ছোট

ছোট ব্রতকথাজাতীয় কাব্য ছাড়াও তিনচারিখানি বড় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে রচিত হইয়াছিল। যথা—"মোদক" কৃষ্ণজীবনের অভয়ামঙ্গল বা অম্বিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল এবং রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত। মুক্তারাম সেনের কাব্য লেখা হয় ১৬৬৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। জয়নারায়ণ সেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর সহযোগিতায় একটি সত্যনারায়ণ-পাঁচালী রচনা করেন, নাম হরিলীলা। কাব্যটির রচনাকাল হইতেছে ১৬৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি একখানি যোগশাস্ত্রবিষয়ক কাব্য রচনা করেন, নাম মায়াতিমিরচন্দ্রিকা।

চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী অবলম্বনে রচিত কাব্যের সমাদর এই সময়ে আরও বেশী ছিল। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে "দ্বিজ" শিবদাস বা শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্দ্র) বসুর চণ্ডীবিজয় বা দেবীমঙ্গল বা কালিকামঙ্গল রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, জগৎরাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্য রচিত দুর্গাভক্তিচিন্তামণি, বলদুর্লভের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল, "দ্বিজ" শান্তিরামের কালীমঙ্গল, এবং বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তের দেবীমাহাত্ম্য। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তিচিন্তামণি এবং "দ্বিজ" রামনিধির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী দেবীভাগবত-পুরাণ অবলম্বনে রচিত। "দ্বিজ" কালিদাসের কালিকাবিলাসে শিবদুর্গার গৃহস্থালী ও দুর্গাপূজার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাব্যটি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকিশোর রায়ের দুর্গালীলাতরঙ্গিণীতে সৃষ্টিপত্তন, শিবপার্ব্বতী উপাখ্যান, শুম্ভনিশুম্ভবধ, ব্রজলীলা, ও ভূভারহরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। হরি দত্তের কালিকাপুরাণ সুবৃহৎ কাব্য। "দ্বিজ" গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল কাব্যে উমার জন্ম হইতে দুর্গাপূজা অবধি বৃত্তান্ত আছে, এমন কি ব্রজলীলাও।

কালিকামঙ্গল নামে খ্যাত বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানকাব্যগুলি বাহ্যতঃ দেবীমাহাত্ম্য খ্যাপন করিলেও ঠিক ভক্তিকাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। সেইজন্য এই কাব্যগুলি পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইতেছে।

৫০

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্ম্মপুরাণ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অনেকগুলি ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্ম্মমঙ্গলগুলির রচয়িতারা প্রায় সকলেই দামোদর নদের দক্ষিণ

ও পশ্চিম এবং দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর এবং পূর্ব এই সীমানার মধ্যে বাস করিতেন। তাবৎ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে প্রথম মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করায় ঘনরামের কাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচার পাইয়াছে আধুনিক সময়ে। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্নের নিবাস ছিল বর্দ্ধমানের তিন ক্রোশ দক্ষিণে, দামোদরের অপর পারে কৃষ্ণপুর গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা। ঘনরাম বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন, এ কথা কাব্যের ভনিতায় পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। ১৬৩৩ শকাব্দের অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঘনরাম তাঁহার কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন।

> শক লিখি রাম গুণরস সুধাকর
> মাগ কাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
> সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি,
> যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।

কবি একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল বৃহৎ কাব্য। রচনা বেশ প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্রাসের প্রয়োগ অত্যধিক।

দক্ষিণ রাঢ়ের প্রধান প্রধান কবিদের মত ঘনরামও তাঁহার কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তি-কাহিনী দিয়াছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে পরিত্যক্ত হওয়ায় এই অংশ আমাদের হস্তগত হয় নাই। সম্প্রতি ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের গায়ন শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ পণ্ডিতের কাছে ঘনরামের আত্মকাহিনীর গল্পাংশটুকু পাইয়াছি। ইহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ঘনরাম পড়িতেন রামবাটী গ্রামের চৌপাড়িতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের নিত্যপূজার ফুল তুলিবার ভার ছিল টোলের পড়ুয়াদের উপর পালা করিয়া। একদিন ঘনরামের পালা পড়িলে তিনি গেলেন বেগুন-বাড়িতে ফুল তুলিতে। ফুল তুলিতে তুলিতে তাঁহার পায়ে বেগুন-পাতার কাঁটা বিঁধিয়া গেল। কাঁটা তুলিতে হইলে পায়ে হাত দিতে হয়, আর সে হাতে পূজার ফুল ছোঁয়া চলে না। পায়ে কাঁটা বিঁধিয়া রহিল, ঘনরাম ফুল তোলা শেষ করিয়া ঠাকুর ঘরে রাখিয়া আসিলেন। তাহার পর কাঁটা তুলিলেন। ভট্টাচার্য্য পূজা করিতে আসিয়া দেখেন, দেবমূর্ত্তির পদতলে কাঁটাসমেত বেগুন-পাতা লাগিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি পড়ুয়াদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সেদিন ঘনরামের ফুল তুলিবার পালা ছিল। গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ফুল কোথায় তুলিয়াছিলে? ঘনরাম উত্তর করিল বেগুন-বাড়িতে। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ইষ্টদেবের উপর অভিমান করিয়া ঘর ছাড়িয়া পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি ঘনরামকে লইয়াই থাক; আমি আর তোমার পূজা করিব না, কারণ সারা

জীবন তোমার পূজা-অর্চনায় নিযুক্ত থাকিলাম কিন্তু আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে না, আর সামান্য পড়ুয়া ঘনরামের প্রতি এত অনুগ্রহ!

রামবাটী ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ বাদশাহী রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। একে বৃদ্ধ তায় প্রচণ্ড রৌদ্র। ক্লান্ত হইয়া তিনি পথের ধারে এক গাছের তলায় শুইয়া পড়িয়া তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বেদে বালক-বালিকা ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, পুরী যাব কোন্ দিক্ দিয়া? ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই পথেই পুরী যাওয়া যায় শুনিয়াছি; আমিও পুরী যাইব; তোমরা আগাইয়া চল, আমি পিছু পিছু যাইতেছি। এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য আবার তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ যায় আর একটি বেদে বালক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, আমার দাদা-বৌদিদিকে এদিকে যাইতে দেখিয়াছ কি? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, তাহারা এই পথে পুরী গেল। শুনিয়া বালকও সেই পথে ছুটিল। ব্রাহ্মণ আবার ঝিমাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে পুনরায় নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। গাছের ডাল হইতে একটি হনুমান্ ঝুপ করিয়া ব্রাহ্মণের কোলে লাফাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলে হনুমান্ মানুষের ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, তুমি কোথায় যাইবে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, পুরী যাইব। এই কথা শুনিয়া হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া ভট্টাচার্য্যের গালে এক চড় লাগাইয়া বলিল, চোখের উপর রাম-সীতা গেলেন, লক্ষ্মণ গেলেন, তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া আবার পুরী যাইবে। যাও, ঘরে ফিরিয়া রামচন্দ্রের পূজা কর গিয়া। অনুতপ্ত চিত্তে ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঠাকুর-পূজার ভার আর নিজে লইতে সাহস না করিয়া ঘনরামের উপর দিলেন।

কিছুদিন যায়। একদিন ঘনরামকে ডাকিয়া বিশেষ কোন কথা না বলিয়া ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ঘনরাম পুঁথির কাগজপত্র সাজাইয়া রামায়ণ-পাঁচালী লিখিতে প্রস্তুত হইলেন এবং ঠাকুর-পূজা করিয়া পুঁথিতে রামচন্দ্রের ধ্যান ও বন্দনা-মন্ত্র লিখিয়া আরম্ভ করিয়া রাখিলেন। পরদিন পূজাশেষে লিখিতে গিয়া দেখেন যে পুঁথিতে রামচন্দ্রের ধ্যান ও প্রণাম-মন্ত্র—যাহা পূর্ব্বদিন লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহার স্থানে লেখা রহিয়াছে ধর্ম্মের ধ্যান ও প্রণাম। ঘনরাম বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, এ কি হইল! কিছু বুঝিতে না পারিয়া ঘনরাম পুঁথির পাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় রামচন্দ্রের ধ্যান ও বন্দনা লিখিয়া সেদিনের মত রাখিয়া দিলেন। নিশীথে স্বপ্ন দেখিলেন যেন রামচন্দ্র তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া বলিতেছেন, তোমায় আর রামায়ণ লিখিতে হইবে না, উহা অনেক কবি অনেক ভাবে লিখিয়াছে; তুমি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা কর। ঠাকুরের এই স্বপ্নাদেশে ঘনরাম রামায়ণের বদলে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিলেন।

রামচন্দ্রের প্রতি ঘনরামের পরম ভক্তির নিদর্শন তাঁহার কাব্যে প্রচুরভাবে বর্ত্তমান।

মল্লভূমের অন্তর্গত আমোদর নদের তীরবর্ত্তী চামোট গ্রাম-নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্য তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের রচনা সমাপ্ত করেন মল্লাব্দ ১০৩৮ সালে অর্থাৎ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম ছিল জীবন, মাতার নাম মহামায়া।

বর্দ্ধমান জেলায় দক্ষিণ অংশে শাঁখারি গ্রাম-নিবাসী নরসিংহ বসু তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে যে আত্মকাহিনী ও কাব্যোৎপত্তিবিবরণ দিয়াছেন তাহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কবির পিতামহ পিতৃভূমি বসুধা গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া শাঁখারিতে বাস করেন, তখন

অধিকারী দেশের শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায়,
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।

মথুরা বসুর তিন পুত্র—ঘনশ্যাম, রাধিকা ও রামকৃষ্ণ। ঘনশ্যামের পুত্র নরসিংহ। নরসিংহের মাতার নাম নবমল্লিকা। কবি বলিতেছেন,

অল্প কালে পিতার হইল পরলোক,
পিতামহী ঠাকুরাণী পাইল বড় শোক।
পিতৃব্যবহারে পালিল যত্ন করি,
বাঙ্গালা পারসী উড়্যা পড়াইল নাগরী।

লেখাপড়া শিখিয়া কবি গ্রামদেবী "অষ্টভুজা শঙ্করীর কৃপা" সম্বল করিয়া বিদেশে রোজগার করিতে বাহির হইলেন। নানা স্থান ঘুরিয়া তিনি শেষে আসিলেন বীরভূম রাজনগরে।

বাঙ্গলায় বীরভূমি বিখ্যাত অবনি,
শ্রীআসফুল্লা খান রাজা শিরোমণি।
প্রবলপ্রতাপ ভূপ সমরে প্রচণ্ড,
সব দেশে যশ গায় রাজা ঝারিখণ্ড।
অস্ত্রে শস্ত্রে নিপুণ বিখ্যাত মহীতলে,
দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে।

আসফুল্লা নরসিংহকে মুকসুদাবাদ নবাব দরবারে নিজের তরফের উকীল নিযুক্ত করিলেন।

একবার উপযুক্ত সময়ে খাজনার সব টাকা নবাব সরকারে দাখিল না হওয়ায় গোলমাল হয়। অনেক বলা কহায় নবাব জাফর খাঁ কবিকে কিছু সময় দিলেন বাকি খাজনা শোধ করিয়া দিবার জন্য। কবি বলিতেছেন

বীরভূমি বিদায় আনিতে বাকি কর,
রাতে দিনে চল্যা যাই দাখিল নগর।

সেখানে অনেক বিবেচনার পর

নিকাশ বলিল দিব টাকা এক লাখ,
কাত্তিকের তিরিশা ভর্যা পাচার বেবাক।

নরসিংহের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় আসফুল্লা প্রীত হইলেন।

জামা জোড়া শিরোপা দিলেন মহারাজ,
বিদায় করিল যাহ মুকশুদাবাদ।

রাজবাড়ীর বাহিরে আসিয়া কবি ভাবিলেন, তিরিশে কাত্তিকের তো অনেক দেরি, একবার বাড়ি ঘুরিয়া যাই না কেন। নরসিংহ গৃহাভিমুখে পালকি ছুটাইলেন। পালকির কাহার পবনবেগে ধাইল। তাহারা

রাতে দিনে চল্যা যায় নাহিক বিশ্রাম,
আউষগ্রামে ঝড়-বিষ্টি রজনী মোকাম।

সেখানে আতিথ্য লইলেন পিসতুতো ভাই নারায়ণ মল্লিকের বাড়িতে।

যশোদা পিসির বেটা নারায়ণ নাম,
সেখানে বিষয় তার শাঁখারিতে ধাম।
যথোচিত সমাদর করিল মল্লিক,
কাহার বেগারে দিল করিয়া লৌকিক।

আবার পালকি ছুটিল উত্তরমুখে। কবি বলিতেছেন,

পথে বড় জলকাদা পাল্যাম জুঝাটি,
যেখানে ধর্ম্মের পূজা হয় পরিপাটি।

অদূরে পালকি নামাইয়া লোকজন রাখিয়া কবি একাকী গেলেন খেজুরতলায় ধর্ম্মঠাকুরকে প্রণাম করিতে। গিয়া দেখেন

অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আস্যা উপস্থিত,
আশীর্ব্বাদ দিয়া কন গাও কিছু গীত।
অপরূপ বচন বলিল মহাশয়,
চারি পার্শ্বে...মোহিত কতক হৈল ভয়।
ভূমে পড়্যা দণ্ডবৎ যুড়্যা দুই কর,
মাথা তুল্যা চাহিতে সন্ন্যাসী অগোচর।

মনে মনে সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে কবি "পার হৈয়া দামোদর পাইল ভবন।"

ঘরে দিন দুই কাটাইয়া নরসিংহ মুকশুদাবাদ যাত্রা করিলেন। পথে কেবলই সন্ন্যাসীর আদেশ মনে জাগিতে লাগিল। তাহার পর যথাসময়ে খাজনার টাকা দাখিল দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কবি

প্রিয়সখা পরম আচার্য্য খেলারাম,
হরি সোম আর শম্ভু বসু অনুপাম।
সবিশেষ সভাকে কহিল সমাচার,
গীত রচি সম্মত হইল সভাকার।

বন্ধুদের সম্মতি লইয়া নরসিংহ কাব্যের পত্তন করিলেন ১৬৭৬ শকাব্দের অর্থাৎ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই শ্রাবণ তারিখে।

শক ইন্দু পিঠে ঋতু ভুবনেতে রস,
কবিত্ব আরম্ভ কর্কটের দিন দশ।
দিনে দরবার করি রাত্রে করি গীত,
ধর্ম্মের কৃপায় পূর্ণ হইল সঙ্গীত।

এই তো গেল গ্রন্থারম্ভে আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ। কাব্যের শেষে কবি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর জন্য ধর্ম্মঠাকুরের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছেন। কবির তখন বয়স হইয়াছিল কেননা দুই পৌত্রের নাম রহিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের গায়ন শূলপাণিও বাদ পড়ে নাই।

শূলপাণি গায়েন আমরা মাগি বর,
বল দিবে গায়েতে গলায় দিবে স্বর।

হৃদয়রাম সাউ রচিত ধর্ম্মমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১১৫৬ সালের অর্থাৎ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আশ্বিন তারিখে। ইনি বর্দ্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দরাম বাঁড়ুজ্জের ধর্ম্মমঙ্গলের একটি পুঁথি মল্লাব্দ ১৭৯১ সালে অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং কাব্যটির রচনাকাল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্রের ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। "দ্বিজ" ক্ষেত্রনাথের কাব্যের অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার উপায় নাই। নিধিরাম গাঙ্গুলী কবিচন্দ্রের ধর্ম্মমঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। মল্লভূম-নিবাসী প্রভুরাম মুখুটিও ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম জানকীরাম।

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের অনেক বিশেষত্ব আছে। কবির নিবাস ছিল বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া-হুগলী সীমান্তে বেলডিহা গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম

গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী। ধর্ম্মঠাকুরের অনুগ্রহ-বর্ণনার উপলক্ষ্যে মাণিকরাম যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম বলিতেছি।

নানা স্থানে কিছুকাল থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়া শেষে মাণিকরাম ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে ভুড়াড়ি গ্রামে গেলেন। সেখানে পড়াশুনা আরম্ভের উপক্রম করিতে করিতে একমাস কাটিয়া গেল। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, স্বপ্নে শোকাবেগে

উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কপালে মারি ঘা,
কি হইল হায় হায় কোথা গেলে মা।

এমন সময়ে হঠাৎ মনে হইল যেন এক ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহাকে তত্ত্বকথা কহিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন,

নিয়তি খণ্ডিতে নারে হরি হর ধাতা,
মা-বাপে লইয়া ঘর কে করেছে কোথা।

ধর্ম্মঠাকুরের শরণ লইতে এবং ভট্টাচার্য্যকে বলিয়া ঘরে যাইতে উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণ-ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। মাণিকরামেরও অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং "প্রভাত হইল রাত্রি পরম যতনে।" গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কবি খুঙ্গি-পুঁথি লইয়া দ্রুতগতিতে গৃহের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। বেলা যখন ছয় দণ্ড বেতানল গ্রামে পেঁাছিলেন। নদী পার হইয়া মাণিকরাম দিশাহারা হইলেন। শেষে সূর্য্য অভিমুখ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। খাঁটুল গ্রামে যখন পা দিলেন তখন কবি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনা এখনও বাকি।

কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে,
এক দ্বিজের সহিত দেখা দেশাড়ার মাঠে।

দ্বিজবর

পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইয়া পথে,
অপূর্ব অদ্ভুত মূর্ত্তি আসা-বাড়ি হাতে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাক্যহীন ও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে রূপান্তর লইতে লাগিলেন, "দেখিতে দেখিতে হইল যুবত্ব-শরীর।" তাঁহার সহিত কথা কহিয়া মাণিকরাম বুঝিতে পারিলেন যে ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ পণ্ডিত। মাণিক-রামের সহিত ব্রাহ্মণের "আভাষে কিঞ্চিৎ হ'ল শাস্ত্র আলাপন।" উপযাচক হইয়া ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিলেন—"রাজ্যধর বিদ্যাপতি, রঞ্জপুরে ধাম," এবং বলিলেন, তুমি আমার কাছে পড়িতে আসিও, আমি তোমাকে সত্যস্বরূপ

বিদ্যা শিখাইব, তাহাতে তুমি জগতে যশোলাভ করিবে। শেষে তিনি হাসিয়া কবিকে আগু বাড়াইতে কহিলেন। মাণিকরাম বলিতেছেন, "আমিহ এলাম, তিনি রহিলেন বসে।" দুই-চারি পা আগাইয়া কবি পিছনে তাকাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। পরম বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া কবি ফিরিয়া গাছের তলায় আসিয়া খুঙ্গি-পুঁথি ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটু পরে একজন ধর্ম্ম-উপাসক "পণ্ডিত" সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

ধর্ম্মের পাদুকা দুটি বাঁধা আছে গলে,
বসিলা বিশ্রাম-আশে সেই বৃক্ষ-তলে।

পণ্ডিত মাণিকরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যধর বিদ্যাপতি গেলা এই পথে?" কবি বলিলেন, "কি হেতু তাহারে খোঁজ, কিবা প্রয়োজন?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন,

চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা,
পদ্মতুল্য সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা।
পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ,
সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ।

পণ্ডিতের কথায় চকিত হইয়া মাণিকরাম চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন যে নিকটে এক সরোবর রহিয়াছে, এবং দীঘির পাড়ে গিয়া দেখিলেন, "পীযূষতুল্য জল, প্রফুল্ল হইয়া আছে পদ্ম শতদল।" সবস্ত্র স্নান করিয়া মাণিকরাম কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিলেন ধর্ম্মের পাদুকা পূজা করিবার জন্য। গাছের তলায় আসিয়া দেখেন, কোথায় বা পণ্ডিত, কোথায় বা ধর্ম্মের পাদুকা। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, সে সরোবরও নাই। ভীত হইয়া কবি গাছের তলায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ধ্যান করিয়া "ধর্ম্মায় নমঃ" বলিয়া পদ্মফুলগুলি নিকটস্থ অপর একটি পুকুরে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের পানে চলিলেন। যখন বাড়ী পৌঁছিলেন তখন বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে।

বাড়ীতে দুই দিন কাটাইয়া মাণিকরাম রঙ্গপুরের দিকে চলিলেন। হাজিপুর পার হইয়া কবি পা চালাইয়া দিলেন। ফলে, "তারাজুলি তীরে গিয়া তূর্ণ উপনীত।" আবার জনহীন পথে দেখেন সেই ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি, এবার সৌম্য নহে রুদ্রবেশ।

পূর্ব্বরূপ সেই বিপ্র দাঁড়াইয়া পথে,
আসা-বাড়ি নাহিক দারুণ-বাড়ি হাতে।

সাক্ষাৎ শমনের মত দস্যুমূর্ত্তি দ্বিজ মাণিকরামের সমীপে আসিয়া সক্রোধে বলিলেন, "বধিয়া তোমাকে আজি বাড়ির নির্বৃতি।" কবি সকাতর স্তুতি করিয়া বলিলেন,

> দ্বিজ হইয়া দস্যুবৃত্তি দেখি বিপরীত,
> আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তোর পারা না দেখি বর্ব্বর, দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি মুনিবর।" সে যাহা হউক, আমার হাতে "বুঝি তোর আজি হ'ল বিঘোর মরণ।" ব্রাহ্মণের এই নিদারুণ বাক্যে মাণিকরামের দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। শেষে অনেক কষ্টে বলিলেন, "তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন-আশে।" এই কথায় রুদ্রমূর্ত্তি সংবরণ করিয়া দ্বিজ বলিলেন, আমি এখন হাজি-পুরে যাইতেছি, কিছু কাজ আছে;

> তুমি যাও গিয়া আমার ভবনে,
> না করিব বিলম্ব আসিব এইক্ষণে।

ফিরিয়া বিপ্রকে আর দেখিতে না পাইয়া কবি ভয় পাইয়া রঙ্গপুরের দিকে দৌড়াইলেন। সেখানে গিয়া ঘরে ঘরে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে রাজ্যধর বিদ্যাপতি বলিয়া রঙ্গপুরে কেহ নাই। কবি বলিতেছেন,

> ব্যামোহ বিস্তর পেয়ে ফিরে এলাম ঘর,
> যথোচিত চিন্তায় উৎকট হইল জ্বর।

মানসিক উদ্বেগে এবং পীড়ার যন্ত্রণায় কবি যখন একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন তখন হঠাৎ দেখিলেন যে সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে বসিয়া রহিয়াছেন। মাণিকরামকে সান্ত্বনা দিয়া ব্রাহ্মণ

> কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ,
> উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ।
> গীত রচ ধর্ম্মের, গৌরব হবে বাড়া,
> নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া।

মাণিকরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বট কেবা?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেশাড়ায় কৈলেশ্বার সেবা," আমি সেই; "বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।" ধর্ম্মঠাকুর আরও বলিলেন, একথা প্রকাশ করিও না, তোমাকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিব, এবং "অন্তকালে দিব দুটি অভয় চরণ।" নিজ মাহাত্ম্য "কবিতা" রচনা করিতে মাণিকরামকে সত্য করাইয়া ঠাকুর নিজের বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়া বলিলেন যে, তাহা দেখিয়া লিখিলে অনর্গল কবিতা রচিত হইবে, এবং

কবির চতুর্থ ভ্রাতা কাব্যের গায়ক হইবে, ও তাহাতে কবির "জগৎ ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর।" ধর্ম্মের গান গাহিবার কথায় কবি ভীত হইলেন, কেননা তখনকার দিনে উচ্চ-জাতির ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপূজা করা ও ধর্ম্মের গান গাওয়া সমাজবিরুদ্ধ ছিল। তাই কবি বলিতেছেন, "এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।" এবং ভয়ে ভয়ে ঠাকুরকে বলিলেন, "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "আমি তোর জাতি, তোমার অখ্যাতি হ'লে আমার অখ্যাতি।" ঠাকুর আরও বলিলেন, আমি সহায় থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই, তোমার মত ময়ূরভট্টকেও আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, এখন

> বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া,
> অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া।

এই বলিয়া ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়া মাণিকরাম ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মাণিকরামের কাব্যের পুঁথিতে এই যে রচনাকাল দেওয়া আছে তাহা একটি বিষম হেঁয়ালি।

> শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে,
> সিন্ধু সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে।
> বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত,
> শর্ব্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত।

ইহা হইতে অনেকে অনেক রকম তারিখ বাহির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনায় পাওয়া যায় ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এই তারিখই যে মোটামুটি ঠিক তাহা অনেক দিক্ হইতে সমর্থিত হয়।

মাণিকরামের রচনা মন্দ নহে, তবে ঘনরামের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু হাস্যরসের সৃষ্টিতে মাণিকরাম কতকটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মাণিক গাঙ্গুলী একটি ক্ষুদ্রকায় শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হয় রামকান্ত রায় (কৌলিক উপাধি সামন্ত) সর্বশেষ সম্পূর্ণ ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যরচনাকাল হইতেছে ১১৯৭ সাল অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। বর্দ্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদরের অপর পারে সেহারা গ্রামে রামচন্দ্রের নিবাস ছিল। এই গ্রামের বাঞ্ছারাম সরকারের ভদ্রাসনের অদূরে বাবলা-তলায় ধর্ম্মঠাকুর বুড়া-রায়ের অধিষ্ঠান ছিল। ইঁহারই আদেশে কবি ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সীতারাম ও নরসিংহের মত রামকান্তও কায়স্থ ছিলেন।

ধর্ম্মঠাকুরের অহেতুক কৃপা-বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়া রামকান্ত যে আত্ম-বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশের চাষী-ঘরের দুর্লভ বাস্তব ছবি পাইতেছি। বর্ণনাটির সাহিত্যিক মূল্যও অবজ্ঞেয় নয়। বেকার অবস্থায় গৃহবাসী যুবক কবি নিজের মনের যে অকারণ দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের পরিচয় ও বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহাতে আলেখ্যটি আধুনিক সাহিত্যের মর্য্যাদা পাইয়াছে।

রামকান্ত বলিতেছেন, একদা তিনি মাস ছয় বেকার হইয়া ঘরে বসিয়া ছিলেন। চাষবাসের কার্য্যে তাঁহার মন আদৌ লাগিত না। অকর্ম্মা অবস্থায় পড়িয়া দিন দিন তাঁহার মন উচাটন হইতে লাগিল। অথচ কেন যে এই অস্থিরতা তাহাও বুঝিতে পারিতেন না। কবি লিখিয়াছেন,

দিনে দিনে অধিক হইনু উচাটন,
প্রবৃত্তি না লয় কিসে বিচলিত মন।
ধড়ফড় করে প্রাণ অন্তর বিকল,
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল।
দিবানিশি শয়নে স্বপন দেখি কত,
দিন কুড়ি উচাটনে যায় এই মত।
কাহারে না বলি কিছু অন্তর গুমরে,
সারাদিন বেড়াই সভার ঘরে ঘরে।

লোকের বাড়ী বাড়ী বেড়াইলেও লোকের সঙ্গও বেশীক্ষণ ভাল লাগে না, এবং লোকের কথাও কানে বিষ লাগে।

নিদ্রা নাই শয়নে শর্ব্বরী জাগরণে,
উম্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে।

তখন ভাদ্র মাস, চাষের সময়। একদিন রামকান্তের পিতা তাঁহাকে বলিলেন, মাঠে কৃষাণদের জলপান লইয়া যাও;

তৈল মাখিয়া যাও কর্‍্যা এস্যা স্নান,
সেইখানে দিবে কৃষাণের জলপান।

বাপের কথায় কবির মনে রাগ হইল, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া তৈল না মাখিয়া তিনি জলপান লইয়া চলিলেন। বাড়ীর বাহির হইতে না হইতেই কতকগুলি শুভলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার মন কতকটা স্থির হইল।

নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িল মাথায়,
সেজ বনি পূর্ণকুম্ভ বামে লয়্যা যায়।

একটু আগাইয়া গিয়া বুড়া-রায়ের স্থান বাবলা-তলায় পেঁছিয়া দেখিলেন যে বাবলা গাছের উপর শঙ্খচিল বসিয়া ডাকিতেছে। কবি প্রসন্নতর চিত্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া মাঠের দিকে চলিলেন। কৃষাণেরা উত্তর মাঠে খাটিতেছিল। তাহাদের জলপান দিয়া রামকান্তের "মনে হল্য ধান্য সব দেখিয়া বেড়াতে।" উত্তর মাঠের ধান দেখিয়া তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ মাঠের ধান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। "দেখা হল্য সব জমি আর বাড়া নাই" ভাবিয়া কবি বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন,

হেনকালে মনেতে হইল আচম্বিতে,
পূব মাঠে বিঘা চারি রহিল দেখিতে।

এদিকে "বেলা হল্য বিস্তর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে," সুতরাং রামকান্ত ভাবিলেন, এখন পূব মাঠ থাক্, বাড়ী যাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে বিপরীত ইচ্ছাও জাগিয়া উঠিল। কবি লিখিতেছেন,

তাহে কিবা দেব-পাক বুড়ার করণ,
সেই ভুম দেখিতে আমার গেল মন।
মনে মনে ভাবিয়া চলিনু সেই ক্ষেতে,
বিপরীত রোদ্রুতে চলিতে নারি পথে।

কতক্দূর গিয়া কবি এক পুকুরের পাড়ে "অশ্বদ বৃক্ষের তলে পূর্ব্বমুখ হয়্যা" দাঁড়াইলেন। পুকুরে নামিয়া জল খাইয়া কবি আবার চলিলেন। কি জানি কেন পুকুর পার হইতেই তাঁহার গা ছমছম করিতে লাগিল। তবুও তিনি পা চালাইয়া ক্ষেতে গিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলেন, তাহার পর বাড়ীর দিকে মুখ করিলেন, কিন্তু "হেন কালে দিশা যেন লাগিল নয়নে।" রামকান্ত বলিতেছেন,

চলিতে না পারি চোখ ঘুমে ঢুলঢুল,
বিশেষ বিস্তর বেলা তৃষ্ণায় আকুল।

হঠাৎ কবি দিনে অন্ধকার দেখিয়া যেন মুহূর্ত্তের জন্য সংবিৎহারা হইয়া গেলেন। জ্ঞান হইলে তখন সম্মুখে এক অপূর্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিলেন,

অর্দ্ধচন্দ্র কপালে কানে জবা ফুল,
মাথায় লম্বিত জটা সর্প-সমতুল,
দিব্য ধুতি পরিধান কুসুম-আকার,
অকস্মাৎ দাণ্ডাইল সম্মুখে আমার।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রামকান্তের ভয় দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ রামকান্তের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, তোমাকে আজ সকাল হইতে খুঁজিতেছি কিন্তু তোমাকে ইতিপূর্বে একলা পাই নাই তাই দেখা দিতে পারি নাই ;

প্রভাত হইতে আজি খুঁজিছি তোমারে,
সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই সভার ঘরে ঘরে।
যার ঘরে যাও তুমি সঙ্গে ফিরি আমি,
বার দুই ডাকিনু শুনিলে নাই তুমি।
একলা না পাই তোরে বলিতে কারণ,
মধ্য-মাঠে দেখ্যা তেঁই আইলাম এখন।

ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন, তোমাকে দিয়া আমি "বারমতি" পুঁথি লেখাইব।

রামকান্ত অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, আমার বাস সর্বস্থানে, তবে বিশেষ করিয়া সেহারায় থাকি, কেন না

এই গ্রামে আছে বাঞ্ছারাম সরকার,
বাপের সমান সেবা করিল আমার।

রামকান্তের

শুনিয়া প্রভুর কথা মনে বাড়ে ভয়,
বুঝিতে না পারি এ কেমন দ্বিজ হয়।

রামকান্তকে তিন বার ডাকিয়া "বারমতি" লিখিতে বলিয়া ব্রাহ্মণ-ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। রামকান্ত কোন রকমে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, আসিবার সময়ে বাবলা-তলায় প্রণাম করিতে ভুলিলেন না। কবি লিখিয়াছেন,

মনে নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা স্নান করিবারে,
ঘরে আসি বসিতে নয়নে ঢুল ধরে।
উত্তর-দুয়ারি ঘরে করিনু শয়ন,
জাগ্রত থাকিয়া যেন ঘুমে অচেতন।
স্নান করিবার হেতু বলে মাতা পিতে,
ইচ্ছা হয় তাদিগে উত্তর নাই দিতে।

তন্দ্রার ঝোঁকে রামকান্ত স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই ব্রাহ্মণমূর্ত্তি শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন,

দেখা দিনু মাঠেতে চিনিলে নাই মোরে,
বুড়া-রায় থাকি আমি সরকারের ঘরে।

বহুকাল হইতে আমার ইচ্ছা আছে তোমাকে দিয়া আমার গান লেখাইব। এখন শীঘ্র উঠিয়া স্নান-ভোজন করিয়া লিখিবার আয়োজন করিয়া রাখ, কাল সকাল হইতে লিখিতে বসিও। কোন চিন্তা করিও না,

জাগাব তোমার নাম দেশ-দেশান্তরে,
ঘোরতর বিপদ তারিয়া দিব তোরে।
আজি হইতে তোর আমি হইলাম সখা,
রাখিব তোমার কীর্ত্তি পাষাণের রেখা।

রামকান্তের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ঠাকুর তিরোহিত হইলেন।

রামকান্ত স্নানাহারের পর বাঞ্চারাম সরকারের কাছে গিয়া সব কথা বলিলেন। সরকার আনন্দিত হইয়া লিখিবার সরঞ্জাম সব ঠিক করিয়া রাখিলেন। পরের দিন সকালে সরকারের গৃহে গিয়া রামকান্ত ধর্ম্মমঙ্গল-রচনা শুরু করিলেন। আগে আরম্ভ করিলেন জাগরণ পালা। সাত দিনে একুশ পাতা পুঁথি লেখা হইবার পর কবির কলম আর সরিল না। কবি বলিয়াছেন,

লিখিতে লিখিতে আর পুঁথি নাই চলে,
মহাম্মদ সনে লক্ষ্যা উত্তরের কালে।
ভাবিনু বিস্তর যদি পদ না চলিল,
উঠিয়া আইনু পুঁথি পড়িয়া রহিল।

কবি পুঁথি ফেলিয়া উঠিয়া গেলে সরকারের মেজ ছেলে গঙ্গারাম সযত্নে পুঁথি বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিল। এইভাবে দশ বার দিন কাটিয়া গেলে বিজয়া-দশমী রাত্রে পুনরায় বুড়া-রায় রামকান্তকে স্বপ্ন দিলেন,

অতঃপর কলম ধরিয়া লেখ পুঁথি,
অবহেলে লেখা তোর হবে বারমতি।

আরও বলিলেন, প্রত্যেক পদ তুমি এই পয়ার দিয়া আরম্ভ করিবে, তাহা হইলে "কলমের উপরে বসিব গিয়া আমি"—

জয় জয় বুড়া-রায় বাবলা-দেহারা,
রাজরাজেশ্বর প্রভু রাখেন সেহারা।

ঠাকুর আরও বলিয়া দিলেন, লিখিতে লিখিতে পদ ভুল গেলে আমাকে স্মরণ করিও,

তোমার কলমে আমি স্থির হয়্যা রব,
আপনি কলম ধর্যা পুঁথি লিখে দিব।
যখন দেখিবে যে কলম নাই সরে,
পুঁথি বেন্ধে যাবে স্নান করিবার তরে।

অতঃপর ঠাকুরের আদেশ অনুসরণ করিয়া নূতন উদ্যমে রামকান্ত অনায়াসে বাষট্টি দিনে কাব্য-রচনা শেষ করিলেন।

এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে,
আরম্ভ করিনু শুক্ল একাদশী দিনে।
মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে,
বারমতি সাঙ্গ হল্য বাষট্টি দিবসে।

তাহার পর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া কবি আত্মকাহিনী শেষ করিয়াছেন।

ভবানন্দ রায় ও দ্বিজ রাজীব-বিরচিত ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের শুধু গোলাহাট পালার দুইটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে বর্ত্তমান ছিলেন।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মপুরাণ বা অনিলপুরাণ বা ধর্ম্মমঙ্গল পুরাণজাতীয় গ্রন্থ। ইহা ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য নহে, ইহাতে লাউসেনের কাহিনী নাই। সহদেবের কাব্য কতক অংশে শিবায়ন, কতক অংশে নাথ-যোগীদের পুরাণকাব্য, আর কতক অংশে ধর্ম্মপুরাণ। শেষের অংশে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী এবং ধর্ম্ম-পূজা-সম্বন্ধীয় অপর দুইচারিটি কাহিনী আছে। শূন্যপুরাণে উদ্ধৃত নিরঞ্জনের উষ্মা ("রুষ্মা") ছড়াটি এই অংশেই আছে। ধর্ম্মান্ধ ফকীরেরা কিরূপে দক্ষিণরাঢ়ের ও উড়িষ্যার কোন কোন গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়াছিল তাহারই একটি কাহিনী এই ছড়াটির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সহদেব চক্রবর্ত্তীর কাব্য ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত হইয়াছিল। সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ। ইঁহাদের নিবাস ছিল হুগলী জেলায় রাধানগর গ্রামে।

৩১

শিবায়ন, সত্যনারায়ণ পাঁচালী ও বিবিধ কাব্য

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে শিবের গৃহস্থালীর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু শিবের বিষয়ে স্বতন্ত্র গানও অপ্রচলিত ছিল না। শিবের বিষয়ে স্বতন্ত্র কাব্য যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে লেখা নয়।

শিবের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা কাব্য হইতেছে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তন। রামেশ্বরের আদি নিবাস ছিল ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগনায় যদুপুর গ্রামে। পরে কবি কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে মেদিনী-পুরের নিকটে অযোধ্যানগরে আসিয়া বাস করেন। রামেশ্বরের শিবায়ন-

রচনা সমাপ্ত হয় ১৬৩২ শকাব্দে ("শকে হৈল চন্দ্রকলা রাম করতলে") অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে।

রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠকাব্যগুলির অন্যতম। রচনা-ভঙ্গি ভারতচন্দ্রের মত সুন্দর না হইলেও ইঁহার কাব্যে সাধারণ মানুষের ঘরগৃহস্থালীর ব্যাপার অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাহা ছাড়া কাব্যটিতে বিকৃতরুচির বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই। কবি যথার্থই লিখিয়াছেন, "ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।"

রামেশ্বর একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটি শিবায়নের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কবি তখনও যদুপুর পরিত্যাগ করেন নাই। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ, এবং সেই কারণে ইহার সমাদরও অধিক।

রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্রের শিবায়ন বৃহৎ কাব্য। রচনাকাল নিঃসংশয়িতরূপে স্থির করা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতেও পারে। কবির নিবাস ছিল হাওড়া জেলায় আমতার কাছে রসপুর গ্রামে।

অষ্টদশ শতাব্দীতে অন্তত আরও একজন কবি শিবায়ন-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—রামরাম দাস।

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের মত সত্যনারায়ণের পাঁচালীরও উদ্ভব হয় দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলে। তবে ধর্ম্মমঙ্গলের মত ইহার প্রসার ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অল্পকালমধ্যে ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রসার লাভ করে। হিন্দুদিগের তরফ হইতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির সংস্কৃতিগত মিলন-প্রচেষ্টার ফলে এই কাব্যের উৎপত্তি। পীর-ফকীরেরা সাধারণত হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেন, এইকারণে পীরের উপাসনা দুই ধর্ম্মের মিলনের সেতুস্বরূপ হইয়াছিল। সত্য-নারায়ণ বা সত্যপীর, পীরের দেবসংস্করণমাত্র, ফলে অতি সহজেই বিষ্ণুর সহিত ইঁহার একীকরণ হইয়া যায়।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী ব্রতকথার মত। প্রাচীন বাঙ্গালার সকল দেব-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে শুধু এইটিই এখনও পূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রতকথার মত পঠিত ও শ্রুত হইয়া থাকে। প্রচলিত কাহিনীটি সর্বজনজ্ঞাত বলিয়া এখানে দেওয়া গেল না।

সত্যনারায়ণ কাব্যের প্রাচীনতম কবি হইতেছেন ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এবং বিকল চট্ট। ফকীররাম কবিভূষণের কাব্য লেখা হয় ১০৭৪ ("ইন্দু বিন্দু সিন্ধু বেদ") মল্লাব্দে, অর্থাৎ ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পর "দ্বিজ" রামকৃষ্ণ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (ইনি দুইখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন—একখানির রচনাকাল ১১৪৪ সাল, "সনে রুদ্র

চৌগুণা " অর্থাৎ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ,) কবিবল্লভ, জয়নারায়ণ সেন (ইঁহার কাব্যের নাম হরিলীলা, রচনাকাল ১৬৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ), " কবি " শঙ্কর, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম, " দ্বিজ " হরিদাস, " বিদ্যাপতি " ইত্যাদি। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মহীপুর গ্রাম-বাসী বাউল বৈষ্ণব কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যের আকার যেমন সুবৃহৎ বিষয়ও তেমনি অভিনব। এই কাব্যে সত্যপীর দেবতা নহেন, তিনি মানুষ, মালঞ্চার রাজা মহীদানবের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অনূঢ়া কন্যার গর্ভজাত শিশুকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। মহীদানবের পুরোহিত কুশল ঠাকুর শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করেন। একদিন বালক সত্যপীর মালঞ্চা নগরীর পশ্চিমে নূর নদীর তীরে একটি পুঁথি কুড়াইয়া পান। কুশল ঠাকুরের নিকট আনিলে তিনি দেখিলেন যে পুঁথিটি কোরান। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোরান-পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া কুশল বালককে যেখানে পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছিল সেখানে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। কুশলের আদেশ শুনিয়া সত্যপীর তর্ক জুড়িয়া দিলেন এবং তর্কের ফলে প্রতিপন্ন করিলেন যে কোরানে ও পুরাণে ভেদ নাই, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী নহে। তাহার পর সত্যপীরের নানা কেরামতির বর্ণনা আছে।

কৃষ্ণহরির জন্মভূমি ছিল সাধারিয়া গ্রাম। কবির গুরু ছিলেন শামসের পুত্র তাহের মামুদ। কবি মুখে মুখে রচনা করিয়া যাইতেন আর লিখিয়া ফেলিত হরনারায়ণ দাস। ১১৯০ সালে কৃষ্ণহরি একটি ঐতিহাসিক গাথা লিখিয়াছিলেন সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্যপীরের মত ত্রৈলোক্যপীরের গানও প্রচলিত আছে। মুসলমানদিগের মধ্যে ময়মনসিংহ ও চব্বিশ-পরগণা অঞ্চলে গাজী সাহেবের গান এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের প্রায় সর্বত্র মাণিকপীরের গান এখনও চলিত আছে। কিন্তু সাহিত্য-হিসাবে এই গানগুলির বিশেষ কিছু মূল্য নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি গঙ্গার মাহাত্ম্য-বিষয়ে গঙ্গামঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের মূল কাহিনী হইতেছে পৌরাণিক আখ্যায়িকা —ভগীরথ-কর্ত্তৃক গঙ্গাবতরণ। এই সকল কবির গঙ্গামাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্য পাওয়া গিয়াছে—গৌরাঙ্গ শর্ম্মা, জয়রাম দাস, " দ্বিজ " কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য্য এবং উলা-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি। দুর্গাপ্রসাদের কাব্য গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে রচিত হইয়াছিল। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহাতে কবির বাস্তব-দৃষ্টির ও সরসতার পরিচয় আছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী-গান বেশ প্রচলিত ছিল।

সূর্য্যের সম্বন্ধে দুইখানি ব্রতকথাজাতীয় কাব্য পাওয়া গিয়াছে। রামজীবনের সূর্য্যমঙ্গলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। এই কাব্য ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে

রচিত হইয়াছিল। অপর কবি হইতেছেন "দ্বিজ" কালিদাস। "দ্বিজ" শম্ভুরামের জীমূতমঙ্গল কাব্য সূর্য্যপুত্র জীমূতবাহনের জিতাষ্টমী-ব্রতকথা-বিষয়ে রচিত।

সরস্বতীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে তিনখানি মাত্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে। একটি হইতেছে দয়ারাম-রচিত সারদাচরিত, আর একটি "দ্বিজ" বীরেশ্বর-রচিত সরস্বতীমঙ্গল। বাসুদেব দাসের কাব্য নিতান্ত ক্ষুদ্র।

লক্ষ্মীমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্যের মধ্যে "দ্বিজ" ধনঞ্জয়ের এবং "গুণরাজ খান"-উপাধিক বৈশ্য শিবানন্দ করের কমলামঙ্গল উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বহু কবির রচিত লক্ষ্মীর ব্রতকথার ছড়া বা কাব্য পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের রচনা।

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল স্থানীয় দেবতার বিষয়ে একাধিক কবিতা, ছড়া বা গান প্রচলিত আছে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—বৈদ্যনাথ, তারকনাথ, মদনমোহন, যোগাদ্যা এবং কিরীটেশ্বরী। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গেও এইজাতীয় কবিতা বিরল নহে।

সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিদ্যাভূষণো-পাধিক রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী একখানি ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কাব্যটিতে তিনটি উপাখ্যান আছে। প্রথম উপাখ্যানে ষষ্ঠীর ও কার্ত্তিকেয়ের জন্ম এবং তারকাসুর-বধ ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যানে কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যভ্রষ্ট রাজা ক্ষেত্র মিশ্রের পুত্র, ষষ্ঠী দেবীর অনুগৃহীত দেবী-বরের বিচিত্র কাহিনী ও পিতৃরাজ্য-উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় উপাখ্যানে কলাবতীর কাহিনী। এই অংশ পাওয়া যায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের দক্ষিণ অঞ্চলে কয়েকটি শীতলামঙ্গল কাব্য লেখা হইয়াছিল। মাণিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যের কথা বলিয়াছি। কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তীর শীতলামঙ্গল লেখা হয় বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের আমলে (১৭৪৪-৭০)। অপর শীতলামঙ্গল-রচয়িতা হইতেছেন শ্রীবল্লভ, "দ্বিজ" অকিঞ্চন, শ্রীশঙ্কর কবি, নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি।

৩২

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীতে। "দ্বিজ" শ্রীধর ও শা বিরিদ খান এই পাঁচালী-কাব্যের প্রথম দুই কবি। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দুই জনকে পাইতেছি—কৃষ্ণরাম দাস ও প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী। কৃষ্ণরাম দাসের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী কবিবল্লভ ছিলেন কৃষ্ণরামের ঈষৎপূর্ববর্ত্তী

কবি। ইঁহার কাব্যের রচনাকাল হইতেছে ১৫৮৮ ("বসুম্বয় বাণ চন্দ্র") শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর সমাদর হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, পতনশীল মুসলমান দরবারের আড়ম্বর এই অঞ্চলের শিক্ষিতসমাজের মনকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছিল। সমাজ তখন অবনতিপ্রবণ, সুতরাং এসময়ের বিদ্যাসুন্দর-প্রণয়কাহিনীতে এবং বিকৃতরুচি তর্জা ও কবিগানে তখনকার দিনের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় মিলিতেছে।

এই সময়ে বিদ্যাসুন্দর-কাব্য-রচয়িতা অন্তত সাতজন কবির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—বলরাম কবিশেখর, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ন, রাধাকান্ত মিশ্র ও কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বলরাম কবিশেখরের কাব্যের রচনাকাল জানা নাই; ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। নিধিরাম আচার্য্যের বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হয় ১৬৭৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ দুইজনেই বড় কবি ছিলেন। ইঁহাদের কাব্য আলোচনার পূর্বে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

সুন্দর নামে এক বিদেশী রাজপুত্র এক মালিনীকে দূতী করিয়া রাজকন্যা বিদ্যার সহিত গোপনে প্রণয় করে। বিদ্যার মাতা কন্যার গোপনপ্রণয়-কাহিনী জানিতে পারিয়া স্বামীকে বলিয়া দেন। রাজা কোটালের সাহায্যে সুন্দরকে ধরিয়া ফেলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুন্দর দেবী কালিকার বরপুত্র, সুতরাং দেবী যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া সুন্দরকে উদ্ধার করেন। সুন্দরের পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দরের গল্প।

এই গল্পের বীজ পাওয়া যায় বিল্হণের চৌরপঞ্চাশিকা নামক সংস্কৃত কবিতায়। পরবর্ত্তী কালে ইহাকে সংস্কৃত খণ্ডকাব্যে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। বররুচির নামে যে বিদ্যাসুন্দর নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত অর্বাচীন গ্রন্থ। মূল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল না। পরবর্ত্তী কালে সুন্দরকে দেবীর ভক্ত উপাসক বা বরপুত্র দাঁড় করাইয়া ধর্ম্মের ছাপ দিয়া কাহিনীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে। সেকালে দেবদেবীর কথা না থাকিলে তাহা সাহিত্যই হইত না। ধর্ম্মের রাঙ্তা-মোড়া হইলেও ইহা যে মূলে লৌকিক কাহিনী ছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ইঁহার অন্নদামঙ্গল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। ভারতচন্দ্রের

কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবিদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান হইতেছে হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমান্তে আধুনিক ভুরশুট (প্রাচীন ভুরিশ্রেষ্ঠ) পরগনায় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রাম। ইঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, পরে ইঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। ভারতচন্দ্রের জীবন অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। নানা দুঃখকষ্টের পর ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পান এবং মূলাজোড়ে বসতি করেন। তথায় ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গলকে "মঙ্গল"-জাতীয় মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। ঠিকমত বিচার করিলে অবশ্য ইহাকে মঙ্গলকাব্য বলা যায় না, যেহেতু কেবলমাত্র দেবীর পূজাপ্রচারের জন্য অথবা পূজার বা ব্রতের আনুষঙ্গিক হিসাবে পঠিত বা গীত হইবার জন্য রচিত হয় নাই। অন্নপূর্ণামঙ্গল তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যের সমষ্টি ; এই তিনটি কাব্য—অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, এবং অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ—অতি ক্ষীণভাবে একসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল সম্পূর্ণ হয় ১৬৭৪ ("বেদ ঋষি রস ব্রহ্ম") শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতচন্দ্র আরও কয়েকখানি ছোট কাব্য বা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইখানি হইতেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী (একখানির রচনাকাল "সনে রুদ্র চৌগুণা" অর্থাৎ ১১৪৪ সাল)। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনাভঙ্গিতে। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শব্দের এমন সুসমঞ্জস প্রয়োগ আর কাহারও রচনায় দেখা যায় নাই। নানারকম সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া কবি অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কালিকামঙ্গলের মধ্যে যে গানগুলি আছে কবিতা হিসাবে সেগুলিই বোধ হয় ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।

সুবিখ্যাত শাক্ত সাধক ভক্তপ্রবর বৈদ্য রামপ্রসাদ সেনের নিবাস ছিল হালিসহরের নিকটে কুমারহট্ট গ্রামে। ইঁহার জীবনী-সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্র যেমন গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন রামপ্রসাদও তেমনি কবিরঞ্জন আখ্যা লাভ করেন। রামপ্রসাদও একখানি কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে শিল্পচাতুর্য্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য শ্রেষ্ঠ হইলেও চরিত্রচিত্রণে রামপ্রসাদের কাব্য হইতে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের অঙ্কিত চরিত্রগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক এবং যথাযথ।

রামপ্রসাদের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিকামঙ্গল কাব্য নয়, তাঁহার ভক্তিবিষয়ক সঙ্গীতগুলি। রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলির রচনায় এবং সেগুলিতে বিশেষ সুরের মধ্য দিয়া কবির ভক্তহৃদয়ের সাম্যবোধ, দৃঢ়বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে আজ প্রায় দুই শত বৎসর পরেও গানগুলির সমাদর ও মর্য্যাদা এতটুকু কমে নাই। তবে এই গানগুলি সবই বৈদ্য রামপ্রসাদের রচনা।

রাধাকান্ত মিশ্রের কাব্য রচিত হয় ১৬৮৯ ("গ্রহ বসু ঋতু বিধু") শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। কবি স্বীয় কাব্যকে "শ্যামার সঙ্গীত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবির নিবাস ছিল কলিকাতায়। যতদূর জানা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় রাধাকান্তই হইতেছেন খাস কলিকাতার প্রাচীনতন কবি। কাব্যের রচনাভঙ্গি সরল এবং গ্রাম্যতাবর্জ্জিত।

৩০

শৈব সিদ্ধাদিগের গাথা

প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালাদেশে শিব-উপাসক এক যোগী-সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহাদের আদি চারি সিদ্ধা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা। এই চারি সিদ্ধার মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী বা গালগল্প বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। এই কাহিনীগুলি দুই ভাগে পড়ে—(১) মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী এবং (২) গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে দেবীর ছলনায় মীননাথের মোহ-প্রাপ্তি এবং পরে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার বিবৃত হইয়াছে। মীননাথ-গোরক্ষনাথ-কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া গেল:—

আদ্যদেব-আদ্যাদেবী কর্ত্তৃক দেবাদি সৃষ্ট হইবার পর মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা, হাড়িপা এই চারি সিদ্ধার উৎপত্তি হইল, তাহার পর এক কন্যা হইল; ইনিই গৌরী। আদ্যদেবের আদেশে শিব গৌরীকে বিবাহ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে চলিয়া আসিলেন। আর চারি সিদ্ধা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের, এবং কানুপা (কৃষ্ণপাদ) হাড়িপার (নামান্তরে জালন্ধরিপাদের) ভৃত্যরূপে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

একদিন ক্ষীরোদসাগরে মঞ্চের উপর বসিয়া শিব ও গৌরী তত্ত্বালোচনা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে মীননাথ মৎস্যরূপে গিয়া তত্ত্বকথা "মহাজ্ঞান," শুনিয়া ফেলিলেন। দেবী জানিতে পারিয়া শাপ দিলেন যে একদিন মীননাথ এই মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইবেন। শিবগৌরী তাহার পর কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

চারি সিদ্ধা চারিদিকে চলিলেন—পূর্বদেশে হাড়িপা, দক্ষিণদেশে কানুপা, পশ্চিমদেশে গোরক্ষনাথ এবং উত্তরদেশে মীননাথ।

গৌরীর ইচ্ছা হইল যাহাতে চারি সিদ্ধা বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হন। শিব বলিলেন, উহারা বিবাহ করিবে না। দেবী তখন তাঁহাদিগকে ছলনা করিলেন। এক গোরক্ষনাথ ছাড়া তিন জনেই দেবীর ছলনায় ভুলিয়া গেলেন। দেবী তিনজনকেই অভিশাপ দিলেন। হাড়িপাকে বলিলেন,

> হাড়িরূপ ধরি যাও ময়নামতী-ঘর,
> হাতে ঝাড়ু লও তুমি কাঁধেত কোদাল।

কানুপাকে বলিলেন,

> তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়া।

মীননাথকে বলিলেন, তুমি কদলী-নারীর দেশে গিয়া তাহাদের রাজা হইয়া থাক।

দেবীর শাপে মীননাথ কদলীর দেশে রাজা হইয়া রহিলেন। মহাজ্ঞান তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন; সাধারণ লোকের মত ভোগসুখে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এদিকে গোরক্ষনাথ একদিন বকুলতলায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আকাশপথে কানুপা যাইতেছিলেন, তাঁহার ছায়া গোরক্ষনাথের গায়ে লাগিল। গোরক্ষনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিলেন, কে এমন মূর্খ আছে যে আমাকে সম্ভ্রম করে না। ক্রোধে তিনি এক পাটি জুতা উপর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন; জুতা কানুপাকে ধরিয়া আনিল। গোরক্ষনাথ বলিলেন, "মোর আসন পরে যাও কেমন সাহসে।" কানুপা হাসিয়া বলিলেন, বুঝিলাম, তুমি বড় সিদ্ধা হইয়াছ; কিন্তু ওদিকে যে তোমার গুরু "কদলীর ভোলে" পড়িয়া রহিয়াছে; তাঁহার আয়ু আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; পার তো ইতিমধ্যে তাঁহাকে রক্ষা কর গিয়া।

গোরক্ষ তখন ছুটিলেন যমের দপ্তরে। সেখানে মীননাথের আয়ুর হিসাব সব কাটিয়া দিয়া বকুলতলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবেশে চলিলেন কদলীর দেশে, লঙ্গ ও মহালঙ্গ এই দুই অনুচর লইয়া। ব্রাহ্মণবেশে সেখানে সুবিধা হইল না দেখিয়া গোরক্ষ তখন যোগিবেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে যোগিবেশধারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। নর্ত্তকী ভিন্ন কোন ব্যক্তি মীননাথের সাক্ষাৎ পায় না। গোরক্ষ তখন নর্ত্তকীর বেশ ধরিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দ্বারী রাজার নিকট যাইতে দেয় না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গোরক্ষ সভাদ্বারে মাদলের ধ্বনি তুলিলেন। মাদলের ধ্বনিতে উচ্চকিত হইয়া মীননাথ নাটুয়াকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। গোরক্ষ আসিয়া গুরুকে নমস্কার করিয়া মাদল বাজাইয়া নাচ জুড়িলেন।

ডিমিকি ডিমিকি করি মাদলে দিল ঘাত,
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খ নাথ।
নাচেন্ত গোর্খ নাথ তালে করি ভর,
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।
নাচন্তি যে গোর্খ নাথ ঘাঘরের রোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মন্দিরাএ বোলে।

মীননাথ চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। গোরক্ষনাথ তখন মাদলের বোলে গুরুকে তত্ত্বজ্ঞান দিতে লাগিলেন।

হাত-তালে কহে কথা যতি গোরখাই,
মাদলের সানে কহে গুরুরে বুঝাই।

মীননাথ ভাবিলেন, "মাদলের রাএ কেনে গুরু মোরে কহে।" বলিলেন,

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে,
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে।

কদলীরা ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে যে নর্ত্তকী ছদ্মবেশে মীননাথকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তাহারা নাটুয়াকে নাট ভাঙ্গিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে বলিল। গোরক্ষনাথ বলিলেন, "আধ-তালে নাট-ভঙ্গ করিতে না পারি।" এই বলিয়া

নাচন্ত যে গোর্খ নাথ মাদলেত হাত,
শিষ্য-পুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ।

এতক্ষণে মীননাথ চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? তাঁহার চিত্ত ভোগসুখে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, পুত্র, তুমি সত্য বলিতেছ, কিন্তু "পড়িছি কামিনীর ভোলে কিরূপে এড়াই।" গোরক্ষনাথ তখন হেঁয়ালীর ছলে তত্ত্বকথা বলিয়া গুরুর আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন—

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে,
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল,
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।
ঝিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন,
ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন।
মুখখানি তল গুরু জিহ্বাখানি ফাল,
অমর-পাটনে গিয়া জোড় যেন হাল।

অবশেষে মীননাথের চৈতন্য হইল। গোরক্ষনাথ মীননাথের পুত্রকে আছাড়িয়া মারিয়া ফেলিয়া পরে বাঁচাইলেন। ইহাতে কদলীরা ভীত হইয়া পড়িল। শাপ দিয়া তাহাদিগকে বাদুড় করিয়া দিয়া গোরক্ষ গুরু মীননাথ ও গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে লইয়া স্বস্থানে বিজয়নগরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় কাহিনীর সারমর্ম্ম দেওয়া যাইতেছে :—

রাজা মাণিক্যচন্দ্রের বিধবা পত্নী ময়নামতী সিদ্ধা হাড়িপার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রকেও তাঁহার শিষ্য হইতে অনুরোধ করেন। পুত্র অনেক ওজর আপত্তি করিয়া শেষে হাড়িপার কেরামতি দেখিয়া রাজী হইলেন। হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে শিষ্য করিয়া যোগী সন্ন্যাসী করিয়া দিলেন। নানাদেশ ঘুরিয়া অশেষ কষ্ট পাইয়া পরে রাজা দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং গুরুর আদেশে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

এই কাহিনীর মূলে হয়ত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। কিন্তু এখন গল্প হইতে ইতিহাস অংশ বাহির করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব কথাবস্তু গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী বাঙ্গালাদেশের সীমানা ছাড়িয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সুদূর পঞ্জাব, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে এই গাথা গাহিয়া এখনও যোগী সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বাঙ্গালাদেশে কিন্তু উত্তরবঙ্গ ছাড়া অন্য অঞ্চল হইতে এখন গোবিন্দ-চন্দ্রের কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত গাথাগুলির মধ্যে যেটি সর্বপ্রাচীন সেটি পশ্চিমবঙ্গের কবি দুর্লভ মল্লিকের রচনা। সহদেব চক্রবর্ত্তীর অনিল-পুরাণে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী আছে। ভীমসেন রায় ও শেখ ফয়জুল্লা রচিত গোরক্ষবিজয় উত্তরপূর্ব বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। ভবানীদাসের ও আবদুল সুকুর মহম্মদের পাঁচালীও উত্তরবঙ্গে মিলিয়াছে। এদুটির রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হওয়া অসম্ভব নহে।

৩৪

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ—যুগসন্ধি

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানীর অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার পাইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া দেশের রাজশক্তি করতলগত করিল। ইহাতে বাঙ্গালাদেশে তথা ভারতবর্ষে নূতন যুগের আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঘটিল। এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই বাঙ্গালায় গদ্য-রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। শুধু

খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা নহে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের যত্নও এবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্যকর হইয়াছিল। প্রথমশিক্ষার্থীদিগের জন্য স্মৃতি ও ন্যায়-শাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ-কার্য্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৈদ্যেরা দুই-একটি কবিরাজী বইও বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যদয় না ঘটিলে এই প্রচেষ্টা যে কতদূর অগ্রসর হইত তাহা বলা শক্ত।

ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য পাইয়া দেশের আইনকানুন প্রণয়ন করিতে লাগিয়া গেল। চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির বাহিরে ইহাই হইল বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম কার্য্যকর ও ব্যাপক ব্যবহার। তাহার পর বাঙ্গালীকে ইংরেজী এবং ইংরেজকে বাঙ্গালা শিখাইবার আবশ্যকতা অনুভূত হইলে ব্যাকরণ ও অভিধান-গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। হাতে লেখায় এই কার্য্য নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং অনতিবিলম্বে মুদ্রাযন্ত্র ও বাঙ্গালা টাইপের প্রয়োজন অনুভূত হইল। বাঙ্গালা টাইপের ছেনী কাটেন সর্বপ্রথম একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ। ইনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী, নাম চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্‌স্; পরে ইনি স্যার চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্‌স্ নামে বিখ্যাত হন। উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকারকে ছেনী কাটা শিখাইয়া দেন। এইরূপে বাঙ্গালা টাইপের প্রবর্ত্তন হইল। বাঙ্গালা টাইপের প্রথম ব্যবহার হয় হালহেড সাহেব রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে। বইটি ইংরেজীতে লেখা, প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতে। মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল, এ কথা বলা যাইতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পুস্তক-প্রকাশ অনায়াসসাধ্য ব্যাপার। পূর্বে হাতে-লেখা পুঁথির চলন ছিল; একখানি পুঁথি লিখিতে যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। মদ্রিত পুস্তক সহজলভ্য, সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের দৌলতে সাহিত্যভাণ্ডার ধনী-দরিদ্র সকলেরই নিকট উন্মুক্ত হইল; সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সাহিত্য তখন হইতে সকলের নিকট সকল সময়ের জন্য উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল।

বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইবার পরও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্বের মত বৈষ্ণব পদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদি ধর্ম্মকাব্য যথেষ্ট রচিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদও অনেকগুলি হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে প্রণয়-কাহিনী-কাব্য শহর অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। এই সকল কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গে ঐতিহাসিক এবং অনৈতি-হাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত পল্লীগাথা বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত রহিয়াছে। অনেকগুলি চমৎকার গাথার সংগ্রহ ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ—কোম্পানী আমল

৩৫

বাঙ্গালা গদ্যের আদি যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে দুই একখানি আইনের বই বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল। এইসব বই সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না। এগুলি দলিল-পত্রের মত আরবী-ফারসী শব্দে পূর্ণ। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ব্যাপক আরম্ভ হইল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম হইতে। বিলাত হইতে সদ্য-আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল। কলেজে প্রাচ্যভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী পাদ্রী উইলিয়ম কেরী। পরবর্ত্তী সালের মে মাসে এই বিভাগে কেরীর সহকারী পণ্ডিত ও মুন্‌শী কয়েকজন নিযুক্ত হন। তখন হইতেই কলেজের প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইল।

সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া দেখা গেল যে বাঙ্গালা গ্রন্থ সবই কাব্য। সাহেবদের প্রয়োজন ব্যবহারোপযোগী শিক্ষা, সুতরাং গদ্য-পুস্তকই পাঠ্য হিসাবে উপযুক্ত হইবে। এই ভাবিয়া কেরী তাঁহার সহকারী পণ্ডিত ও মুন্‌শীদিগকে দিয়া বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক লেখাইতে লাগিলেন এবং নিজেও একটি ব্যাকরণ, একখানি অভিধান, একটি কথোপকথনের বই, এবং আর একখানি গদ্য গ্রন্থ সংকলন করিলেন। যে বৎসর কলেজের কার্য্যারম্ভ হইল সেই বৎসরেই কেরীর ব্যাকরণ ও কথোপকথন, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র এবং গোলোক শর্ম্মার হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে পোর্ত্তুগীস পাদ্রীরা যে সকল গদ্য গ্রন্থ বাহির করিয়াছিলেন সে সবই ইংরেজী অর্থাৎ রোমান হরফে মুদ্রিত। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে তিনখানি আইনের অনুবাদ-গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল এবং ১৮০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যেটুকু অনুবাদ শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা। রামরাম বসুর অপর গদ্য গ্রন্থ লিপিমালা বাহির হয় পর বৎসরে, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর তোতা ইতিহাস, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ-কৃষ্ণচন্দ্র-রায়স্য চরিত্রম্‌, এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি কেরী সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়, তখন এই অঞ্চল উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় কয়েকখানি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে রাজাবলি এবং প্রবোধচন্দ্রিকা। দেশী লোকের লেখা প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতেছে রাজাবলি। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অনেক কাল পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, প্রবোধচন্দ্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।

কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রচারকগণ নিজেরা লিখিয়া অথবা পণ্ডিতদিগকে দিয়া লেখাইয়া লইয়া প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত লোকেরাও অনতিবিলম্বে যোগ দিলেন; ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। রাজা রামমোহন রায় পণ্ডিতদিগের সহিত বিতর্কে যোগ দিয়া বেদান্তদর্শন এবং শাস্ত্রবিচার-বিষয়ে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। রামমোহন কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ভগবদ্-গীতারও পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পাঠ্য-পুস্তকের বাহিরে বাঙ্গালা গদ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার রামমোহনের বিশেষ কৃতিত্ব। রামমোহন রায় আমাদের দেশে আধুনিকতার অগ্রদূত ছিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব নানাভাবে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা, বাঙ্গালা ভাষার বিস্তার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পোষকতা-কল্পে অসামান্য সহায়তা করিয়াছিলেন। বিরাট্ সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুমের সঙ্কলন রাজার অক্ষয়কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিবে।

এই যুগের গদ্য-গ্রন্থ প্রায় সবই হয় সংস্কৃতের, নয় ফারসীর, নতুবা ইংরেজীর অনুবাদ। দুইএকটিমাত্র রচনা মৌলিক। এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্যের রূপ ছিল নিতান্তই অমার্জিত। দুই একজন লেখকের রচনার অংশ-বিশেষ ছাড়া আর কোন লেখার কিছুমাত্র সাহিত্যিক মূল্য নাই। এগুলির মূল্য এইটুকু যে ইহার মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গির অপরিণত রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে।

৩৬

প্রাচীন নাট-গীত ও যাত্রা

প্রাচীন কালে বাঙ্গালাদেশে যাত্রার ধরণে নাট-গীতের অভিনয় হইত। দুই তিন বা তদূর্দ্ধ পাত্রপাত্রী গীতের সাহায্যে অনুরূপ কথোপকথন এবং অঙ্গভঙ্গি

করিয়া পৌরাণিক ঘটনাবিশেষের অভিনয় করিত। যে নট বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার ভূমিকা লইত—সেকালের ভাষায় "কাচ কাচিত"—তাহারই উপর হাস্য-রসসৃষ্টির ভার ছিল। এইরূপ অভিনয়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে রুক্মিণীহরণ অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য রুক্মিণী সাজিয়াছিলেন, গদাধর রাধা, শ্রীবাস নারদ, নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ বড়াই, হরিদাস কোটাল, শ্রীরাম ও গঙ্গাদাস নারদের দুই শিষ্য, এবং অদ্বৈত বিদূষক। প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনা।

> প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস,
> মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস,
> মহাপাগ শিরে শোভে ধটি পরিধান,
> দেখিয়া সভার হৈল বিস্ময়-গেয়ান।

মুরারি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া হরিদাস দুই হাতে গোঁফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে রঙ্গস্থল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর নারদবেশে প্রবেশ করিলেন শ্রীবাস—

> মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ি ফোঁটা সর্ব গায়,
> বীণা-কান্ধে কুশ-হস্তে চারি দিকে চায়।

তাঁহার পিছনে পিছনে শ্রীরাম পণ্ডিত শিষ্য সাজিয়া বগলে আসন ও হাতে কমণ্ডলু লইয়া আসিলেন এবং নারদকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলেন। তাহার পর অদ্বৈতের সহিত নারদের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এক প্রহর এইভাবে কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে রাধাবেশে গদাধরের প্রবেশ। সঙ্গে সখী সুপ্রভা এবং বড়াই।

> হাথে নড়ি কাঁখে ডালি নেত পরিধান,
> ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান।

তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিদাস হাঁক দিয়া বলিলেন, তোমরা কে? ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, আমরা মথুরা যাইতেছি। রাধা ও সখীকে শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা দুই কাহার বনিতা?" ব্রহ্মানন্দ উত্তর করিলেন, একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? শ্রীবাস বলিলেন, জানা উচিত বলিয়া। উত্তরে "হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়।" গঙ্গাদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোথায় থাকিবে? ব্রহ্মানন্দ বলিল, "তুমি স্থানখানি দিবা।" গঙ্গাদাস বলিলেন, কাজ নাই, তোমরা সরিয়া পড়। অদ্বৈত বলিলেন, "এত বিচারে কি কাজ? মাতৃসম পরনারী কেন দেহ লাজ?" তাহার পর বড়াইকে বলিলেন,

আমার প্রভু বড় নাচ-গান ভালবাসেন, তোমরা যদি এখানে নাচ দেখাইতে পার তবে প্রচুর ধন পাইবে। তখন গদাধর নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর,
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।

তাহার পর রুক্মিণীর বেশে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ। তাঁহার

আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে,
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেমরসে ভাসে।

শ্রীচৈতন্যের বেশ এমন অপূর্ব মানাইয়াছিল যে নিত্যানন্দের পিছনে পিছনে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন তখন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

অন্যের কি দায় আই না পারে চিনিতে,
আই বোলে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে।

রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া

জগৎজননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর,
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।

নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভুর ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর হইতে লাগিল, কখনো রুক্মিণীর ভাব

কখনো বোলয়ে বিপ্র কৃষ্ণ কি আইলা,
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা।

কখনো বা দেবীর ভাব

ভাবাবেশে যখন বা অট্ট-অট্ট হাসে,
মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝিয়ে প্রকাশে।

আবার কখনো রাধার ভাব

ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে,
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে।

শেষে তাঁহার মহাশক্তির আবেশ হইল। ফলে অভিনয় শেষ অবধি গড়াইল না। অসম্পূর্ণ হইলেও এই চিত্রটুকুর মধ্যে সেকালের নাট-গীতের অকৃত্রিম নিদর্শন অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ নাট-গীতের এক রূপান্তর পাই ঝুমুর গানে। ঝুমুর ছিল যাত্রার এক পূর্বরূপ। ইহাতে দুইটিমাত্র পাত্রপাত্রীর মধ্যে দ্বৈত গান (‘লগনী’) ও নাচ চলিত। ঝুমুর পালায় দুইয়ের বেশী ভূমিকা থাকিলেও কোন পদের বা গানের মধ্যে দুইজনের বেশীর সংলাপ থাকিত না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ঝুমুর-নাটগীতের প্রাচীনতম নিদর্শন।

পাঁচালীর সঙ্গে প্রাচীন নাট-গীত, ঝুমুর ও যাত্রার প্রধান পার্থক্য এই যে পাঁচালীর গানে গায়ক চামর ঢুলাইত, এবং অঙ্গভঙ্গি করিত বটে, কিন্তু তাহা ঠিক নাট-অভিনয় নয়, কারণ পাঁচালীতে দ্বিতীয় অভিনেতা থাকিত না। কথকতার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

যাত্রা আমাদের দেশে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে। 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবপূজার উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা, শোভাযাত্রা অথবা নাট-গীত। মহাভারতে এবং অশোকের অনুশাসনে এই অর্থে 'সমাজ' শব্দের প্রয়োগ আছে। যাত্রা-গান যে শুধু পূজা উপলক্ষ্যে হইত তাহা নহে, সাধারণ উৎসবেও যাত্রার অনুষ্ঠান হইত। সেকালে যাত্রার কোন বাঁধা পালা থাকিত না। পাত্রপাত্রীরা নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত উপস্থিত রকম কথোপকথন, শ্লোকাদি-পাঠ ও গান করিত। অনেক সময়ে আবার শুধু গানগুলি নির্দ্দিষ্ট থাকিত, কথোপকথন নটেরা উপস্থিতমত চালাইয়া দিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত এইরূপ বাঁধা-গানের কয়েকটি পালা বাঙ্গালাদেশ হইতে নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেখানে অবশ্য পালাগুলি কতকটা নেপালী রূপ পাইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালাতে ও ব্রজবুলিতে লেখা গানগুলি অনেকটা অক্ষত রহিয়া গিয়াছে। নেপালে প্রাপ্ত বাঙ্গালা যাত্রার পালার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার রচনা অথবা সঙ্কলনকাল হইতেছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী এই পালাটির বিষয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত একটি সংস্কৃতশ্লোকাকীর্ণ প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রাপালার নিতান্ত অসম্পূর্ণ আদর্শ পাওয়া যাইতেছে ভারতচন্দ্রের চণ্ডী নাটকে। রচনা আরম্ভ করিয়াই কবি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া নাটকটির সম্পূর্ণ রূপ আমরা পাই নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রার মধ্যে পাঁচালীর প্রভাব আসিয়া পড়ে। এই সময়ে যাত্রা বলিতে প্রধানতঃ কৃষ্ণ-যাত্রা বুঝাইলেও চণ্ডী-যাত্রা এবং চৈতন্য-যাত্রা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই। কৃষ্ণ-যাত্রাতে নূতন ঝুমুর-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল ঝাড়িখণ্ড অঞ্চলে। পাঁচালীর প্রভাবে যাত্রায় কৌতুকরসের প্রাবল্য দেখা দিল। পূর্বে অবশ্য বড়াই বা অপর বৃদ্ধা ভূমিকার দ্বারা এই রসের কিছু যোগান ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রার দুইটি পাত্র আনিয়া কৌতুকরসের সঞ্চার করা হইল—নারদমুনি এবং তাঁহার চেলা বাসদেব অর্থাৎ ব্যাসদেব। নারদ ও বাসদেবের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ কৌতুকরস পূর্বেকার বড়াই, কর্পূরধবল অথবা বৃদ্ধ বেশ্যার চরিত্রের মত তীব্র অথবা গ্রাম্যতা-ঘেঁষা হয় নাই; ইহাতে অল্প ভাঁড়ামির ভিতরে প্রচুর ভক্তিরসের পুর থাকাতে সাধারণ শ্রোতার কাছে অধিকতর আদরণীয় হইয়াছিল।

কৃষ্ণ-যাত্রার মধ্যে কালিয়দমন পালা অধিক জনপ্রিয় ছিল বলিয়া কৃষ্ণ-যাত্রার নামান্তর হয় কালিয়দমন-যাত্রা বা কালিয়দমন। পাঁচালীর ও কীর্ত্তনের প্রভাবমণ্ডিত কৃষ্ণ-যাত্রা—কালিয়দমন ও রাস—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতে থাকে। শ্রীদাম ও সুবল দুই ভাই এবং পরমানন্দ অধিকারী এই সময়ে কৃষ্ণ-যাত্রার অভিনয়ে অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরেই বাঁধা যাত্রা-পালার সৃষ্টি হয়। বাঁধা যাত্রা-পালায় যাঁহারা প্রথম খ্যাতি লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইতেছেন গোবিন্দ অধিকারী এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

ইংরেজ বণিক্-রাজশক্তির রাজধানী কলিকাতা অঞ্চলে নবলব্ধধনদৃপ্ত ভদ্র বাঙ্গালী-সমাজের রুচি বিকৃত হইয়া আসিয়াছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলিকাতায় বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার প্রবর্ত্তন এবং প্রচুর সমাদর হইতে বিলম্ব হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষা ভদ্রসমাজে কতকটা প্রসার না পাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যা-সুন্দর-যাত্রার রেওয়াজ কমিতে শুরু করে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিক্ষিত লোকের রুচিপরিবর্ত্তনের এবং বিলাতী আদর্শে থিয়েটার ও নাটক-অভিনয়-প্রবর্ত্তনের ফলে প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী ও কীর্ত্তন-অনুপ্রাণিত যাত্রা-গান কলিকাতা অঞ্চলে দ্রুত পসার হারাইতে থাকে। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যপাদে তিনকড়ি বিশ্বাস, মনোমোহন বসু, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুকণ্ঠ গায়ক ও বাঁধনদারের প্রচেষ্টায় ইংরেজী আদর্শের নাটকের সঙ্গে কথকতার ধরণের বক্তৃতা এবং প্রাচীন যাত্রা ও পাঁচালী পদ্ধতির ভক্তিরসপূর্ণ গান যোগ করিয়া নূতন যাত্রাপদ্ধতির সৃষ্টি হইল। কিন্তু অধুনা এই যাত্রাপদ্ধতিও থিয়েটারী নাটকের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে পড়িয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৩৭

আর্য্যা, তর্জা, খেউড়, কবি-গান, নেটো, পাঁচালী ও হাফ্-আখড়াই

হেঁয়ালী-ছড়ার সাহায্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়া লোকরঞ্জনের প্রচেষ্টা বাঙ্গালা-দেশে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ভাষার প্রচলন-সময়ে এই ধরণের ছড়া "আর্য্যা" ছন্দে লেখা হইত। পরে শুধু নামটি চলিয়া আসিয়া আরবী "তর্জা"-র সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, "আর্য্যা-তর্জা পঢ়ে সভে বৈষ্ণব দেখিয়া।" এই জাতীয় 'তর্জা' বা ছড়ার নিদর্শন ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম মিলিতেছে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ছড়া, গান বা আবৃত্তি করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া

ছিল সেকালের তর্জা। শিবের চড়ক-পূজায় এবং ধর্ম্মঠাকুরের গাজনে এইরূপ তর্জায় মূল-সন্ন্যাসী ও "ভক্তিয়া"-দিগের মধ্যে কথা-কাটাকাটি এখনও চলিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীতেও এই ধরণের তর্জা চলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের শেষদশায় অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে একটি তর্জা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহা পড়িয়া শ্রীচৈতন্য তাহার ভাব অনুধাবন করিয়া বলিয়াছিলেন,

"মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জাতে সমর্থ,
আমিহ না জানি তাঁহার তর্জার অর্থ।"

ধর্ম্মপূজাতেও তর্জার স্থান ছিল।

"আর্য্যা" নামটি চলিয়া আসিয়াছে গণিতের ছড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ বহু আর্য্যা রচিত হইয়াছিল। শুভঙ্কর দাসের নামিত কতকগুলি আর্য্যার ভাষা দেখিলে খুব পুরানো বলিয়া মনে হয়। যেমন

পণ শশী পঞ্চম শর গজ বাণ,
নবহু নবগ্রহ রস বসু মান।
অষ্টাদশ পণ বুড়ুভহু দিজ্জে,
আজু বিষম খড়ি দিবহু কিজ্জে।

অধ্যাত্ম (কীর্ত্তন গান ব্যতিরেকে) ও প্রণয়-বিষয়ক বৈঠকী গানের বিশেষ আদর হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ে শান্তিপুর অঞ্চলে গ্রাম্যভাষায় রচিত ও টপ্পার সুরে গীত একধরণের নিতান্ত আদিরসাত্মক কাহিনীমূলক গানের প্রচলন হয়। ইহাকে বলিত "খেঁড়ু" বা খেউড়। তর্জার মত খেউড়েও প্রশ্নোত্তর চলিত। ভারতচন্দ্রের সময়ে নদীয়া অঞ্চলে এই গানের প্রসার হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ইহা চুঁচুড়ায় ও তথা হইতে কলিকাতায় আমদানি হয়। কলিকাতায় মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব ও তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ সঙ্গীতকলার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। নবকৃষ্ণের সভাসদ্ কুলুইচন্দ্র সেন খেউড় গানকে শুদ্ধতর করিয়া এবং তাহাতে নানাবিধ রাগরাগিণী লাগাইয়া ও বহুবিধ যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া ইহাকে "আখড়াই" অর্থাৎ আখড়ার উপযোগী ওস্তাদি গানে পরিণত করেন। সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা এবং কুলুইচন্দ্রের নিকট-আত্মীয় রামনিধি গুপ্ত (১১৪৮-১২৪৫)—যিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন—এই কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত নিধুবাবুর প্রণয়গীতিগুলি তখনকার দিনের লোকের রুচিকে উন্নততর করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আখড়াই-গান কষ্টসাধ্য; সুরের ও রাগের পারিপাট্য ও বাদ্যের বাহুল্য ছিল ইহার অপরিহার্য্য অঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীদাম দাস, রামপ্রসাদ ঠাকুর, নসীরাম সেকরা প্রভৃতি পেশাদার গায়ক আখড়াই-গানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

আখড়াই-গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাদ-প্রতিবাদ ছিল না। যাহার দল গীতবাদ্যে উৎকর্ষ দেখাইত তাহারই জয়লাভ ঘটিত।

কষ্টসাধ্য আখড়াই-গান ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে পূর্ব্বাপরপ্রচলিত প্রতিযোগিতামূলক কবি-গানের এবং পাঁচালীর পসার হইতে লাগিল। প্রাচীনতর কবি-গানে প্রথম দলের গায়ক আসরে আসিয়া প্রথমে গুরুবন্দনা ও দেবদেবীবন্দনা গাহিত। দ্বিতীয় দলের গায়ক ইহার উত্তরে গুরুবন্দনা ও দেবদেবীবন্দনা গাহিলে প্রথম গায়ক সখী-সংবাদ গাহিত। দ্বিতীয় গায়ক তাহার উত্তর দিত। এইরূপে তাহার পর বিরহ এবং সর্বশেষ খেউড় গাহিয়া শেষ হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবি-গান ও তর্জার মিলনে নূতন ধরণের কবি-গানের সৃষ্টি হইল; ইহার নাম "দাঁড়া কবি"—অর্থাৎ বাঁধা বিষয়ের গান বা ছড়া লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাদ-প্রতিবাদ-মূলক সঙ্গীত। আখড়াই-গানের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ প্রণয়ঘটিত। দাঁড়া কবির বিষয়বস্তু পৌরাণিক কাহিনীমূলক অথবা প্রণয়ঘটিত কিংবা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক—সব কিছুই হইতে পারিত। কবিগান রচনা করিয়া অথবা গাহিয়া যাঁহারা তখনকার কালে নাম করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন হরেকৃষ্ণ দীঘড়ী, রাম বসু, আণ্টুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা ইত্যাদি। ইঁহাদের ধারার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন লালু-নন্দলাল নামে প্রসিদ্ধ দুই ভাই, লালচন্দ্র ও নন্দলাল। ইঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কবি-গানের দ্রুত অবনতি হয়—আধুনিক কালে পল্লী-অঞ্চলে যে কবি-গান প্রচলিত আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত ও গতানুগতিক।

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে যে নেটো গান প্রচলিত আছে তাহা সুপ্রাচীন "নাটুয়া" নাচ-গান-অভিনয়ের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ হইলেও নিম্নতর-সমাজের রুচিবিকৃতির ফলে ভদ্র-সমাজের প্রায় অশ্রাব্য হইয়া পড়িয়াছে।

পাঁচালী-গান খুব প্রাচীন। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল কাব্যই পাঁচালীর ঢঙে—অর্থাৎ মন্দিরা-চামর-সংযোগে—গাওয়া হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচন-দাসের চৈতন্যমঙ্গল, কাশীরামের পাণ্ডববিজয়, রূপরাম প্রভৃতি কবির ধর্ম্মমঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সকল কাব্য ছিল পাঁচালী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাঁচালীর রূপান্তর হইতে শুরু হইয়াছিল। ভক্তিরসের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসের প্রয়োগ হইতে লাগিল, এবং সেজন্য নূতন করিয়া পালা রচিত হইতে লাগিল। শুধু পৌরাণিক কাহিনী নয়, আধুনিক কাহিনীও ইহাতে গৃহীত হইতে লাগিল।

আধুনিক পদ্ধতির পাঁচালী-রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন দাশরথি রায় (১২১২-১২৬৪)। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে বাঁদমুড়া গ্রামে। মাতুলালয় ছিল ঐ জেলায় কালনার নিকটে পীলা গ্রামে। সেইখানেই কবি বাস করিতেন। কবির পিতার নাম দেবীপ্রসাদ। ইঁহারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। দাশরথির গানের অনুপ্রাস-ঝঙ্কার ও সুরমাধুর্য্য সাধারণ শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। পল্লীবাসীরা এখনও দাশরথির গানে মুগ্ধ হয়।

আখড়াই-গান নষ্টপ্রায় হইলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া সহজসাধ্য করিয়া নূতন এক ঢঙের সৃষ্টি করিলেন বৃদ্ধ নিধুবাবুর সাহায্যে তাঁহার এক শিষ্য মোহনচাঁদ বসু। আখড়াইএর তুলনায় এই ঢঙ অধিকতর সহজসাধ্য ও বাহুল্যবর্জিত বলিয়া ইহার নাম হইল "হাফ্-আখড়াই"। হাফ্-আখড়াই গানে সুরের ও রাগের পারিপাট্য কম ছিল। ইহাতে হালকা তান ব্যবহৃত হইত, আর যন্ত্রের ব্যবহারও ছিল কম। আখড়াইয়ে প্রায় বিশ বাইশ রকম যন্ত্র বাজানো হইত। হাফ্-আখড়াইয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর ও বাদ-প্রতিবাদ কখনো কখনো থাকিত, তবে কবি-গানের মত নহে। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই হাফ্-আখড়াই গান লুপ্ত হইয়া যায়।

৩৮

সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও প্রভাব : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের এক-প্রকার অনুশীলন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ভাষার উন্নতি বা পরিপুষ্টির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ব্যক্তির জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তক বলিয়া জনসমাজে এই গদ্য গ্রন্থগুলির প্রসার হওয়া তো দূরের কথা, সংবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। যাহারা সংবাদ পাইল তাহারাও "খ্রীষ্টানী ব্যাপার" বলিয়া নাক সিঁটকাইয়া জাতি বাঁচাইয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। কিন্তু এই খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দ্বারাই শীঘ্র এমন এক নূতনত্বের প্রবর্ত্তন হইল যাহার জন্য পঠনক্ষম জনসাধারণ গদ্য-সাহিত্যের প্রতি আর উদাসীন ও বীতরাগ হইয়া থাকিতে পারিল না।

কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্প্রদায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন। প্রথমে এপ্রিল মাসে দিগ্‌দর্শন নামে মাসিক পত্র বাহির হইল, কিন্তু এটি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর ২৩শে মে তারিখে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ প্রকাশিত হইল। পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন জন মার্শম্যান নামেমাত্র, দেশীয়

পণ্ডিতেরাই সমাচারদর্পণের প্রকৃত সম্পাদনা করিতেন। সমাচারদর্পণ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (সম্ভবতঃ অল্প কিছু দিন পূর্বে) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য বাঙ্গাল গেজেটি অর্থাৎ বেঙ্গল গেজেট বাহির করেন। ইহাই বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র।

সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্বপ্রথম গদ্য-সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে শিখে। পূর্ববর্তী সাহিত্য সবই পদ্যে রচিত এবং তাহার বিষয়ও ধর্মসম্বন্ধীয় অথবা সর্বজনবিদিত কাহিনীঘটিত। নূতন তথ্য বা নূতন গল্পের রস সে সাহিত্যে পাইবার কোন উপায় ছিল না। এখন সেই নূতন খবরের বা গল্পের রস বাঙ্গালী পাঠক পাইল সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়া। ফলে নূতন নূতন বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের চাহিদা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল, এবং তাহার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদিগের রচিত পাঠ্যপুস্তকে নহে, ইহার ইতিহাস খুঁজিতে হইবে প্রাচীনতম বাঙ্গালা সাময়িকপত্রিকাগুলির মধ্যে।

সমাচারদর্পণের জনপ্রিয়তার ফলে অচিরে যে সকল সাময়িক ও সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি হইল সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে সংবাদকৌমুদী (১৮২১) এবং সমাচারচন্দ্রিকা (১৮২২)। রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৫৮) অনেকগুলি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। একদিক্ দিয়া ভবানীচরণ যেমন তাঁহার হাস্যরসপূর্ণ ব্যঙ্গরচনার দ্বারা হিন্দু সমাজের ধনী ব্যক্তিদিগের কদাচারকে ধিকৃত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অপরদিকে তেমনি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া এবং রামমোহন রায় প্রমুখ প্রতিপক্ষের সহিত শাস্ত্রবিচারে উদ্যুক্ত হইয়া রক্ষণশীল সমাজের পোষকতা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

ভবানীচরণ পদ্য ও গদ্য উভয় বন্ধেই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই ধারা—প্রাচীন পদ্যবন্ধ এবং আধুনিক গদ্যবন্ধ—উভয়েরই সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে কৌতুকরচনার ইতিহাসে ভবানীচরণের নববাবুবিলাস উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিবে।

ভবানীচরণ দুই পথে চলিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আরও অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই যুগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিলেন। ইনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিক। ১২১৮ সালে (১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে নৈহাটির নিকটে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়া বেশী দিন ইঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। নিজের চেষ্টাতেই ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে এবং ইংরেজীও কিছু কিছু লিখিয়া-

ছিলেন। ১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপ্রভাকর নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে ইনি আরও কয়েকটি সাময়িকপত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সেগুলির কোনটিই সংবাদপ্রভাকরের মত দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১২৬৫ সালে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) মাঘ মাসে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের লেখা ছাড়া তাঁহার ছাত্রস্থানীয় অল্পবয়স্ক লেখকদিগের রচনা প্রকাশিত হইত। পরবর্ত্তী কালের অনেক বিশিষ্ট কবি ও গ্রন্থকার সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় সাহিত্যসৃষ্টি-কার্য্যে শিক্ষানবীশি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ইঁহাদের সাহিত্যগুরু ছিলেন, একথা ইঁহারা সগৌরবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার প্রবর্ত্তনে (১৮৪৩) সাময়িক-পত্রের প্রথম পর্ব শেষ হইল। তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যের দুইজন প্রধান লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন—অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভাষাসৌষম্যের ও ভাবসম্পদের জন্য পত্রিকাটি সেকালের কলেজে পাঠ্য নির্ধারিত হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ

৩৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া যে গদ্য রীতির প্রবর্ত্তন করিলেন তাহা মোটামুটি একই-ভাবে পরবর্ত্তী কালের ইংরেজ ও বাঙ্গালী পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের লেখার ভিতর দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি চলিয়া আসিয়াছিল। একে এই আদিম গদ্যে শ্রী বা ছন্দ বড় কিছু ছিল না, তাহার উপর চলিত ভাষার শব্দের সঙ্গে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের উৎকট প্রয়োগের আতিশয্য, সর্বোপরি সংস্কৃত কিংবা ইংরেজী ছাঁচে বাক্যগঠন-প্রণালী। প্রথম যুগে পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের একান্ত অনুকরণে বাক্যবিন্যাস করিতেন; তাহা যদিও বা বোঝা যাইত, কিন্তু অধিকাংশ—বিশেষ করিয়া পরবর্ত্তী কালের এই শ্রেণীর প্রায় সব লেখক—ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিতেন বলিয়া তাঁহারা

বাক্য-রচনায় হুবহু ইংরেজী রীতি অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, এই হেতু এই গদ্যভঙ্গি ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট বিজাতীয় বোধ হইত। বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদের মধ্যে এই রীতি এখনও কতকটা বজায় আছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দিগন্তরাল হইতে এই রীতি বহুকাল হইল অন্তর্হিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান লেখক ছিলেন মনীষী পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)। বিদ্যাকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থমালায় ইনি বহু ইংরেজী গ্রন্থের—কিছু কিছু সংস্কৃতেরও—অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাকল্পদ্রুমের প্রথম পাঁচ খণ্ড বাহির হয়।

সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া সাধারণ লোকের বোধগম্য গদ্য প্রবর্ত্তিত হইল বটে, তবে এই রীতির অনেক দোষ ছিল। চলিত বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগের কোন সুনির্দ্দিষ্ট রীতি ছিল না; বাক্যের বহর অযথা দীর্ঘ হইত, তাহাতে বাক্যসমাপ্তির সময়ে বাক্যের আরম্ভের কথা মনে থাকিত না; বাক্যে ছন্দ বা তাল না থাকায় শ্রুতিমাধুর্য্য একেবারেই ছিল না; বাক্য-রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিই প্রধানভাবে অবলম্বন করা হইত; এবং ছেদচিহ্নের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকায় অর্থগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটিত। এই সকল দোষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যকে নিতান্ত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। এই অকেজো শ্রীহীন গদ্যভঙ্গির সাহায্যে উচ্চ-শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনামাত্র ছিল না।

বাঙ্গালা গদ্যের এই সকল দোষ দূরীভূত করিয়া ও ইহার পঙ্গুত্ব মোচন করিয়া যিনি ইহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিয়া অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন তিনি আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাতঃ-স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পূর্ব্বে হুগলী জেলার অধুনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে ১২২৭ সালে (অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) ১২ই আশ্বিন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে ১২৯৮ সালে (অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) ১৩ই শ্রাবণ তারিখে ইঁহার তিরোধান ঘটে। এই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী সকলের সুপরিচিত।

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরীতে ঢুকিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ বাসুদেবচরিত কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের খ্রীষ্টানী মনোভাবের অনুকূল না হওয়ায় প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার দ্বিতীয় রচনা বেতাল-পঞ্চবিংশতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল—আমরা যে গদ্যে এখন লিখিয়া থাকি সেই গদ্য ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার পরে বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ বা বোধোদয় (১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী

(১৮৫৬), মহাভারতের উপক্রমণিকা পর্ব (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩, ১৮৬৮) এবং ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) এই কয়খানি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই বইগুলি সবই হয় হিন্দী, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বটে, কিন্তু সেগুলি বিষয়বস্তু ছাড়া সর্বাংশে নূতন সৃষ্টি, অনুবাদ বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে। অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা মাত্র। এ ধারণা নিতান্তই ভুল। ইঁহার স্বাধীন রচনা হইতেছে সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দুই খণ্ড), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দুই খণ্ড), বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত), প্রভাবতীসম্ভাষণ— এই লেখাগুলি সাহিত্য হিসাবে উপাদেয়। শুধু যে সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর ছাঁদে লিখিতেই ইনি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহাও নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকখানি বিতণ্ডামূলক বই বেনামীতে লিখিয়াছিলেন, যেমন ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি। কথ্যভাষায় হালকা ছাঁদে লেখা এই বইগুলির রচনাভঙ্গিও নিরতিশয় উপভোগ্য। এই সব বই ছাড়া তিনি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী এই দুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণের বই বাঙ্গালাতে লিখিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহজে সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। বহু সংস্কৃত-গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর—এ কথাটা একেবারেই অত্যুক্তি নয়। পূর্ববর্তী বাঙ্গালা গদ্যের শ্লথ কঙ্কালে মেদ-মাংস-রক্ত-সংযোজন এবং প্রাণ-সঞ্চারণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইহাকে সাধারণ ব্যবহার্য্য জীবন্ত ভাষা-রূপে দাঁড় করাইয়া দেন। পদ্যের যেমন ছন্দ ও যতি আছে, গদ্যেরও তেমনি একটা তাল বা রীদ্‌ম্ (rhythm) আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্যের স্বাভাবিক তাল লক্ষ্য করেন এবং তদনুযায়ী বাক্য গঠন করিয়া সুললিত গদ্যভঙ্গির প্রবর্ত্তন করেন। পূর্বেকার গদ্যে হয় শুদ্ধ দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত অথবা চলিত ইতর শব্দের অযথা বাহুল্য নতুবা উভয়ের শ্রীহীন সমপ্রয়োগ থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দুইজাতীয় শব্দের প্রয়োগের মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন, যাহাতে ভাষার ওজস্বিতা নষ্ট হইল না অথচ রচনায় লালিত্য আসিয়া গেল। মোটামুটি বলিতে গেলে বাঙ্গালা গদ্যের প্রবর্ত্তনে ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব, ইহারই অভাবে ১৮৪৭ সালের পূর্বেকার বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বা সাধারণ কাজকর্ম্মের ভাষা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালা গদ্যের প্রবর্ত্তনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। নবদ্বীপের নিকটে বর্দ্ধমান জেলায় চুপী

নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর এবং মাতার নাম দয়াময়ী। বাল্যকালেই অক্ষয়কুমার কলিকাতায় আসেন এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। অবস্থাগতিকে তাঁহাকে স্কুল ছাড়িতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় গৃহে অধ্যয়ন করিয়া ইনি গণিত, ভূগোল এবং পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ব্রাহ্ম-সমাজ কর্ত্তৃক ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া পত্রিকাটি সম্পাদন করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধ একত্র করিয়া তিনি পরে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করিতেন। ইহার প্রথম পুস্তক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাব্দে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে)। তাহার পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ, চারুপাঠ (তিন ভাগ), ধর্ম্মনীতি, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (দুই ভাগ) ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা ইংরেজী হইতে সংকলিত। তবে ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় গ্রন্থে ইঁহার নিজস্ব কথা অনেক আছে। অক্ষয়-কুমারের রচনাভঙ্গি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার তুলনায় যথেষ্ট নীরস ও লালিত্যহীন হইলেও বৈজ্ঞানিক বিষয়-বর্ণনার পক্ষে অনুপযোগী নহে। সাহিত্যিক হিসাবে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁহার স্থান সবিশেষ উর্দ্ধে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পন্থা অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রাজনারায়ণ বসু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) পিতা জন্মেজয় মিত্র অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুরও ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন। এইরূপ সাহিত্যিক বংশে রাজেন্দ্র-লালের জন্ম হইয়াছিল। ইংরেজী স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া রাজেন্দ্রলাল ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় ইঁহার উত্তরপত্র হারাইয়া যাওয়ায় ইনি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে থাকিয়া তিনি বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস-বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়া দেশ-বিদেশে প্রচুর সম্মান লাভ

করেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চায় অবহেলা করেন নাই। কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ইনি দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা দুইটি সেকালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

১২৫৮ সালের অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে বিবিধার্থসংগ্রহ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থসংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান, ইতিহাস, রহস্যকাহিনী ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সাধারণ লোকের পাঠযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। কয়েক বৎসর অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবার পর বিবিধার্থ-সংগ্রহ ১৭৮১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উঠিয়া যায়। পর বৎসর হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদকতায় ইহার নব পর্য্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাও বেশী দিন টিকে নাই। ইহার তিন চারি বৎসর পরে ১৭৮৫ শকাব্দে রাজেন্দ্রলাল রহস্যসন্দর্ভ নামক পত্রিকা বাহির করেন। রহস্য-সন্দর্ভের ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী (১৮৫৪) সে যুগের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা বাণভট্টের সংস্কৃত গদ্য-কাব্য কাদম্বরী অবলম্বনে রচিত। তারাশঙ্করের অপর পুস্তক রাসেলাসের মূল হইতেছে জন্‌সন্‌-এর রচিত ইংরেজী আখ্যায়িকা-খানি।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের মত রামগতি ন্যায়রত্নও (১৮৩১-১৮৯৪) সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক এবং রোমাবতী ও ইলছোবা নামক দুইখানি আখ্যায়িকা রচনা করেন। ইঁহার রচিত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব নামক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের অপর এক সুবিখ্যাত ছাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬) সেকালের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। ইঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ পত্রিকা তখনকার দিনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হইলেও তিনি স্বধর্ম্মে ও স্বসমাজের আচারব্যবহারে আস্থা হারান নাই। সেই অনাচার ও অবিশ্বাসের যুগেও যে তিনি আচারনিষ্ঠায় অবিচলিত থাকিতে পারিয়াছিলেন তাহা কম দৃঢ়চিত্ততার পরিচায়ক নহে। ১৮৬৮ সাল হইতে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ পত্রিকার ভার ভূদেবের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পুষ্পাঞ্জলি, আচার-প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি পুস্তকের মধ্য দিয়া দেশ-হিতৈষণা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্রগঠন ইত্যাদির শিক্ষা অতি সুন্দর ও সহজ ভাবে

প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থগুলির আদর চিরকাল থাকিবে। স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূদেবের অপূর্ব সৃষ্টি। ভূদেবের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৬) পুস্তকে দুইটি গল্প আছে। শেষেরটির নাম অঙ্গুরীয়-বিনিময়। এই গল্পটির কাহিনী কতকটা ইতিহাস হইতে লওয়া হইলেও গল্পটিকে মৌলিক রচনার পর্য্যায়ে ফেলিতে হয়। বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইহাই আদি। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে অঙ্গুরীয়-বিনিময় গল্পের প্রভাব ক্ষীণ হইলেও লক্ষণীয়।

ভূদেব এবং মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) বহু প্রবন্ধ রচনা করিলেও সাহিত্যিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু ইঁহার ক্ষুদ্র পুস্তক সেকাল আর একাল (১৮৭৪-৭৫) বাঙ্গালা ভাষার একটি উপাদেয় বই। বইটির ভাষা লঘু এবং মনোজ্ঞ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুই কবির সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ হৃদয়সম্পর্ক ছিল। মধুসূদন দত্ত ছিলেন রাজনারায়ণের সহপাঠী ও বাল্যসুহৃদ্। রাজনারায়ণের সমালোচনার দ্বারা মধুসূদনের কাব্যকলা উপকৃত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন রাজনারায়ণের বন্ধু আর রাজনারায়ণ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের প্রশংসা বালক কবিকে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ রাজনারায়ণের প্রাণপ্রাচুর্য্য এবং তাহা হইতে উদ্ভূত সহজ রসবোধ ছিল অসামান্য। ইঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (১৮৪০ ? -১৯৩২) সেকালের একজন বিখ্যাত বিদ্বান্ মনীষী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ও আইনবেত্তা বলিয়া ইঁহার খুব খ্যাতি ছিল। বিদেশী ভাষা হইতে মনোজ্ঞ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইনি দুই একটি বই লিখিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত এই কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা উপন্যাসের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ১৭৭৯ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৮৫৭ কিংবা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। ইনি 'বিচারক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ইঁহার মৌলিক রচনা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইত। ফারসী হইতে অনূদিত পল-বর্জিনিয়া কাহিনী অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাহিনী বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টা বিশেষ মূল্যবান্। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর (১৮২০-১৮৭৯) রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত

গ্রন্থের মূল এবং গদ্যে ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া এবং হাতেম তায়ি, চাহারদরবেশ, সেকন্দরনামা এবং মস্নবী প্রভৃতি ফারসী এবং উর্দু আখ্যায়িকা বাঙ্গালা গদ্যে ও পদ্যে অনুবাদ করাইয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। মহাতাবচাঁদ কবি ও পণ্ডিতের বিশেষ পোষকতা করিতেন। ইঁহার রচিত অনেক গুলি ভক্তি-বিষয়ক গান একসময়ে সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজাধিরাজ আফতাবচাঁদ বাহাদুরও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন।

৪০

কাব্যে প্রাচীন পদ্ধতি ও নবীন পদ্ধতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই ধারা সমানে চলিয়া আসিতেছিল। এই দুই ধারা হইতেছে বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্য, এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রীতির লৌকিককাহিনী-কাব্য। ইহার উপর বৈঠকী সঙ্গীত ও তর্জা এবং কবি-গান এই সব ধরণের রচনার সমাদর যথেষ্ট ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্যপদ্ধতির কবিদিগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী (জন্ম ১১৯৩ সাল)। ইঁহার রচিত তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে—রামরসায়নে রামায়ণকাহিনী, গীতমালায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতি, এবং রাধামাধবোদয়ে বিবিধ ছন্দে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। রামরসায়ন সুললিত কাব্য; ইহা প্রচলিত বাঙ্গালা রামায়ণ কাব্যের সকলগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এইটিই কবির প্রথম রচনা বলিয়া অনুমান হয়। রাধামাধবোদয় ১৭৭১ শকাব্দে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) সম্পূর্ণ হইয়াছিল। রাধামাধব ঘোষের 'সারাবলি' বা 'পুরাণসংগ্রহ' (১৮৪৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের বৃহত্তম কাব্য। বইটি পাঁচ খণ্ডে রচিত। প্রথম খণ্ড রামায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড গৌরাঙ্গলীলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের প্রাচীনপন্থী কবিগণের মধ্যে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ইনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে দুর্গামঙ্গল (১৮১৯), মাধবমালতী (১২৩৭) এবং অক্রুর-সংবাদ। তারাচাঁদ দাস, কালীপ্রসন্ন দাস, "কালীকৃষ্ণ দাস" (বৈদ্যনাথ বাগচি ও মধুসূদন দাস সরকার) প্রভৃতি অনেকে ভারতচন্দ্রের অনুসরণে প্রেম-কাব্য লিখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের পদ্ধতির কবিদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৬-১৮৫৮) এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মদন-মোহন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন—রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা। রসতরঙ্গিণী হইতেছে কয়েকটি সংস্কৃত আদিরসাত্মক প্রকীর্ণ শ্লোকের পদ্যানুবাদ। দ্বিতীয়

বইটি সুবন্ধু-রচিত সংস্কৃত গদ্য-কাব্য বাসবদত্তা অবলম্বনে রচিত। রচনাকাল হইতেছে ১৭৫৮ শকাব্দ (১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। বাসবদত্তায় মদন-মোহন ছন্দের চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। ইঁহার রচিত শিশুশিক্ষা নামক তিন খণ্ড প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকও তখন খুব চলিত।

কবিত্বশক্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন মদনমোহন হইতে অনেক বড়। ঈশ্বরচন্দ্র এক হিসাবে পূর্ব পদ্ধতির শেষ কবি এবং নূতন পদ্ধতির আদি কবি। দেশপ্রীতি ইঁহার কাব্যে যে নূতন ঝঙ্কার তুলিল তাহাতে তখনকার দিনের উদীয়মান কবি ও শিক্ষিত যুবকেরা ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারাই বাঙ্গালা কাব্যের অভ্যুদয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইল।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি শৈশবেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বালকবয়সে তিনি কবি-দলের জন্য গান রচনা করিয়া দিতেন। পরে তাঁহার কবিতা সংবাদপ্রভাকর ও অন্যান্য সাময়িকপত্রিকায় প্রকাশিত হইত। অনেক কবিতা সংস্কৃতের অনুবাদ, দুই চারিটি ইংরেজী হইতে অনূদিত। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলি ছয় শ্রেণীতে পড়ে, যথা—(১) ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা-বিষয়ক, (২) সমাজ-বিষয়ক, হাস্যরস ও ব্যঙ্গপ্রধান ; (৩) সমসাময়িক ঘটনা-বিষয়ক, (৪) প্রেমমূলক, (৫) ঋতু ও অন্যান্য বর্ণনা-বিষয়ক, এবং (৬) গীতি-কবিতা বা গান।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার রচনাভঙ্গি ছিল—সংবাদপত্রসেবীর যেমন হইয়া থাকে—ব্যঙ্গ ও হাস্যরসপ্রধান, লঘু এবং সময়ে সময়ে একটু গ্রাম্যতাঘেঁষা। সেই জন্য স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে তাঁহার কবিতার মূল্য নিতান্ত কম। কবিতার ছন্দে, বিশেষ করিয়া ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দে, ঈশ্বরচন্দ্র নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। অনুপ্রাসের অযথা প্রয়োগ তখনকার দিনের কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ; ঈশ্বরচন্দ্রের লেখায়ও ইহার ব্যতিক্রম নাই। রচনাভঙ্গি বিচার করিলে দেখি ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন পন্থারই কবি, তাঁহার আদর্শ ভারতচন্দ্র। কিন্তু ভাবের দিক্ দেখিলে বুঝি ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক পন্থার প্রথম কবি ; সুতরাং এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে স্ব-সমাজ- ও স্ব-দেশ-নীতির প্রবর্ত্তন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী সমাজের যাহা কিছু প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি, তাহা যতই নিকৃষ্ট বা কদর্য্য হউক না কেন, সবই তাঁহার নিকট সুন্দর ঠেকিত, এবং গদ্যপদ্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক ব্যঙ্গকবিতার মূলেও এই প্রীতি, এবং প্রাচীন কবিদিগের কাব্য- ও জীবনী-সংগ্রহেও সেই প্রীতি। প্রধানত এই স্বদেশ- ও সমাজ-প্রীতির জন্যই তাঁহার ছাত্র-শিষ্যগণ তাঁহাকে সাহিত্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, যদিও তাঁহার রচনার গ্রাম্যরুচি অনেক সময়েই এইসব কলেজে-পড়া উদীয়মান কবি-দিগের নিকট আদরণীয় ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যরচনা ছিল নিতান্ত গুরুভার ও মন্থরগতি। বাঙ্গালা পদ্য তাঁহার হাতে কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু গদ্যের পক্ষে সেকথা খাটে না। সেকালে অনেকেই গদ্যরচনায় তাঁহার অপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতকালে (১২৬৪ সালে) তাঁহার একখানিমাত্র রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বইটির নাম প্রবোধপ্রভাকর। হিতপ্রভাকর এবং বোধেন্দুবিকাস তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। শেষের বইটি প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকের প্রথম তিন অঙ্কের কাব্যানুবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যেরা তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপ্রভাকর ও সংবাদসাধুরঞ্জন পত্রিকায় নিজেদের রচনা প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে ইঁহাদের কেহ বা কবি, কেহ বা নাট্যকার কিংবা ঔপন্যাসিক হিসাবে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রের পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজীতে লিখিত আখ্যায়িকা-কাব্যের অনুবাদের মধ্য দিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরেজীর প্রভাব তথা আধুনিকতা সর্বপ্রথম দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ইংরেজী মূল অবলম্বনে বিবিধ নীতি-গল্প এবং পারস্য-ইতিহাস আরব্য-উপন্যাস প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য ও গদ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর খাস ইংরেজী কাব্যের অনুবাদ আরম্ভ হয়। এই ধরণের অন্যতম প্রথম বাঙ্গালা কাব্য হইতেছে মিল্‌টনের প্যারাডাইজ লস্ট্‌-এর অনুবাদ সুখদ-উদ্যান ভ্রষ্ট কাব্য (১৮৫৪)। ইহা রঙ্গলালের রচনা বলিয়াই অনুমান হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যে যে আধুনিকতার সূত্রপাত করিলেন তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) কবিতায় বিকশিত হইয়া উঠিল। রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতেন। রঙ্গলাল ইংরেজী ও সংস্কৃতে সমান ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গুরুর মত ইনিও প্রথমে কবি-গান রচনা করিতেন। তখনকার বিবিধ সাময়িকপত্রিকায় ইঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। রঙ্গলালের প্রথম (?) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্য হইতেছে ভেক-মূষিকের যুদ্ধ (১৮৫৮)। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি গ্রীক মহাকবি হোমরের নামে প্রচলিত **Batrakhomuomakia** নামক ব্যঙ্গকাব্যের ইংরেজী অনুবাদের তর্‌জমা। ছোট ছোট মৌলিক কবিতা এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে অনূদিত কবিতা ও কাব্য ছাড়া ইনি চারিখানি মৌলিক রোমান্টিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্ম্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), এবং কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। পদ্মিনী কাব্যের বিষয়বস্তু

হইতেছে মেওয়াড়ের রাণী পদ্মিনী ও সম্রাট্ আলাউ-দ্-দীনের কাহিনী। কর্ম্ম-দেবী ও শূরসুন্দরীর বিষয়বস্তুও রাজপুত-ইতিহাস হইতে গৃহীত। কাঞ্চী-কাবেরীর মূলে আছে উড়িষ্যার এক রাজমহিষীর প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী।

রচনারীতিতে না হউক বিষয়বস্তুতে পদ্মিনী-উপাখ্যান বাঙ্গালা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করিল। কেন যে প্রচলিত পুরাণকাহিনী ত্যাগ করিয়া রাজপুত ইতিহাস হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেন তাহার কৈফিয়তে রঙ্গলাল বলিয়াছেন, "স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য-পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি-প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত করিলাম।"

রঙ্গলালের কাব্যের মূল সুর হইতেছে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তাঁহার গুরুর কাব্যেও দেশপ্রীতি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু সে প্রীতি আত্মসচেতন ছিল না। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা অবধি পেঁছাইতে পারেন নাই। রঙ্গলাল গুরুর অপেক্ষা এক ধাপ বেশী আগাইয়া গিয়াছেন। রঙ্গলালের ভাষাও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর মার্জিত। রঙ্গলাল জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনেক ভাব ইংরেজ কবি স্কট, মূর এবং বায়রনের লেখা হইতে আত্মসাৎ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ততদূর ক্ষমতা ছিল না। সর্বশেষে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপত্রসেবী ছিলেন, সুতরাং জীবিকা বলিয়া সাধারণ লোকের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে ভাঁড়ামিও করিতে হইত। রঙ্গলালের সে দুর্ভাগ্য বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। রঙ্গলাল যথার্থই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি। তবে পূর্বের ধারা তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ববর্ত্তী সাহিত্যের প্রথামত তাঁহার কাব্যে উপাখ্যান ও বর্ণনাই মুখ্য।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩) প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুসরণে কবিতা লিখিতেন বটে, কিন্তু পরে তিনি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া যশস্বী হন এবং কাব্য-রচনা ছাড়িয়া দেন। দীনবন্ধুর কবিতায় কোন বিশেষত্ব নাই, তবে হাস্যরসাত্মক ছড়াজাতীয় কবিতা-রচনায় কতকটা দক্ষতা ছিল। ইঁহার নাটক-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

ঈষৎ পরবর্ত্তী কালের লেখক হইলেও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১২৪৪-১৩১৩) নাম এই প্রসঙ্গে করিতে হয়। ইঁহার কবিতা প্রধানত ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক। কৃষ্ণচন্দ্রের লেখায় সংস্কৃত এবং ফারসীর ছায়া আছে। ইঁহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে সদ্ভাব-শতক (১৮৬১)। সদ্ভাব-শতকের ভক্তিমূলক নীতিবিষয়ক কবিতাগুলিতে প্রায়ই হাফেজের কবিতার ভাব অনুকৃত ও প্রতি-বিম্বিত হইয়াছে। রচনায় নূতনত্ব নাই, তবে প্রসাদগুণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্র দুই একটি ভাল ব্রহ্মসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি গানে মিল নাই।

৪১

বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব

প্রাচীন যাত্রা হইতে বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে ইংরেজী ষ্টেজ্ বা রঙ্গমঞ্চ-প্রবর্ত্তনের পর হইতে। বাঙ্গালা নাটকের গঠনে ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব তুল্যরূপেই আছে। বাঙ্গালা কথাবার্ত্তা ও গান যুক্ত নাটক-পালা লইয়া প্রথম অভিনয় হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে। হেরাসিম্ লেবেডেফ্ নামে একজন রুশ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাট্যশালা স্থাপিত করিয়া তথায় দুইখানি ইংরেজী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালী নট ও নটীদিগের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন। নাটক দুইটিতে ভারতচন্দ্রের গান সংযোজিত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে এবং শেষ অভিনয় হয় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে। ইহার পর বহুকাল আর বাঙ্গালা নাট্যশালা অথবা বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়-সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এক নাট্যশালা স্থাপিত করেন। দেশীয়ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম নাট্যশালা। ইহাতে যে কয়খানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল সেগুলি সবই ইংরেজী। তাহার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এখানে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া নট-নটী কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই থিয়েটার-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

বাঙ্গালা নাটকের অভাবেই সে-যুগে বাঙ্গালা নাট্যশালা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এই অভাব তখন অনেকেই বোধ করিয়াছিলেন। ইহার মোচনের চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে বাঙ্গালা নাটক-রচনার সূত্রপাত হইল। ইহার পূর্ব্বে যে দুই একটি সংস্কৃত নাটক ও প্রহসনের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল, সেগুলি হয় গদ্যানুবাদ নয় কাব্যানুবাদ। প্রথম দুই মৌলিক নাটক হইতেছে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের কীর্ত্তিবিলাস (১৮৫২) এবং তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জ্জুন (১৮৫২)।

রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত-চর্চার প্রবর্ত্তন হইলে সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সমাদর বাড়িয়া যায় এবং সেজন্য ইহার একাধিক অনুবাদ বাহির হয়। কিন্তু এই অনুবাদগুলি নাট্যাকারে নহে। বইটি প্রথম নাট্যাকারে অনূদিত হয় বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক। এই অনুবাদ করা হইয়াছিল ১২৪৬ সালে অর্থাৎ ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু প্রকাশিত হয় দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পরে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। যে-সব বাঙ্গালা নাটকের খোঁজ

পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে, রচনা-কাল ধরিলে, বিশ্বনাথের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকই প্রাচীনতম। নাটকের প্রারম্ভে বিশ্বনাথ পয়ারে গল্পের "অনুবাদ" অর্থাৎ সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন।

এই সময়ে যে কয়খানি সংস্কৃত নাটকের গদ্যপদ্যানুবাদ হয় তাহার মধ্যে নীলমণি পালের রত্নাবলী (১৭৭১ শকাব্দ) উল্লেখযোগ্য।

প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা নাটক হইতেছে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের কীর্ত্তিবিলাস, এবং তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জ্জুন। কীর্ত্তিবিলাস নাটকের (১২৫৮) কাহিনী বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত উপকথা অবলম্বনে গদ্যে পদ্যে লেখা। নাটকটি বিয়োগান্ত। শেক্‌স্পিয়রের প্রভাব আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক-প্রবর্ত্তনের কৈফিয়ৎ হিসাবে লেখক একটি দীর্ঘ ভূমিকা দিয়াছেন। কীর্ত্তি-বিলাস পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মত। দৃশ্য বা scene অর্থে "অভিনয়" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ভদ্রার্জ্জুন (১৭৭৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ) নাটকের বিষয় অবশ্য মৌলিক নয়, কিন্তু রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ ভাবে মৌলিক। সংস্কৃত নাটক-রচনা-পদ্ধতি ইংরেজী পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইয়া তারাচরণ এই নাটকটি রচনা করিয়া-ছিলেন। সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও প্রস্তাবনা এবং বিদূষকের ভূমিকা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং ইংরেজী নাটকের মত ঘটনা ও সংস্থান এবং অঙ্কের অন্তর্গত একাধিক scene বা "সংযোগস্থল" প্রযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা রীতি অনুযায়ী নাটকের প্রারম্ভে পয়ারে কাহিনীর ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। ভদ্রার্জ্জুন অংশতঃ গদ্যে এবং বেশীর ভাগ পদ্যে—পয়ারে—রচিত।

পূর্ব্বেকার নাটকগুলি বিশেষ করিয়া অভিনয়ার্থ রচিত হইত না। ভদ্রার্জ্জুন কিন্তু অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল। এবিষয়ে তারাচরণ ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত-দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদি পর্ব্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।"

তাহার পর ইংরেজী নাটক অবলম্বনে রচিত প্রথম বাঙ্গালা নাটক প্রকাশিত হয়—হরচন্দ্র ঘোষের (১৮১৭-৮৪) ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক। বইটির প্রকাশকাল ধরা হইয়া থাকে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, কিন্তু ভূমিকায় হরচন্দ্রের উক্তি হইতে মনে হয় যে বইটি তাহার পূর্ব্ব বৎসরেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক মোটেই সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। হরচন্দ্র বইটিকে পাঠ্যপুস্তকের মত করিয়া লিখিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য মূল নাটকের অঙ্গহানি করিতে হইয়াছিল। পদ্যাংশের বাহুল্যও বইটির একটি দোষ। এই দোষ পরিহরণ করিয়া হরচন্দ্র কয় বৎসর পরে আর একটি নাটক লেখেন। কৌরব-বিয়োগ নাটক (১৮৫৮) মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইতে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মাহুতি পর্য্যন্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই নাটকে পদ্যের ভাগ কমাইয়া দিলেও নাটক হিসাবে উপযোগিতা বাড়িল না। গুরুগম্ভীর রীতিতে রচিত দীর্ঘ উক্তির বাহুল্য কৌরব-বিয়োগের প্রধান দোষ। গ্রন্থকারের আশা ছিল যে নাটক বলিয়া না হউক পাঠ্যপুস্তক বলিয়াও ইহা কাশীরাম দাসের কাব্যের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য তাঁহার আশা সফল হয় নাই। হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক (১৮৬৪) শেক্স্পিয়রের রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে লেখা। চতুর্থ নাটক রজত-গিরিনন্দিনীও (১৮৭৫) ইংরেজী অবলম্বনে রচিত। হরচন্দ্রের কোন নাটকই সমাদৃত হয় নাই। হরচন্দ্রের অপর রচনা হইতেছে 'সপত্নী সরো' (১৮৭৪) উপন্যাস এবং রাজতপস্বিনী কাব্য (১২৮৩)।

ভদ্ররীতি, গুরু রচনাভঙ্গি এবং ভাঁড়ামি-হীনতা হেতু মৌলিক নাটক-গুলি অভিনয়সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত হইতে অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক (১৮৫৫) অভিনয়ে বেশ জমিয়াছিল। তাহার পর রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী (১৮৫৮) প্রভৃতি অনুবাদাশ্রিত নাটক রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই রত্নাবলী নাটকের অভিনয়গৌরব দেখিয়াই মধুসূদন বাঙ্গালা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটকের পর ইংরেজী হইতে অনূদিত অথবা ইংরেজী মূল অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালা নাটক হইতেছে শ্যামাচরণ দাস দত্তের অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক (১৮৫৬)। বইটি রো (Rowe) প্রণীত "দি ফেয়ার পেনিটেন্‌ট" নাটক অবলম্বনে লেখা হইয়াছিল। ইংরেজী অবলম্বনে রচিত কোন বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত হইতে অনূদিত নাটকের মত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তিনচারিখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক অথবা প্রহসন—বাবু নাটক—যে ঠিক কোন্ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাসের নাটকের অনুবাদ বিক্রমোর্বশী নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। সাবিত্রী-সত্যবান্ নাটক (১৮৫৮) মৌলিক রচনা। মালতীমাধব নাটক (১৮৫৯) ভবভূতির নাটকের অনুবাদ। নাট্যকার হিসাবে কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

বাঙ্গালা নাটকের প্রত্যূষ-যুগের প্রধান নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬)। রামনারায়ণের প্রথম নাট্য-রচনা 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বিষয়গৌরবে, রচনাচাতুর্য্যে এবং নাট্যবন্ধে উঁচুদরের লেখা না হইলেও তখনকার দিনের বাঙ্গালা নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্যের আবির্ভাব করিয়া এবং কৌতুকরসের যোগান দিয়া বাঙ্গালা নাটকের ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিল। কৌলীন্যপ্রথার দোষনির্দ্দেশ হইতেছে নাটকটির বিষয়। নাটকটির প্লট বলিয়া বিশেষ কিছু নাই; ইহা কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্য-পরম্পরা মাত্র। তবে আখ্যানবস্তুর বৈচিত্র্য এবং সরস ও লঘু বাগ্‌ভঙ্গি দৃশ্যগুলিকে মনোরম করিয়াছে। শিক্ষিতসমাজের নবজাগরিত সংস্কারস্পৃহা এই নাটকটির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার সমাদর গুণের তুলনায় বেশী হইয়াছিল বলিতে হইবে। সমাজসংস্কারবিষয়ে ইনি আরও একটি নাটক লিখিয়াছিলেন —নবনাটক (১৮৬৬)। দুইটি নাটকই ফরমায়েসি রচনা। প্রথমটি লেখা হয় রঙ্গপুরের কালীচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রদত্ত পারিতোষিকের জন্য, দ্বিতীয়টি রচিত হয় জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে। নবনাটকে বহু-বিবাহের দোষ চিত্রিত হইয়াছে। বেণীসংহার নাটক (১৮৫৬), রত্নাবলী নাটক (১৮৫৮), অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক (১৮৬০) ও মালতীমাধব নাটক (১৮৬৭) সংস্কৃত মূলের অনুসরণে লিখিত। রুক্মিণীহরণ নাটক (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫) এবং ধর্ম্মবিজয় নাটক (১৮৭৫) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মৌলিক রচনা। স্বপ্নধন (১৮৭৩) একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট (১২৭৬) ও চক্ষুদান (১২৭৬) প্রভৃতি কয়েকখানি প্রহসনও রামনারায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যশালায় রামনারায়ণের প্রহসনগুলি বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগাছিয়া বাগান-বাড়ীতে (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) মহাসমারোহে রাম-নারায়ণের রত্নাবলীর অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়ের অপরিসীম সাফল্যই মধুসূদনকে বাঙ্গালা নাটক-রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহার প্রথম নাটক শর্ম্মিষ্ঠাও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা নাটকের আদিযুগে পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্য অসাধারণ উপকার করিয়াছিল।

রামনারায়ণের কুলীন-কুলসর্বস্বের অনুকরণে ও অনুসরণে সামাজিক কুপ্রথা এবং সামাজিক সংস্কার (বিশেষ করিয়া বিধবাবিবাহ)-বিষয়ে অনেক-গুলি নাটক অতি অল্প সময়ের মধ্যে রচিত হইয়া গেল। এই সকল নাটকের মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবোদ্বাহ (১৭৫৬), রাধামাধব মিত্রের বিধবা-মনোরঞ্জন (১৮৫৬), যদুগোপাল

চট্টোপাধ্যায়ের চপলাচিত্তচাপল্য (১৮৫৭), তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক (১৮৫৮), নারায়ণ চটরাজ গুণনিধির কলিকৌতুক (১৮৫৮), "শ্রীশিমুয়েল পির বক্স্" প্রণীত বিধবাবিরহ (১৮৬০), শ্যামাচরণ শ্রীমানীর বাল্যোদ্বাহ (১৮৬০), অম্বিকাচরণ বসুর কুলীন-কায়স্থ (১৮৬১), হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলভঞ্জন (১৮৬২) এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের সম্বন্ধ-সমাধি (১৮৬৭) ইত্যাদি নাটক উল্লেখযোগ্য। উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক তৎপূর্বে প্রকাশিত বাঙ্গালা নাটকসমূহের তুলনায় অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। এই নাটকটির অনেক-গুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চে ইহার সমাদর বহুদিন অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক প্রথমভাগ মাত্র; কাহিনী অসম্পূর্ণ বলিয়া নাটক হিসাবে বইটির মূল্য বেশী নয়। ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব পরিস্ফুট এবং ভাবেও গ্রাম্যত্ব বিরল নয়। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ক্বচিৎ দেখা যায়। তবুও নাটকটিতে ওজোগুণের পরিচয় আছে, এবং কাহিনীর ট্র্যাজিক অংশ সত্যসত্যই মর্ম্মস্পর্শী। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলভঞ্জন নাটকের বিষয় হইতেছে কতকগুলি পাড়াগেঁয়ে নেশাখোর ব্যক্তিকর্তৃক এক বিধবা-বিবাহ পণ্ড করিবার ষড়্‌যন্ত্র। ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন, "অস্মদ্দেশে দলাদলি প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে সকল মহৎ অনিষ্টপাত হইতেছে, তাহা যতদূর ব্যক্ত করা আমার সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই এই দলভঞ্জন নাটকে উল্লেখ করিয়াছি।" নাটকটি আগাগোড়া কথ্যভাষায় লিখিত। কৌতুকরসও প্রায় সর্বত্র জমিয়াছে। হারাণচন্দ্রের অপর নাটক হইতেছে বঙ্গকামিনী নাটক (১২৭৫)। সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত নাটকগুলির অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

৪২

নাটকে মধুসূদন ও দীনবন্ধু

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্ম্মিষ্ঠা নাটক (১২৬৫ সাল, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) বাঙ্গালা নাটকে নূতন প্রাণসঞ্চার করিল। একদিকে গুরুভার রচনারীতি, অপরদিকে গ্রাম্য কৌতুকরস অথবা ভাঁড়ামি—এই দোটানার মধ্যে অনুকরণের আবর্ত্তে পড়িয়া বাঙ্গালা নাটকের যখন আর উদ্ধারের কোন আশা ছিল না তখন মধুসূদন লঘুতর রচনারীতি, প্লট্-রচনায় দক্ষতা এবং বিশুদ্ধ কৌতুকরসের অবান্তরভাবে প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গালা নাটকে নূতন জীবন দান করিলেন। মধুসূদন চারিখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ নাটক—মায়াকানন—তাঁহার মৃত্যুর পরে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) প্রকাশিত হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী এই নাটক

তিনখানির আখ্যানবস্তু যথাক্রমে মহাভারত, গ্রীক-উপাখ্যান ও রাজপুত-কাহিনী হইতে গৃহীত। শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটকে সংস্কৃত নাটকের—বিশেষ করিয়া কালিদাসের শকুন্তলার—প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ঘটনাসংস্থানে গ্রীক নাটকের প্রভাব আছে। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রধান দোষ হইতেছে প্লটের শৈথিল্য; নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব ঘটনাই নেপথ্যে ঘটিয়াছে। পদ্মাবতী (১৮৬০) বিশুদ্ধ রোমান্টিক নাটক। কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক; ইহাতে প্লটের সংহতি ট্রাজেডিও অবান্তর কোন ঘটনার দ্বারা ব্যাহত হয় নাই। কৃষ্ণকুমারী নাটকের অনুসরণে পরে বহু নাট্যকার রাজপুত-ইতিহাস হইতে আখ্যানবস্তু আহরণ করিয়াছেন।

মধুসূদনের প্রহসন দুইটি—একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০) এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন। প্রথমটিতে উন্নতির নামে যথেচ্ছাচারী নব্যসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দ্বিতীয়টিতে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচারী প্রাচীন সমাজের লাম্পট্য ফটোগ্রাফ-সুলভ নিপুণতার এবং অপরিসীম ধিক্কারের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এই প্রহসন দুইটি সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরবর্ত্তী কালের প্রায় সব প্রহসন এই ছাঁচে ঢালা হইলেও অনুকৃত রচনা দুইটিকে শিল্পনৈপুণ্যে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং একেই কি বলে সভ্যতা সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা নাটক-রচনায় নূতন প্রেরণা দিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-১২৮০) তাঁহার প্রথম নাটক নীলদর্পণ (১৮৬০) প্রকাশ করিয়া। নীল-চাষ সে সময়ে আমাদের কৃষিজীবী-সমাজে যে নিদারুণ সমস্যা আনিয়া দিয়াছিল এবং নীলকর সাহেবদের যে অকথ্য অত্যাচার বাঙ্গালার পল্লীজীবনের নিঃশ্বাসরোধ করিয়া আনিতেছিল, এই নাটকটিতে তাহারই জলন্ত ও বীভৎস বাস্তব চিত্র প্রকটিত হইয়া স্বদেশ-বিদেশে শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তিদের সমবেদনা আকর্ষণ করিল। আমেরিকার মিসেস ষ্টো-এর 'আঙ্কল্ টম্‌স্ ক্যাবিন' উপন্যাস যেমন দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার উচ্ছেদ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, নীলদর্পণও তেমনি নীলকরদের অত্যাচার সকলের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার প্রশমনে কার্য্যকর হইয়াছিল। নাটক হিসাবে নীলদর্পণে অনেক ত্রুটি আছে। প্লটে নাটকীয় গুণ নাই; ভাষাও উপযুক্ত নয়, হয় একান্ত গ্রাম্য, নয় নিতান্ত গুরুগম্ভীর; স্বগত উক্তির বাহুল্য এবং দীর্ঘ বক্তৃতা রসহানি ঘটাইয়াছে; সর্বোপরি মৃত্যুর ঘনঘটা কাহিনীকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বইটির প্রধান গুণ হইতেছে যে চিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব, এবং দেশের কোন অবাস্তব বা নাতিবাস্তব সংস্কারকল্পনা নয়, দেশের যাহারা প্রাণ সেই চাষীদের মরণবাঁচনের বাস্তব সমস্যাই নাটকটির প্রাণ। নীলদর্পণ এমন যথাযথ-

ভাবে এবং সহৃদয়তার সহিত লিখিত যে বইটি প্রকাশিত হইবামাত্র দেশে নীলকরদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না, থাকিলে হয় তো তাঁহার চাকুরী যাইত; কারণ সে সময়ে শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট নীলকর সাহেবদের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। মধুসূদন নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, ইহাতে তাঁহার নাম ছিল না; প্রকাশক বলিয়া পাদ্রী লঙ্ সাহেবের নাম ছিল। নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনিল। বিচারে লঙ্ সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হইল। কিন্তু এত করিয়াও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোধ করা গেল না। নীলদর্পণের অনুবাদ বিলাতে পৌঁছিল, সেখানেও আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং অল্পকাল-মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচার প্রশমিত হইয়া গেল।

নীলদর্পণের পর দীনবন্ধুর এই নাটকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল——নবীন-তপস্বিনী (১৮৬৩), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাইবারিক (১৮৭২), এবং কমলে কামিনী নাটক (১৮৭৩)।

নীলদর্পণ ছাড়া দীনবন্ধুর অপর সব নাট্য-রচনা হাস্যরসপ্রধান নাটিকা অথবা প্রহসন-মাত্র এবং এই-সকল রচনার মধ্যে কমবেশী বাস্তব ঘটনার অথবা ব্যক্তিবিশেষের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। নবীনতপস্বিনীর মধ্যে শেক্স্‌পিয়রের মেরি ওয়াইভ্‌স্ অব্ উইণ্ড্‌সর্ নাটকের প্রভাব আছে। নীলদর্পণ দীনবন্ধুর সবচেয়ে সার্থক রচনা, কিন্তু নাট্য-রচনা হিসাবে সধবার একাদশী অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু। সত্য বটে তাঁহার রচনায় শ্লীলতার গণ্ডী অনেক সময়ে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে দোষ তাঁহার অপেক্ষা সে সময়ের রুচিরই বেশী। সেকালে পাঠক ও দর্শক এইরূপ স্থূল রসিকতা পছন্দ করিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দীনবন্ধুর অঙ্কিত ভূমিকা কোথাও খেলো হইয়া পড়ে নাই। নাট্যকারের সহানুভূতি তুচ্ছতম ভূমিকার মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কতকটা রক্তমাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তী নাট্যকারেরা সুযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়েন নাই। দীনবন্ধুও মধ্যে মধ্যে বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সর্বদা ব্যঙ্গমূর্তি বা ক্যারিকেচারে পরিণত হয় নাই, জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের দোষগুণ লইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি প্রধান গুণ। এই গুণ দীনবন্ধুর যে পরিমাণে ছিল তাহা বাঙ্গালার আর কোন নাট্যকারের ছিল না।

দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি মধুসূদনের প্রহসন দুইটির তুলনায় অনেক হীন। মধুসূদনের অনুকরণও ক্বচিৎ দীনবন্ধুর লেখায় সুস্পষ্ট। লঘু কৌতুক এবং ভাঁড়ামির বাহুল্যে নীলদর্পণ ছাড়া তাঁহার অন্য নাটকগুলিও যেন ব্যর্থ হইয়া

গিয়াছে। নাট্যকার-রূপে দীনবন্ধুর যে অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ছিল তাহাতে তিনি উৎকৃষ্টতর নাটক রচনা করিতে পারিতেন।

দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে কোন না কোন সমসাময়িক ব্যক্তির অথবা ঘটনার ইঙ্গিত ছিল বলিয়া ধনিব্যক্তিদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত কোন রঙ্গমঞ্চে সেগুলি অভিনীত হয় নাই, কিন্তু মফস্বলে দীনবন্ধুর নাটকের আদর হইয়াছিল সর্বাগ্রে। কলিকাতায় সাধারণ (public) রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের আরম্ভ দীনবন্ধুর নাটক লইয়াই, এবং ইহাই সাধারণ নাট্যশালার অসাধারণ সাফল্যের প্রধান হেতু।

৪৩

মনোমোহন বসু ও বিবিধ নাট্যকার

রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত এবং নিতান্ত প্রাণহীন। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত হইলেও, ইহাকে রোমান্টিক নাটকই বলিতে হয়। পৌরাণিক নাটকের বিষয় মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণাদির মধ্য দিয়া সকলেরই পরিচিত। সুতরাং ভক্তিরসের সঞ্চার না হইলে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় আমাদের দেশে কখনই জমিতে পারে না। এই অভাব দূর করিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তিরসের অবতারণা করিয়া মনোমোহন বাঙ্গালা নাটককে নূতন পথে চালাইলেন, ইহারই অনুসরণে প্রথমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পৌরাণিক নাটক-রচনায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। মনোমোহন শুধু নাট্যকার ছিলেন না, কবিতা-লেখায় এবং হাফ-আখড়াই কবি ও পাঁচালীর গান-রচনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। ইঁহার প্রথম নাট্য-রচনা রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭) ভক্তির সহিত করুণ-রসের যোগান দেওয়ায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল। প্রণয়-পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯) একাধিক বিবাহের কুফল-বিষয়ক। রাম-নারায়ণের নবনাটকও এই বিষয় অবলম্বনে রচিত বটে, কিন্তু নাটক হিসাবে মনোমোহনের রচনা হইতে নিকৃষ্ট। সতী নাটক (১৮৭৩) দক্ষযজ্ঞ-বিষয়ক। ইহা ছাড়া তিনি হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থপরাজয় নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০) প্রভৃতি রচনা করিয়া-ছিলেন। শেষোক্ত নাটক তিনখানি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট রচনা। মনোমোহন বসুর নাটক বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিল। তাঁহার দুই-একখানি নাটক এই নাট্যালয়ে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল। মনোমোহনের লেখার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইতেছে দেশপ্রীতির উদ্দীপনা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম মহিলা নাট্যকার হইতেছেন কামিনীসুন্দরী দেবী। ইঁহার উর্বশী নাটক মুদ্রিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ছিল না, "দ্বিজতনয়া" বলিয়া উল্লেখ ছিল। ইঁহার অপর নাট্যরচনা হইতেছে উষানাটক (১৮৭১) এবং রামের বনবাস।

প্রথম মুসলমান নাট্যকার হইতেছেন মীর মশার্‌রফ হোসেন। ইনি দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন—বসন্তকুমারী নাটক (১৮৭৩) এবং জমীদার-দর্পণ নাটক (১৮৭৩)। শেষের বইটির বিষয় হইতেছে পল্লীগ্রামের এক জমীদারের অত্যাচার। ইঁহার পরে দুইজন মুসলমান নাট্যকারের নাম পাই। মোহম্মদ আবদুল করিমের জগৎমোহিনী (১৮৭৫) রোম্যান্টিক নাটক। কাদের আলির মোহিনী-প্রেমপাশ (১৮৮১) -ও তাহাই।

আমাদের পুরাতন যাত্রায় ছিল গীতেরই সমধিক প্রাধান্য। ইংরেজী নাটকে গীতের স্থান নাই বলিলেই হয়, তাই প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকে গানের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। এইজন্য প্রাচীনরুচি শ্রোতা-দর্শকদের কাছে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইত না। এই অসুবিধা দূর করিয়া নাটককে যাত্রার কাছাকাছি আনিবার প্রচেষ্টায় "গীতাভিনয়" বা আধুনিক যাত্রার প্রবর্ত্তন হইল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এইজন্যও গীতাভিনয়ের আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। গীতাভিনয়ের প্রথম সঙ্কলয়িতাদিগের মধ্যে প্রধান হইতে-ছেন হরিমোহন কর্ম্মকার। বেলগাছিয়া বাগানবাড়ীতে রত্নাবলীর অভিনয়ের খ্যাতি দেখিয়া ইনি রামনারায়ণ তর্করত্নের এই নাটকটি অবলম্বন করিয়া রত্নাবলী গীতাভিনয় (১৮৬৫) রচনা করেন; তাহার পর শ্রীবৎসচিন্তা (১৮৬৬) এবং ইঁহার জানকী-বিলাপ গীতাভিনয় (১৮৬৭) ইত্যাদি। মাগ-সর্বস্ব (১৮৭০) প্রহসনও ইঁহারই রচনা। গীতাভিনয়ের পরবর্ত্তী লেখকদের কথা পরে বলিব।

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম-যুগ হইতে নাট্যকাহিনী এই কয় ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল—(ক) পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান, (খ) বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, কন্যা-শুল্ক, পান-দোষ, লাম্পট্য, অশিক্ষা, ভণ্ডামি, দলাদলি ইত্যাদি সমাজদোষ-ঘটিত, (গ) ধনী, জমিদার, কুঠিয়াল, পুলিশ ইত্যাদি প্রবলের অত্যাচার-বিষয়ক, (ঙ) রোমাঞ্চকর কাহিনী, (চ) বাঙ্গালা কাব্য ও আখ্যায়িকা-উপন্যাস-সম্বন্ধীয়, (ছ) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ, এবং (জ) ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ। এই সকল ধারার আদি ও শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির কথা বলিয়াছি। এখন বাঙ্গালা কাব্য-উপন্যাসঘটিত ও ইংরেজী নাটক-আশ্রিত রচনাগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিলেই আদি-যুগের কথা শেষ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের মোহ বোধ হয় চরমে উঠিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে অজস্র বাঙ্গালা নাটক প্রকাশিত

হইয়া সাহিত্যরসিকদের কাছে নাট্যরচনাকে নিতান্ত হেয় করিয়া তুলিয়াছিল। একে তো বাঙ্গালা নাটক ভুইফোঁড় বস্তু, তাহার উপর নাটক-রচনায় যে কল্পনা-বৃত্তি ও রসদৃষ্টির প্রয়োজন তাহা দুই-একজন ছাড়া কোন লেখকেরই ছিল না, সুতরাং কি রঙ্গমঞ্চে কি পাঠ্যহিসাবে বাঙ্গালা নাটকের মনোহারিত্বের কোনই যোগ্যতা ছিল না—এক ভাঁড়ামি ছাড়া। এই জন্য সাধারণ নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ এমন নাটক খুঁজিতে লাগিলেন যাহা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত বাঙ্গালী দর্শকের আগ্রহ আকর্ষণ করিবে। তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যে পদ্যে নব-জাগরণ আসিয়াছে। এইজন্য মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী, রামগতি ন্যায়রত্নের রোমাবতী, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি, রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা, নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি গ্রন্থ নাট্যরূপ গ্রহণ করিয়া রঙ্গালয়ে দর্শকের ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছিল। মেঘনাদবধ অবলম্বনে অনেকেই নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৭)। এই ধারার প্রথম নাটক হইতেছে উমেশচন্দ্র মিত্রের সীতার বনবাস (১৮৬৬)।

অনুতাপিনী নবকামিনী নাটকের কথা ছাড়িয়া দিলে ইংরেজীর অনুবাদ অথবা অনুসরণে লিখিত আদি-যুগের প্রায় সব বাঙ্গালা নাটকেরই অবলম্বন শেক্‌স্পিয়র। পরবর্ত্তী কালেও শেক্‌স্পিয়রই প্রধানভাবে উপজীব্য ছিল। শেক্‌স্পিয়র তথা ইংরেজী অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষ রচিত নাটকের কথা বলিয়াছি। অনেক কাল পরে প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ও মার্চেণ্ট্ অব্ ভেনিস্ অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন সুরলতা নাটক (১৮৭৭)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (?) সুশীলা-বীরসিংহ নাটক (সংবৎ ১৯২৪ অর্থাৎ ১৮৬৮) এবং চন্দ্রকালী ঘোষের কুসুম-কুমারী নাটক (১৮৬৮) সিম্বেলিন্-এর অনুবাদ। হেমচন্দ্রের নলিনীবসন্ত নাটকও এই সালে প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা টেম্‌পেষ্ট্-এর অনুবাদ। কমিডি অব্ এরর্স্ অবলম্বনে লেখা হয় বেণীমাধব ঘোষের ভ্রমকৌতুক নাটক (১২৭৯)। তারিণীচরন পালের ভীমসিংহ (১২৮১) নাটকের মূল ওথেলো। হ্যাম্‌লেট্ অবলম্বনে প্রমথনাথ বসু অমরসিংহ (১৮৭৪) নাটক লিখিয়াছিলেন। হরলাল রায়ও ইহা অবলম্বন করিয়া রুদ্রপাল নাটক (১২৮১) রচনা করেন। ম্যাক্‌বেথ্ অনুবাদ করিয়াছিলেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫) ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। উইন্‌টার্স্ টেল্-এর অনুবাদ মদনমঞ্জরী নাটক (১৮৭৬)। যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষের অজয়সিংহ-বিলাসবতী (১৮৭৮) রোমিও-জুলিয়েটের অনুবাদ; পরে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের শরৎশশী নাটকের (১২৮৯) মূল হইতেছে মিড্‌সামার্ নাইট্‌স্ ড্রীম্। জুলিয়াস্ সীজার্ নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংরেজী অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির অধিকাংশই তেমন অভিনয়সাফল্য লাভ করে নাই।

৪৪

নূতন গদ্য-ভঙ্গি ও রস-রচনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার প্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস ইত্যাদি কতকটা এই শ্রেণীরই বই। এই ধরণের ক্ষুদ্র রচনা সেকালের সাময়িক-পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হইত। তবে এই সকল লেখার সাহিত্যিক মূল্য কিছু ছিল না। "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনামধারী প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা অঞ্চলের ধনিগৃহের চিত্র লইয়া একটি উৎকৃষ্ট উপদেশমূলক আখ্যায়িকা প্রকাশ করেন। বইটিকে প্রধানত নক্শা বা চিত্রসমষ্টি বলা চলে। বইটির নাম আলালের ঘরের দুলাল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ইহা মাসিক পত্রিকা নামক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুশিক্ষার অভাবে ধনীর সন্তান কি করিয়া উৎসন্ন যায় ইহাই আলালের ঘরের দুলালে দেখান হইয়াছে। বইটির গল্পের তুলনায় ভাষা কম লক্ষণীয় নয়। প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থে যে গদ্যরীতির আশ্রয় লইয়াছেন তাহা কথ্যভাষামূলক; তাহাতে সংস্কৃত শব্দের অপেক্ষা চলিত দেশী এবং বিদেশী শব্দেরই প্রাধান্য, ক্রিয়াপদও প্রায়ই কথ্যভাষার। বিদ্যাসাগরের যুগে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া প্যারীচাঁদ যথেষ্ট সাহস এবং স্বাধীনতা দেখাইয়াছিলেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই সহজবোধ্য অথচ রসবান্—ইহাই এই গদ্য-রীতির বিশেষ গুণ। তবু দোষও কিছু ছিল। ইহা মুখের ভাষাও নহে, লেখার ভাষাও নহে। তবে পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ নব্যতন্ত্রের লেখকদিগের উপর ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল। আলালের ঘরের দুলালে যে বাঙ্গালা উপন্যাসের পূর্ব্বাভাষ আছে তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। বইটিতে ঠকচাচার চরিত্র যেরূপ জীবন্তভাবে ফুটিয়াছে তাহা ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের লেখনীর অনুপযুক্ত নয়। ছোটখাট লিপিচিত্রে চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে প্যারীচাঁদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই গুণে তাঁহার অপর গ্রন্থগুলি উপদেশাত্মক ও তত্ত্বকথাঘটিত হইলেও একেবারে রসহীন নয়। প্যারী-চাঁদের অপর উল্লেখযোগ্য আখ্যায়িকা হইতেছে অভেদী (১৮৭১)। ইহার ভাষা অনেকটা সাধুভাষা-ঘেঁষা। এটিকে ধর্ম্মমূলক আখ্যায়িকা বলা যাইতে পারে।

ইতিপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) নাম করিয়াছি। ইনি একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ ছিলেন। ত্রিশ বৎসরব্যাপী স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে ইনি সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতকর বহু কাজ করিয়া গিয়াছেন। তের বৎসর বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার পক্ষ হইতে বাঙ্গালায় কাব্য-রচনার জন্য মধুসূদন দত্তকে এবং নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য লঙ্ সাহেবকে সংবর্দ্ধিত করা হয়। সভার মুখপত্র বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা ছাড়া আরও কয়েকটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। কয়েকখানি নাটক প্রকাশের পর কালীপ্রসন্ন হুতোম প্যাঁচার নক্শা রচনা করেন। ইহার প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ তাহার অল্প কাল পরে প্রকাশিত হয়। সেকালের কলিকাতার আচারব্যবহার, পালপার্বণ, সভাসমিতি ইত্যাদি যাহা কিছুতে ভণ্ডামি বা কুশ্রীতা দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি হুতোম প্যাঁচার নক্শায় উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া বিদ্রূপের নিদারুণ কশাঘাত করিয়াছেন। হুতোমের ভাষা কলিকাতার কথাভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহা আলালের ঘরের দুলালের ভাষার মত সঙ্কর ভাষা নহে।

কালীপ্রসন্নের অক্ষয় কীর্ত্তি অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতের গদ্য অনুবাদ 'পুরাণ-সংগ্রহ'-প্রকাশ। এই কার্য্যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রমুখ বড় বড় পণ্ডিতের সাহায্য পাইয়াছিলেন। মহাভারত প্রকাশ করিতে আট নয় বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার প্রথম খণ্ড ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ খণ্ড ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

৪৫

কাব্যে মধুসূদন

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক মহাকবি মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে যশোর জেলায় কপোতাক্ষ-তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ, মাতার নাম জাহ্নবী। পিতামাতার একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া মধুসূদনের শৈশব ও বাল্যকাল অত্যধিক আদরে যাপিত হয়। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া মধুসূদন কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। রাজনারায়ণ কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন, থাকিতেন খিদিরপুরে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী

ছিলেন। এখানে ছাত্র হিসাবে মধুসূদন বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভিতরে যে অসামান্য তেজ এবং তীব্র উচ্চাভিলাষ ছিল তাহা অযথা প্রশ্রয় পাইয়া অচিরে ভবিষ্যৎ দুঃখদুর্দ্দশার সূচনা করিল। ইংরেজী সাহিত্যের রস এবং ইংরেজ অধ্যাপকদিগের সাহচর্য্য পাইয়া স্ব-সমাজে ও স্বধর্ম্মে মধুসূদনের আস্থা কমিয়া গেল। খ্রীষ্টান হইলে মনে-প্রাণে সাহেব হইতে পারিবেন এই দুরাশার ছলনায় মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এখন তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাহার পর পাঁচ বৎসর কাল খ্রীষ্টান পাদ্রীদের শিক্ষায়তন বিশপ্‌স্ কলেজে তিনি হিব্রু, গ্রীক, লাতীন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাহার পর মাদ্রাজে গিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া ও সংবাদপত্রে লিখিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে থাকেন। কবিজীবনের সূত্রপাতও সেইখানেই। মাদ্রাজে থাকিয়া তিনি ইংরেজীতে ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী ও ভিসন্‌স্ অব্ দি পাস্‌ট্ ইত্যাদি কাব্য ও কবিতা রচনা করেন। প্রথমে যে স্কট্ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন তাঁহার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় মধুসূদন আবার একটি বিদেশী (ফরাসী) মহিলাকে বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে পিতামাতার পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন পুলিশ-কোর্টে চাকুরী করিতে লাগিলেন এবং ইংরেজীতে কাব্য-রচনার প্রয়াস ব্যর্থ বুঝিয়া মাতৃভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙ্গালাতে ভাল নাটকের অভাব দেখিয়া তিনি প্রথমে নাটক- ও প্রহসন-রচনায় মন দিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৬০), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) এবং পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) প্রকাশিত হইল। নাটক রচনা করিতে করিতে তাঁহার এমন এক নূতন প্রেরণা জাগিল যাহাতে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের রূপ বদলাইয়া গেল,—তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। এই ছন্দে রচিত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবিধার্থ-সংগ্রহে অংশত প্রকাশিত হইয়াছিল ; ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয়। তাহার পর এই ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ও বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), এবং বিচিত্র মিল ছন্দে ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) প্রকাশিত হইল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্বপ্রথম কবিচিত্তের আত্মপ্রকাশমূলক কবিতা "আত্মবিলাপ" ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। কাব্যসৃষ্টির উন্মাদনার কালেও মধুসূদন নাটক-রচনা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রকাশিত হয়। সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকটির প্লটে গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস্-এর ও ইংরেজ নাট্যকার শেকস্‌পিয়রের প্রভাব আছে। মৃত্যুর পূর্বে কবি

আরও দুইখানি নাটক রচনায় হাত দিয়াছিলেন। একখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, অপরখানি—মায়াকানন—সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিলাত যাইবার বাসনা মধুসূদনের বরাবরই ছিল, সুযোগের অভাবে যাইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পাঁচ বৎসর থাকিয়া ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি বিবিধ ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করেন। অর্থাভাবে পড়িয়া বিলাতে যখন তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য পাঠাইয়া উদ্ধার করেন। ইঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির ব্যারিষ্টারী পাশ তো দূরের কথা, প্রাণ বাঁচিত কিনা সন্দেহ। দেশে ফিরিয়া আসিলে বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি পিতৃবৎ অভ্যর্থনা ও সহায়তা পাইয়াছিলেন। ফরাসী দেশে থাকিবার সময়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহাই প্রথম সনেট্-জাতীয় কবিতাবলী। মধুসূদনের পর অনেক কবি সনেট্ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেহই মধুসূদনের মত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে মোটেই সুবিধা করিতে পারিলেন না। তাঁহার আর্থিক ও মানসিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার পর তিনি দুইখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন —হেক্টর-বধ (১৮৭১) এবং মায়াকানন (১৮৭৪)। হেক্টর-বধে কবি বাঙ্গালা গদ্যে প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোমরের ইলিয়দ্ মহাকাব্যের উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকে কবির সে প্রচণ্ড প্রতিভার শুধু ভগ্নাবশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। আশাভঙ্গজনিত নিদারুণ মনোবেদনা এবং অত্যাচার-উচ্ছৃঙ্খলতা-জনিত দেহযন্ত্রণা ও দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে স্বর্গারোহণ করিলেন। বাঙ্গালার প্রচণ্ড কবিপ্রতিভা আপনার অন্তর্দাহে আপনি দগ্ধীভূত হইয়া নির্বাণ লাভ করিল, সম্পূর্ণভাবে স্ফূর্তি পাইবার সুযোগ ও অবকাশ পাইল না—ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

হোমর, ভার্জিল, দান্তে, তাস্সো, মিল্টন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবির মহাকাব্যের অনুসরণে মধুসূদন বাঙ্গালাতে মহাকাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা। কিন্তু মধুসূদনের মহাকাব্য অনুকরণমাত্র নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। বহু ভাষার ও সাহিত্যের রসবেত্তা কবির লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের যে সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা অপর কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায় নাই। বাল্যকাল হইতে মধুসূদন রামায়ণ-মহাভারতের রসে ওতপ্রোত ছিলেন। ফরাসীদেশে ভের্সাই শহরে বসিয়া তিনি যখন সনেট্-

রচনা করিতেছেন, তখনও কাব্যের বিষয় বলিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছে কাশীরাম দাস, বিজয়া দশমী, শ্রীমন্তের টোপর, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি! রামায়ণ-কাব্যের অপরূপ মাধুর্য্যে কবির চিত্ত সারাজীবন ভরিয়া ছিল। ভারতবর্ষীয় শাশ্বত-কবিচিত্ত-কমলবিহারিণী সীতাদেবীর কথা কবির মানসে সর্বদাই জাগরূক ছিল; একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই,—"অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, বৈদেহি।" "কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি, নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি, নিত্যকান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে।" তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণের অভাব দেখিয়া কবি যখন বীররসাশ্রিত "মহাকাব্য" প্রণয়ন করিতে সংকল্প করিলেন, তখন স্বভাবতই রামায়ণকাহিনীর প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। মেঘনাদবধ বাঙ্গালাতে প্রথম এবং একমাত্র বীররসানুপ্রাণিত "মহাকাব্য"।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণের অবতারণা করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল বাঙ্গালা ভাষার ও ছন্দের স্বরবহুলতা ও লালিত্য। কবি প্রথম দোষ শুধরাইয়া লইলেন প্রচুরভাবে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া এবং নামধাতুর সৃষ্টি করিয়া, আর ছন্দের ওজোহীনতা নিরাকরণ করিলেন অমিত্রাক্ষর পয়ার প্রবর্ত্তন করিয়া। প্রায় সকল বাঙ্গালা ছন্দের মূলে আছে পয়ার। পয়ারের প্রধান লক্ষণ হইতেছে অষ্টম ও চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর যতি এবং শেষ যতিতে মিল। যতির স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকায় পয়ারে ব্যঞ্জনঝঙ্কারময় ওজস্বী সংস্কৃত শব্দ বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করা অসম্ভব ছিল, এবং চরণের শেষে মিল থাকায় বাক্য এবং ভাব দুই চরণে শেষ করিতেই হইত। অসীম প্রতিভা-বলে মধুসূদন এই দুই বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিলেন। তিনি যে অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিলেন তাহা মোটেই বিদেশী আমদানি নহে, ইহার মূলে বাঙ্গালা পয়ারেরই ধ্বনিপ্রবাহ এবং নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যা রহিয়াছে, কেবল অন্ত্য অনুপ্রাস (অর্থাৎ মিল) নাই এবং অষ্টম অক্ষরে যতি অবশ্যম্ভাবী নয়। বাঙ্গালা ছন্দ স্বীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াই এই অভূতপূর্ব নূতন রূপ পাইল। বাঙ্গালা সাহিত্য নবজন্ম লাভ করিল।

বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে মশগুল থাকিয়া বিদেশী ধর্ম্ম, পোষাক ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিলেও মধুসূদন মনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের আবহমান ধারার সহিত তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ঐকান্তিক বিচ্ছেদ ছিল না। অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও বৈষ্ণব গীতিকাব্যের সুর ভারতচন্দ্রের গানের মধ্য দিয়া আসিয়া তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে অনুরণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণসম্পন্ন কাব্য মধুসূদনের পরে আর রচিত হয় নাই; এবং আর কোন কবিই অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের মত অতটা সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

৪৬

রোমান্টিক গীতিকাব্যের অভ্যুদয়

মধসূদনের পরবর্ত্তী দুইজন কবির রচনার মধ্যে বিদেশী-কাব্যসুলভ স্বানুভূতি-প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রথম মিলিল। এই দুই কবি হইতেছেন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)। বিহারীলালের শিক্ষা সংস্কৃত কলেজে। ১২৬৫ সালে ইনি পূর্ণিমা পত্রিকা প্রকাশ করেন, ইহাতে ইঁহার কয়েকটি কবিতা বাহির হয়। তাহার পর ইনি অবোধবন্ধু পত্রিকা সম্পাদন করেন, ইহাতে বঙ্গসুন্দরী কাব্যের (১৮৭০) কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যরূপে বিহারীলাল বাঙ্গালা কাব্যের আসরে নামেন। ইঁহার বন্ধুবিয়োগ এবং প্রেমপ্রবাহিণী কাব্য (১৮৭০) দুইটিতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে (১৮৭০) এই প্রভাবের চিহ্ন থাকিলেও কবির নিজস্ব রীতি দেখা দিয়াছে। বঙ্গসুন্দরীতে বিহারীলালের প্রতিভা হইয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠ। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গল। ইহার রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ সালে; ইহা ১২৮৩ সালে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় খণ্ডশ আর ১২৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবির কাব্যপ্রেরণার মূলে ছিল প্রেমপ্রবণতা, এবং এই প্রেমপ্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার পত্নীকে আদর্শ করিয়া। সাধের আসন কাব্যে ইহা মাতৃ-মূর্ত্তির এবং মহীয়সী নারীর সাধারণ আদর্শের কল্পলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কবিহৃদয়ের যে স্বতঃপ্রকাশ বিহারীলালের কাব্যে প্রথম দেখা গেল মধুসূদনের কাব্যে তাহা ছিল আভাসে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিহারীলালই প্রথম প্রকৃত রোমান্টিক কবি। বিহারীলালের কাব্যে দোষগুণ প্রায় সমান সমান। বিহারীলাল শব্দশিল্পী ছিলেন না; ভাষায় অমার্জ্জনীয় শৈথিল্য, এবং কাব্যের বস্তু তেমন সংহত নহে। কিন্তু কবি-অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অকৃত্রিম প্রকাশই বিহারীলালের কাব্যের অসাধারণতা। ছন্দের লঘুতায় ও লালিত্যে কবি নূতন পথ দেখাইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রবন্ধ ও কবিতা বিবিধার্থসংগ্রহ, মঙ্গল-উষা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। কয়েকটি ছোটখাট কবিতা ছাড়া ইনি একখানি নাটক—হামির—ও চারি-পাঁচখানি ছোটবড় কাব্য রচনা করিয়া-ছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে মহিলা কাব্য। এই কাব্য তিন অংশে বিভক্ত—উপহার, মাতা ও জায়া। ভগিনী নামক চতুর্থ অংশেরও পত্তন কবি করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কয় ছত্রের পর কবি আর লিখিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ কাব্যে নারীর চারি মূর্ত্তির—মাতা, জায়া, ভগিনী,

দুহিতা—প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। মহিলা কাব্যের রচনা ১২৭৮ সালে আরম্ভ হয়। কাব্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল কবির মৃত্যুর পরে ১২৮৭-৮৯ সালে। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বড় কবিতা সবিতাসুদর্শন ১২৭৫ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অমতে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া কবি কাব্যটির প্রচার বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত বিহারীলালের কাব্যের একটা সাধর্ম্ম্যও আছে। উভয়ের কাব্যেই বর্ণনীয় বস্তুর বাহ্যরূপ অপেক্ষা কবিচিত্তে তাহা যে অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে তাহার মূল্য বেশী। এই হৃদয়াবেগের অনুভূতি ও প্রকাশ বিহারীলালের কাব্যে যেমন বহির্নিরপেক্ষ ও আন্তরিক সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে তেমন নয়। কিন্তু পদলালিত্যে না হউক রচনার প্রগাঢ়তায় সুরেন্দ্রনাথের রচনার অনন্যতা অস্বীকার করা। বিহারীলালের কাব্যে বিদেশী কবির প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ, সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণভাবে খাটে না। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যপদ্ধতি মধুসূদন প্রভৃতি পূর্ববর্ত্তী কবিদের রচনাপদ্ধতি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ। ইঁহারও প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কাব্যকলা, দর্শন-আলোচনা, গণিতচর্চা, সঙ্গীত, রেখাক্ষর প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ইঁহার গভীর অধিকার ছিল কিন্তু কিছুতে আসক্তি ছিল না। তাই ইঁহার প্রতিভা উপযুক্ত স্ফূর্তিলাভ করে নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম। ভাবের প্রাচুর্য্য ও রচনার বৈচিত্র্য এই রূপক কাব্যটিতে অসাধারণের মহিমা দিয়াছে। সংস্কৃত ছন্দে অথবা বাঙ্গালা ছড়ার ছন্দে কৌতুক-কবিতা-রচনায় পারদর্শী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখায় লক্ষিত হয়।

৪৭

কাব্যে মধুসূদনের অনুসরণ

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর মহাকাব্য প্রাচীনপন্থীদিগকে তুষ্ট করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে "মহাকাব্য"-রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল ভিন্ন পথে। ইঁহারা অমিত্রাক্ষরের মাধুর্য্য ও শক্তি বুঝিতে পারেন নাই এবং বিদেশী কাব্যের রসও ইঁহাদের অনধিগত ছিল। তাই প্রধানত পয়ার এবং ক্বচিৎ সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে ইঁহারা পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে "মহাকাব্য" রূপ দিতে লাগিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনের দুঃসাহস দেখাইলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হইতেছেন ভুবনমোহন রায়চৌধুরী এবং বলদেব পালিত। কিন্তু এই প্রাচীনপন্থীদের কোন রচনাই যথার্থ কাব্য-নামের যোগ্য নয়।

নবীনপন্থীরা মধুসূদনের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের শক্তি নিতান্ত অল্প ছিল অথচ কবিযশের উপর লোভ কম ছিল না তাঁহারা অমিত্রাক্ষরে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া গেলেন। আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ এবং যাঁহাদের রসবোধের একান্ত অভাব ছিল না তাঁহারা মধুসূদনের দুরূহ পথ আদ্যন্ত অনুসরণের মত অবিবেচকতা না দেখাইয়া মধ্যপথ ধরিলেন, অর্থাৎ ক্বচিৎ মিলহীন পয়ার এবং ক্বচিৎ পয়ার-ত্রিপদী ব্যবহার করিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে মুখ্য হইতেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)। কাব্য-পদ্ধতিতে প্রধানত সাবেকি বর্ণনাত্মক রীতি অবলম্বন করিলেও হেমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য কাব্য-আদর্শকে অস্বীকার করেন নাই। ইঁহার কাব্যকলায় ইংরেজী সাহিত্যেরই প্রভাব সমধিক, সংস্কৃতের নয়।

বিহারীলালের সম্পাদিত অবোধবন্ধু পত্রিকায় হেমচন্দ্র কবিতা লিখিতেন। বঙ্গদর্শনেও ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য চিন্তাতরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়। তাহার পর যথাক্রমে বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪), নলিনীবসন্ত নাটক (১৮৬৮), কবিতাবলী প্রথম ভাগ (১৮৭০), বৃত্রসংহার মহাকাব্য প্রথম খণ্ড (১৮৭৫), ঐ দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৭৭), কবিতাবলী দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮৭), ছায়াময়ী (১৮৮০), আশাকানন (১৮৭৬), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), বিবিধ কবিতা (১৩০০), রোমিও-জুলিয়েত নাটক (১৮৯০), এবং চিত্তবিকাশ (১৩০৫) প্রকাশিত হয়। নাটক দুইখানি যথাক্রমে শেক্‌স্পিয়র প্রণীত দি টেম্‌পেষ্ট ও রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে রচিত। ইতালীয় কবি দান্তের লা কোমোদিয়া কাব্যের ভাব অবলম্বনে ছায়াময়ী লেখা হইয়াছিল। বৃত্রসংহার-রচনার মূলে মেঘনাদবধের প্রেরণা ছিল। বীররস সর্বত্র জমিয়া না উঠিলেও এবং বর্ণনার আতিশয্য-সত্ত্বেও বৃত্রসংহার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য এবং ইহার আখ্যানবস্তু যে মহাকাব্যোচিত প্রশস্ত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। হেমচন্দ্রের ছন্দোনিপুণতা ছিল। কথ্যভাষায় লঘু ছন্দে সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ইনি বহু সরস ও উপভোগ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন; এগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্বোপরি, হেমচন্দ্রের লেখায় স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাধীনতাকামনা যতটা নিষ্কপটভাবে ফুটিয়াছে এমন আর পূর্ববর্ত্তী কোন বাঙ্গালী কবির কাব্যে প্রকাশ পায় নাই। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রও (১২৬২-১৩০৪) সুকবি ছিলেন। ইঁহার প্রধান রচনা যোগেশ (১২৮৭) কাব্য।

হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অল্পকাল মধ্যেই নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) আবির্ভাব ঘটে। নবীনচন্দ্র অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তাহার

মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫), এবং রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)। শেষের কাব্য তিনখানি প্রকৃত প্রস্তাবে এক বিরাট্ কাব্যের তিন স্বতন্ত্র অংশমাত্র। এই কাব্যত্রয়ীতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে কবি বিচিত্র কল্পনায় নূতনভাবে ফুটাইয়াছেন। কবির মতে আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এবং আর্য্য-অনার্য্য দুই সম্প্রদায়কে মিলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের অপর কাব্য-গ্রন্থ হইতেছে অবকাশরঞ্জিনী [দুই ভাগ] (১২৭৮, ১২৮৪), ক্লিওপেট্রা (১২৮৪), অমিতাভ (১৩০২), অমৃতাভ, রঙ্গমতী (১৮৮০), ও খৃষ্ট (১২৯৭)। নবীনচন্দ্র ভগবদ্‌গীতার এবং মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীরও পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কবিত্ব স্থানে স্থানে চমৎকার, কিন্তু কবি এই চমৎকারিত্ব সর্বত্র বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই কারণে এবং কাব্যে বাঁধুনি না থাকায় নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ঠিকমত বিচার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নবীনচন্দ্র গদ্য-রচনাতেও হাত দিয়াছিলেন। এইজাতীয় রচনার মধ্যে তাঁহার আত্মকথা—'আমার জীবন'—উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য গ্রন্থ। কবি ভানুমতী নামে একখানি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধুসূদনের ও হেমচন্দ্রের অনুকরণে অনেকেই কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাময়িক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—যৌবনোদ্যান (১৮৬৮), মিত্রবিলাপ (১৮৬৯) ইত্যাদি রচয়িতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-৮৬), নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), হিমাদ্রিকুসুম (১৮৮৭), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮) ইত্যাদি রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৮-১৯১৯), অবসর-সরোজিনী—প্রথম ভাগ (১২৮৩), নিশীথচিন্তা (১৮৮৭), নিভৃতনিবাস (১৮৮৮) প্রভৃতি রচয়িতা রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪), এবং কবিকাহিনী (১৮৭৬), মানসবিকাশ এবং মহাপ্রস্থান কাব্য (১২৯৪) রচয়িতা দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-৯৯)। অন্যান্য কবিতা-রচয়িতার মধ্যে এই কয়জনের নাম করিতে পারা যায়—ভুবনমোহিনী প্রতিভা (প্রথম ভাগ—১৭৯৭ শকাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ—১৭৯৯ শকাব্দ), আর্য্যসঙ্গীত বা দ্রৌপদীনিগ্রহ কাব্য (১২৮৬) ইত্যাদি রচয়িতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈরাগ্যবিপিনবিহার কাব্য ইত্যাদি রচয়িতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, হেলেনা কাব্য (১৭৯৯ শকাব্দ), মিত্রকাব্য (প্রথম খণ্ড—১৮৭৪, দ্বিতীয় খণ্ড—১৮৭৭), ভারতমঙ্গল ইত্যাদি রচয়িতা আনন্দচন্দ্র মিত্র এবং মেনকা (১৯৩১ সংবৎ), ললিতাসুন্দরী ইত্যাদি রচয়িতা অধরলাল সেন।

ব্যঙ্গকাব্য-রচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। ইঁহার ভারত-উদ্ধার (১৮৭৭) উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গকাব্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই সময়ে কয়েকজন মহিলা কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর ও বনফুল (১৮৮০), নীহারিকা (প্রথম ভাগ—১৮৯৩, দ্বিতীয় ভাগ—১৮৯৬) ইত্যাদির রচয়িত্রী প্রসন্নময়ী দেবীর নাম অগ্রগণ্য।

৪৮

আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতা

ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা লইয়া কাব্য-রচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার অনুসরণে যে-সকল ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইতিমধ্যে গদ্যে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা চলিত হওয়ায় ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-কাব্যের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। পরবর্ত্তী কালের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক কাব্য—রঙ্গলালের রচনা ছাড়া—হইতেছে নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ।

নূতন করিয়া আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার পত্তন করিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ইহাতে ইতিহাস-কাহিনীর পরিবর্ত্তে কাল্পনিক রোমান্টিক গল্প অবলম্বন করা হইল। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইঁহার উৎসাহ বালক রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাবিকাশের পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্রের কবিপ্রতিভায় চমৎকারিত্ব না থাকিলেও রচনায় স্বচ্ছতা, কুণ্ঠাহীনতা ও প্রাচুর্য্য ছিল যথেষ্ট। ইনি বহু কবিতা ও গান ক্ষিপ্রকারিতা-সহযোগে রচনা করিতেন কিন্তু "নিজের এইসকল রচনা-সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমতা ছিল না।"

অক্ষয়চন্দ্রের উদাসিনী (১৮৭৪) কাব্যের বিষয়ে পার্নেল্-এর হার্মিট্ কাব্যের প্রভাব আছে। কাব্যটি সেকালে সমাদর পাইয়াছিল। ইঁহার অপর সম্পূর্ণ কাব্য হইতেছে ভারতগাথা (দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯০০)। ভারতবর্ষের ধারা-বাহিক ইতিহাসের স্থূল মর্ম্ম এই বিদ্যালয়-পাঠ্য কাব্যটিতে বর্ণিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৫৬-৯৭) যোগেশ (১৮৮১) কাব্য রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাব্যটিতে কবির নিজের হৃদয়বেদনা প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ইঁহার অপর কাব্যগ্রন্থ হইতেছে চিত্ত-মুকুর (১২৮৫), বাসন্তী (১৮৮০) ও চিন্তা (১৮৮৭)।

রঙ্গমতী (১৮৮০) কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন স্কটের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

গাথা-কবিতা-রচনায় অক্ষয়চন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার ভ্রাতা কিশোর রবীন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারীর গাথা (১২৯৭) কাব্যের কোন কোন কবিতার ছন্দে বিহারীলালের অনুসরণ আছে।

৪৯

বঙ্কিমচন্দ্র

নৈহাটির নিকটে কাঁটালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন) তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চারি ভাই ছিলেন—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন এবং সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগে ভর্ত্তি হন। এই কলেজ হইতে তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স্ এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি.এ. পরীক্ষায় তাঁহার সহিত যদুনাথ বসুও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি.এ. পাশ গ্রাজুয়েট। এগার বৎসর পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এল্. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

হুগলী কলেজে পড়িবার সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা শুরু হয়। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শে কবিতা লিখিতেন। কয়েকটি কবিতা ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক হইতেছে 'ললিতা তথা মানস'। এই দুইটি স্বতন্ত্র কাব্য একত্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবিতা-রচনায় তেমন খ্যাতি-লাভ না হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যসাধনা ছাড়িয়া দেন, এবং কিছুদিনের জন্য সাহিত্যচর্চাও বন্ধ রাখেন। তাহার পর তিনি উপন্যাস-রচনায় হাত দিলেন। সে-যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত তিনি প্রথমে ইংরেজীতে হাত পাকাইতে লাগিলেন। ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি রাজমোহন্স্ ওয়াইফ নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসটি পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফীল্ড নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজীতে যতই দখল থাকুক না কেন বাঙ্গালীর মনের ভাব বাঙ্গালাতেই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায়। বিদেশী ভাষায় রচনা ভাল হইলে প্রশংসা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতিভা এতদিনে আপনার

পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় উপন্যাস-রচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে সহসা এক অপূর্ব রসভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। তাহার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী বাহির হইল। ১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা বাহির করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। বঙ্গদর্শনের প্রথম চারিখণ্ড মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার পর ইহার সম্পাদনের ভার পড়ে তাঁহার মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের উপর। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই বইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—বিষবৃক্ষ (১২৭৯), ইন্দিরা (ঐ চৈত্র), যুগলাঙ্গুরীয় (১২৮০ বৈশাখ), সাম্য (১২৮০-৮১), চন্দ্রশেখর (ঐ), কমলাকান্তের দপ্তর (আরম্ভ—ভাদ্র ১২৮০), কৃষ্ণচরিত্র (১২৮১), রজনী (১২৮১-৮২), রাধারাণী (কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১২৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১২৮২), রাজসিংহ (১২৮৪-৮৫), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১২৮৭), আনন্দমঠ (১২৮৭-৮৯), এবং দেবী-চৌধুরাণী (আরম্ভ—পৌষ ১২৮৯, পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ)। নবজীবন পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৭) এবং প্রচার পত্রিকায় সীতারাম (১৮৮৮) প্রকাশিত হইয়াছিল। সীতারাম বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অন্যান্য গদ্যরচনা লোক-রহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (দুই ভাগ) ইত্যাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালে (অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) ৩০শে চৈত্র তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

ইংরেজী রোমান্‌সের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় যে উপন্যাস-রচনার যুগ প্রবর্ত্তন করিলেন আজিও সে যুগের সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। ইংরেজীর অনুসরণ হইলেও বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পূর্ণ দেশী জিনিষ; পাত্র-পাত্রী, দেশ-কাল, ঘটনা-পরিবেশ সবই দেশী। গল্প শোনার বাসনা মানুষের মজ্জাগত। এতদিন বাঙ্গালী বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী, আরব্য-উপন্যাস, হাতেম-তায়ি ইত্যাদি পড়িয়া গল্পের পিপাসা কথঞ্চিৎ মিটাইয়াছিল। এখন বঙ্কিমের উপন্যাসে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের মানুষ অপূর্বভাবে রূপায়িত হইয়া স্বপ্নলোকের মধ্যে দেখা দিল; বাঙ্গালীর সাহিত্যপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল। সেই হইতে বাঙ্গালী পাঠকের ভক্তহৃদয়-সিংহাসনে বঙ্কিম অক্ষয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আজ অবধি কোন লেখক বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের হৃদয়রাজ্যে এমন অখণ্ড অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা এতদিন ছিল ভারি চালের, দরবারি ঢঙের। এখন তাহা বঙ্কিমের হাতে পড়িয়া বিশেষভাবে লঘু এবং সর্বথা ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিল। দুর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরী রীতিতে লিখিত হইলেও

বঙ্কিমের লেখনীর নিজস্ব রসস্পর্শ হইতে বঞ্চিত নয়। কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীর ভাষাও মোটামুটি সেইরকমই। বঙ্গদর্শন-প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বঙ্কিম কথ্য-ভাষার ঢঙ মিলাইয়া ও বাক্যের বহর কমাইয়া ছোট করিয়া ভাষাকে নমনীয় এবং সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। ইহা বঙ্কিমের অন্যতর প্রধান কৃতিত্ব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী-শিক্ষিত মনস্বী বাঙ্গালীর প্রধানতম প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিয়াও যে গোঁড়ামি-বর্জন করিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লইয়া হিন্দুশাস্ত্রের সার্থক আলোচনা করা যাইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলন ইত্যাদি গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিষয়েও তিনি সরসভাবে সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে জগতের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রকাশ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের আসনে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ একাধিপত্য আর ঘটে নাই।

উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে তো বটেই, সাধারণ গদ্য সাহিত্যেও বঙ্কিমের ধারা তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী লেখকদিগের অধিকাংশই এড়াইতে পারেন নাই।

৫০

উপন্যাসে বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী ও অনুবর্ত্তী লেখক

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর সমাদর ও প্রসার ঘটিতে লেশমাত্র বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু অনুকারী জুটিতে কিছু দেরী হইয়াছিল। পূর্ব হইতেই কোন কোন লেখক বাঙ্গালায় উপন্যাস সৃষ্টি করিবার প্রযত্ন করিতেছিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত আখ্যায়িকার পথ ধরিয়াছিলেন তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা হইয়াছিল সুদূরপরাহত। আর যাঁহারা ইংরেজী রোমান্সের পথ ধরিয়াছিলেন তাঁহারা কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের (১৮৫৬) দ্বিতীয় গল্প অঙ্গুরীয়-বিনিময় এই ধরণের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রকে দুর্গেশনন্দিনীর বিষয় যোগাইয়াছিল।

সংস্কৃত আখ্যায়িকার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের উপকথা মিশাইয়া উপন্যাস লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন গোপীমোহন ঘোষ। ইঁহার বিজয়বল্লভ (১৮৬৩) বিদ্যাসুন্দরী রীতিতে রচিত হইলেও ঘটনা-সংস্থানের দিক্ দিয়া উপন্যাসের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে বলা চলে।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-লেখকরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে অবতীর্ণ হইবার পরে যে দুই-একজন লেখক তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম অগ্রগণ্য—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫-৯১)। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে প্রতাপচন্দ্র বঙ্গাধিপ-পরাজয় (প্রথম খণ্ড—১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড—১৮৮৪) রচনা করেন। এই সুবৃহৎ উপন্যাসটিতে ইতিহাসের মর্য্যাদা যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে এবং দেশকালানুগত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভাষা নীরস ও অমসৃণ বলিয়া এবং বর্ণনাপ্রাচুর্য্য থাকায় উপন্যাসটিতে রসসৃষ্টি ব্যাহত হইয়াছে।

বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকারা রোমান্সের রস-লোকের অধিবাসী। সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখসুখের ঊর্দ্ধে তাহাদের জীবনস্রোত শুধু প্রেমের খাতেই বহিয়া চলিয়াছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতায় (জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় ১২৭৯, পুস্তকাকারে ১২৮১) আমরা পল্লীবাসী দরিদ্র ভদ্র বাঙ্গালীর সাংসারিক দুঃখসুখের ঢেউখেলানো অনুজ্জ্বল জীবনের প্রথম পরিচয় পাইলাম। এই পরিচয় অসম্পূর্ণ হইলেও বাস্তব এবং মনোরম। উপন্যাসটির অধিকাংশ ভূমিকার পরিকল্পনা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

তারকনাথের অপর উপন্যাস ও গল্পপুস্তক হইতেছে হরিষে বিষাদ, তিনটি গল্প (১২৯৫) ও অদৃষ্ট (১২৯৮?)।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৫-৮৯) গল্প ও উপন্যাস-রচনায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছিলেন। ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে ইনি ভ্রমর নামে মাসিকপত্রিকা বাহির করেন। ভ্রমরের প্রথম দুই সংখ্যায় ইঁহার দুইটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর আষাঢ় মাস হইতে কণ্ঠমালা (পুস্তকাকারে ১৮৭৭) বাহির হইতে থাকে। দ্বিতীয় উপন্যাস মাধবীলতা বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল (১২৮৫-৮৭)। ইঁহার অপর উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে জাল প্রতাপচাঁদ (বঙ্গদর্শন, ১২৮৯) ও পালামৌ (ঐ ১২৮৭-৮৯)।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাভঙ্গির অসাধারণতা হইতেছে কৌতুকদীপ্ত লঘুত্ব। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের উপযুক্ত ক্ষমতা ও রসদৃষ্টি ইঁহার ছিল, কেবল ছিল না উদ্যম এবং সাধনা। তাই প্রতিভার তুলনায় ইঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি অপ্রচুর ও অগভীর।

ইঁহাদের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রও গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ইঁহার মধুমতী (বঙ্গদর্শন—বৈশাখ, ১২৮০) আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প। শৈশব-সহচরী উপন্যাসও (১৮৭৮) প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল (১২৮২-৮৪)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনুগত লেখকদিগের মধ্যে উপন্যাস-রচনায় রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সবিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের অনুরোধেই ইনি বাঙ্গালা উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গ-

বিজেতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অপেক্ষা ইঁহার সামাজিক উপন্যাস দুইটি—সংসার (১২৯৩) এবং সমাজ (১৩০০)—অধিকতর উপাদেয়। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১২৮৪), জীবন-প্রভাত (১২৮৫) ও জীবন-সন্ধ্যা (১২৮৬) যথাক্রমে আকবর, শাহ্‌জাহান, আরংজেব ও জাহাঙ্গীরের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। শতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনা এই চারিটি উপন্যাসের বিষয় বলিয়া এগুলি একত্র 'শতবর্ষ' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৮৭৯)।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) সাহিত্যের নানা বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তবে উপন্যাস-গল্পেই ইঁহার কৃতিত্ব সমধিক পরিস্ফুট। শিক্ষিত-সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া ইঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস স্নেহলতা (১২৯৯) রচিত। স্বর্ণকুমারীর অপর উপন্যাস হইতেছে দীপনির্বাণ (১৮৭৬), ছিন্ন-মুকুল (১৮৭৯), হুগলীর ইমামবাড়ী (১২৯৪), কাহাকে? (১৮৯৮) ইত্যাদি।

কপালকুণ্ডলার উপসংহাররূপে মৃন্ময়ী (১৮৭৪) লিখিয়া দামোদর মুখোপাধ্যায় (১২৫৯-১৩১৬) পাঠকসমাজে পরিচিত হন। তাহার পর বিমলা (১৮৭৭), দুই ভগিনী (১৮৮১), সোনার কমল (১৯০৩) প্রভৃতি উপন্যাস বাহির হয়। দামোদরের বাস্তবদৃষ্টি ছিল। কিন্তু কাহিনীর চমৎকারিত্বের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়ায় বাস্তবতা কতকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দামোদর দুই-একখানি ইংরেজী উপন্যাসকেও বাঙ্গালা-রূপ দিয়াছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন —মেজ বৌ (১৮৭৯), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯) ইত্যাদি। শিক্ষামূলক হইলেও লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও সহৃদয়তা উপন্যাসগুলিতে রসসঞ্চার করিয়াছে।

বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক কাহিনীর লেখক হিসাবে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনি গার্হস্থ্যবিষয়েও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে লীলা (১৮৯২) উল্লেখযোগ্য। ইঁহার প্রথম উপন্যাস পর্বতবাসিনী (১২৯০)। নগেন্দ্রনাথ কয়েকটি ভাল ছোট-গল্প লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক ডিটেক্‌টিভ গল্পরচনাও ইঁহার অন্যতম কৃতিত্ব।

শক্তিকানন (১৮৮৭), ফুলজানি (১৮৯৪), বিশ্বনাথ (১৮৯৬) প্রভৃতির লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (? -১৩১৫) রোমাঞ্চক উপন্যাসে বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের অতীত-দিনের পল্লীচিত্র এই রোমান্সগুলির রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে।

অন্যান্য উপন্যাস-লেখকের মধ্যে এই কয়জনের নাম করা যাইতে পারে —শরৎচন্দ্র (১৮৭৭), বিরাজমোহন (১৮৭৮) প্রভৃতি রচয়িতা দেবীপ্রসন্ন

রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০); গিরিজা (১৮৮২), সুহাসিনী (১৮৮২) ইত্যাদির রচয়িতা তারকনাথ বিশ্বাস, আঙ্কল্ টমস্ ক্যাবিনের অনুবাদক, মহারাজ নন্দকুমার (১৮৮৫), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬) প্রভৃতির লেখক চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬); কনে বউ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯৭), প্রেমপ্রতিমা ইত্যাদির রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং দুটি ভাই (১২৯১), রায় মহাশয় (১৮৯২) প্রভৃতির রচয়িতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যঙ্গ-উপন্যাসের সূত্রপাত করেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পতরু (১২৮১) লিখিয়া। ইঁহার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন সুলভ সাপ্তাহিক পত্র 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১২৬১-১৩১২)। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মডেল ভগিনী (১৮৮৬-৮৮) এককালে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষকে উদ্দেশ করিয়া ইঁহার উপন্যাস ও ব্যঙ্গচিত্রগুলি অঙ্কিত।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে সুবৃহৎ রোমাণ্টিক উপন্যাস শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৩০৩-০৯)। শতবর্ষ-পূর্বেকার বাঙ্গালী-জীবনের আংশিক প্রতিচ্ছবি বইটিকে মূল্যবান্ করিয়াছে।

৫১

বিবিধ গদ্যলেখক

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন সেকালে বহু গদ্যলেখককে উৎসাহিত করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে মুখ্য হইতেছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৮৮৬), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৬-১৩০৭), রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭), চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শনের আদর্শে যে দুই-একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাতেও কয়েকজন ভাল গদ্যলেখক লিখিতেন। বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরী রীতিতে নীতিগর্ভ চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আর্য্যদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (?-১৯০৪) কতিপয় পাশ্চাত্য মনীষী ও রাষ্ট্রনেতার উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিয়াছিলেন ওজস্বী ও গাঢ়বদ্ধ ভাষায়।

ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাখ্যানে ও বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় নেতা সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সরল ও প্রসন্ন ভাষায় লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় ইঁহার বহু ব্যাখ্যান, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, পত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনিই প্রথম ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী অতি উপাদেয় বই।

কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বক্তৃতা ও ধর্ম্মব্যাখ্যানের ভাষা সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। কেশবচন্দ্রের আত্মীয় অনুচরদিগের মধ্যেও কয়েকজন ভাল লেখক ছিলেন—"চিরঞ্জীব শর্ম্মা" অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (?-১৩২২), কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫), গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ইত্যাদি।

ব্রাহ্মসমাজের অপর বিশিষ্ট গদ্যলেখক হইতেছেন—শিবনাথ শাস্ত্রী ও চন্দ্রশেখর বসু।

ইতিহাস-জীবনীতে রজনীকান্ত গুপ্তের (১৮৪৯-১৯০০) খ্যাতি সর্বাধিক। সাহিত্যসমালোচনায় উল্লেখযোগ্য হইতেছেন চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১২৫৬-১৩২৯), ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) ও পূর্ণচন্দ্র বসু।

৩২

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ী শিক্ষা-দীক্ষায় ও ঐশ্বর্য্য-বদান্যতায় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের দীপ্তির ও ভোগবিলাসের আড়ম্বরের জন্য এই বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) বিলাতে "প্রিন্স" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠা যেমন গভীর ছিল, সাংসারিক বুদ্ধি, দৃঢ়চিত্ততা ও দূরদর্শিতা তেমনই প্রবল ছিল। দেশের লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাকে "মহর্ষি" আখ্যা দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেকালের ব্রাহ্মসমাজের মূলস্তম্ভ ছিলেন। সমাজসংস্কার কার্য্যে ইঁহার প্রবল আগ্রহ ও উদ্যোগ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন আচারব্যবহারের মধ্যে যেগুলি নির্দোষ ও শোভন তাহা পরিত্যাগ করিতে ইনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই কারণে কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ স্বতন্ত্র হইয়া পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলে দেবেন্দ্রনাথ সমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবর্ত্তন (১২৫০) ইঁহার বিশিষ্ট কীর্ত্তি। ইঁহার বাঙ্গালারচনার কথা বলিয়াছি।

দেবেন্দ্রনাথের সন্তান-সৌভাগ্য ছিল অসাধারণ। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা পূর্বে বলিয়াছি। উচ্চ-দর্শনকথা সরল ভাষায় সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার যে দুরূহ শক্তি তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল। মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) ছিলেন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে প্রথম সিভি-

লিয়ান। ইনিও সুসাহিত্যিক ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও অবরোধ-মোচন-বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কাহারো অপেক্ষা কম নহে। ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙ্গালী নারীর আধুনিক সুরুচিসঙ্গত বেশ প্রথমে ইনি ও ইঁহার স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৮-১৯২৫) প্রতিভা ছিল নানামুখী; কবিতা, গান ও নাট্যরচনা হইতে সঙ্গীতকলা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দক্ষতা ও অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গীত- ও সাহিত্য-চর্চার মূলে প্রধানতঃ ইঁহার এবং ইঁহার পত্নীর প্রেরণা ছিল। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মহিলা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতী পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার সাহিত্যসৃষ্টির কথা যথাস্থানে বলা গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) মত এমন বিচিত্র ও উত্তুঙ্গ প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত কোন দেশে দেখা যায় নাই। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রদের মধ্যেও সুসাহিত্যিকের অভাব ছিল না। গল্পে সুধীন্দ্রনাথের (১৮৬৯-১৯২৯) ও প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের দান উচ্চশ্রেণীর। অল্পবয়সে মৃত্যু না ঘটিলে বলেন্দ্রনাথের লেখনীদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইত। প্রপৌত্র দিনেন্দ্রনাথ (১৮৭০-১৮৯৯) ছিলেন পরম সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরশিল্পী। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র গগনেন্দ্রনাথ (১৮৬৭-১৯৩৮) ও অবনীন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৭১) চিত্রকলায় নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার প্রবর্ত্তক ও গুরু অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গদ্যের এক অভিনব মনোজ্ঞ ভঙ্গি সৃষ্টি করিয়াছেন। ফল কথা, ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশের আচারব্যবহার, জীবনাদর্শ, সাহিত্য, সঙ্গীত, এবং শিল্পকলা নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ীর প্রতিভা শুধু বাঙ্গালাদেশের নহে ভারতবর্ষেরও জাতীয় সংস্কৃতির ও সৌন্দর্য্যবোধের উদ্বোধনে অপরিসীম সহায়তা করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিতচিত্তে যে জাতীয়তাবোধের ও স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা জাগিয়াছিল তাহার মূলেও জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর প্রেরণা অল্প ছিল না।

৫৩

বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগ

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগকে সখের অভিনয়ের যুগ বলা যাইতে পারে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম "সাধারণ" বা পাবলিক থিয়েটার

—ন্যাশন্যাল থিয়েটার—প্রতিষ্ঠিত হইয়া নবযুগের সূচনা করিল। অতএব ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা নাটকের যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হইল বলা চলে।

ঠিক এই সময়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালা-দেশে জাতীয়-জাগরণের উচ্ছ্বাস আসিয়াছিল। অনেককাল পরে কংগ্রেসে যে আবেদন-নিবেদনমূলক জাতীয় আন্দোলন সুরু হইয়াছিল এই আন্দোলনকে তাহার ঠিক পূর্বাভাস বলা চলে না, কেননা ইহা ছিল সক্রিয় এবং গঠনমূলক। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। সাহিত্যে এই নব-জাগরণের আভাস পাওয়া গেল হরলাল রায়ের ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে। তাই ইঁহাদিগকেই বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম স্থান দিতে হয়। ইঁহাদের অনুসরণে অনেক নাট্যকার তাঁহাদের নাটকে দেশপ্রেমের মহিমা খ্যাপন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

হরলাল রায়ের প্রথম রচনা হেমলতা নাটক (১৮৭৩) ইংরেজী রোমাণ্টিক নাটকের ছাঁচে ঢালা। দ্বিতীয় রচনা শত্রুসংহার নাটক (১৮৭৪) সংস্কৃত বেণী-সংহার নাটক অবলম্বনে লেখা। বঙ্গের সুখাবসানে (১৮৭৪) বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্রপাল নাটক (১৮৭৪) ও কনকপদ্ম যথাক্রমে হ্যাম্‌লেট ও অভিজ্ঞানশকুন্তলা অবলম্বনে রচিত। হরলালের নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের প্রথম রচনা হইতেছে—কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২) প্রহসন। পরে ইনি আরও দুইখানি মৌলিকপ্রহসন লিখিয়াছিলেন—এমন কর্ম্ম আর করব না বা অলীক বাবু (১৮৭৭) ও হিতে বিপরীত (১৮৯৬)। ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ের্-এর দুইখানি প্রহসন ইনি বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন—হঠাৎ নবাব (১৮৮১) এবং দায়ে পড়ে দারগ্রহ (১৩০৯)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক চারিখানি—পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪), সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক (১৮৭৫), অশ্রুমতী নাটক (১৮৭৯) এবং স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২)। চারিখানি নাটকেই দেশানুরাগ এবং বিশেষ করিয়া বিদেশীর আক্রমণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পুরুবিক্রম আলেক্‌সান্দরের ভারত-আক্রমণ লইয়া রচিত। ইহার প্রধান ভূমিকা ঐলবিলার চরিত্রে গ্রীক নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সব নাটকেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা হইতেছে নারীর, এবং এই নারী-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে দার্ঢ্য এবং দেশপ্রেম। সরো-জিনী নাটকের প্লট পরিকল্পিত হইয়াছে রাজপুত ইতিহাসের পটভূমিকায়। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস্-এর ইফিগেনীয়া (Iphigenia in Aulis) নাটকের ছায়া এখানে সুস্পষ্ট। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের ক্ষীণ

প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অশ্রুমতী-কাহিনীর পত্তন হইয়াছে প্রতাপসিংহ-মানসিংহের দ্বন্দ্বের পরিণামের উপর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বর্দ্ধমানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া স্বপ্নময়ীর প্লট রচিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন নাটককে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, কেন না কয়েকটি নাম এবং দুই চারিটি অবান্তর ঘটনা ছাড়া প্রায় সবই নাট্যকারের উদ্ভাবনা।

সরোজিনী, অশ্রুমতী এবং স্বপ্নময়ী এই তিনটি নারী ভূমিকার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে। তিনজনেই পিতৃবৎসলা এবং পিতৃস্নেহলালিতা দুহিতা, এবং তিনজনকেই দৈববশে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত পিতৃ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। তাহার ফলে তাহাদের জীবনের পরিণতি হয় নিতান্ত ট্র্যাজিক।

এই তিনখানি নাটকে রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি গান এবং কবিতা গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ গান ও কবিতা স্বপ্নময়ীতে সব চেয়ে বেশী সঙ্কলিত হইয়াছে। স্বপ্নময়ী ভূমিকার পরিকল্পনায়ও রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার প্রভাব নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নয়।

অভিনয়ে আর পাঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্তী একাধিক নাট্যকারের দ্বারা অনুকৃত হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুইটি ইংরেজী নাটকের ও বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কোন ভাল সংস্কৃত নাটকই তিনি বাদ দেন নাই। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১২৭৫)। ইহা তাঁহাদের নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বহুকাল পরে স্বতন্ত্রভাবে এই নাটকটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ফরাসী সাহিত্য হইতেও তিনি অনেক কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের (১২৫৫-১৩০২) সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে (১৮৭৫) নব-উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধ এক নূতন পথ অনুসরণ করিল। গভর্ণমেণ্টের এক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর অত্যাচার ও তাহার বিরুদ্ধে শারীরিক বলপ্রয়োগ এই নাটকটির বিষয়। ইহার পূর্বে লিখিত শরৎ-সরোজিনী নাটকেও (১৮৭৪) দেশপ্রীতির এবং পরাধীনতাবেদনার পরিচয় আছে। এই নাটক দুইটি বাঙ্গালা নাটকরচনায় ও অভিনয়ে নূতনত্ব আনিয়া দিয়াছিল। আধুনিক ইংরেজী "থ্রিলার" জাতীয় গল্পে যেমন অদ্ভুত দুঃসাহস, খুন-জখম-লাঠি-পিস্তল ইত্যাদির অকুণ্ঠ ব্যবহার এবং ঘটনার দ্রুতগতি দেখা যায় এই দুই নাটকের কাহিনীতেও তাহাই পাই। এই কারণে নাটক হিসাবে মোটেই উঁচুদরের না হওয়া সত্ত্বেও বই দুইটি অভিনয়ে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নাটক দুইটির কোনটিই গ্রন্থকারের নামে প্রকাশিত হয় নাই। শরৎ-সরোজিনী "দুর্গাচরণ দাস" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে উপেন্দ্রনাথ

দাসের নাম ছিল প্রকাশক বলিয়া। উপেন্দ্রনাথ অনেককাল পরে আরও একটি নাটক লিখিয়াছিলেন—দাদা ও আমি (১২৯৫)। এ নাটকটি তেমন সমাদর লাভ করে নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং উপেন্দ্রনাথের নাটকের সাফল্য অনেক উদীয়মান নাটকরচয়িতার মনে ঈর্ষ্যাক্ষুব্ধ অশান্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। উমেশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক নাটকে "গ্রন্থ-সম্বন্ধে একটি কথা"-য় তাঁহার পূর্বতন নাটক "বীরবালা"-র উপযুক্ত সমাদর না হওয়া প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "এখনকার রুচি, নায়ককে ডনকুইকসটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমণিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয় কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্ত্তী করা, দুই একটি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নায়ক দ্বারা বা কোন উপায়ে জুতা লাঠি পিস্তল মারা কিম্বা প্রাণে বধ করা, একটি বাঙ্গালী বালিকা কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে কিছুই নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধ-যুক্ত।"

উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ঐতিহাসিক ও গদ্য-লেখক রজনীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা। ইহার প্রথম নাট্যরচনা হেমনলিনী (১৮৭৪)। ইতিহাসের পট-ভূমিকায় উপস্থাপিত হইলেও নাটকটির বিষয় গার্হস্থ্য। বীরবালা নাটকে (১৮৭৫) পুরুবিক্রম কাহিনীর যেন অনুবৃত্তি করা হইয়াছে। আখ্যানবস্তু হইতেছে—গ্রীক ক্ষত্রপ সেলেউকোস ("শিলবক্ষ") এবং চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ, সেলেউকোসের পরাজয়, চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার কন্যা বীরবালার অনুরাগ ও অবশেষে দুইজনের পরিণয়। চাণক্যের ভূমিকা অপ্রধান, এবং নারীচরিত্রগুলি সর্বাংশে বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক (১৮৭৬) নাটকের কয়েকটি ভূমিকা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও নাটকটি ঐতিহাসিক নয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ কৃতী নট-নাট্যকার। ইঁহার নাটক সংস্কৃত অথবা ইংরেজী নাটকের অনুকরণে বা অনুসরণ মাত্র নয়। বাঙ্গালীর জাতীয়প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনি নিজস্ব আদর্শে নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনীর রসে চিরদিনই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙ্গালীর মন কেন, নিখিল ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা যুগে যুগে পুরাণকাহিনীর আদর্শ চরিত্রের ছবি-প্রতিচ্ছবি কাব্যের নাটকে প্রতিবিম্বিত করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পুরাণবর্ণিত অনেকগুলি আদর্শ চরিত্র নূতনভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। মনোমোহন বসুর নাটকে যে ভক্তিরসের প্রথম আবির্ভাব দেখিয়াছি তাহাই গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে গাঢ়তর হইয়াছে। পরমহংস

রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তার হেতু। পাগল, মাতাল, গাঁজাখোর অথবা অনুরূপ নির্লিপ্ত উদাসীন ব্যক্তির ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের নাটকের এক বৈশিষ্ট্য। ইহারও পূর্বাভাস পাইয়াছিলাম মনোমোহন বসুর নাটকে।

শুধু পৌরাণিক কাহিনী নহে, গিরিশচন্দ্র কতিপয় গার্হস্থ্য চিত্র এবং বীররসাশ্রিত ঐতিহাসিক উপাখ্যান লইয়াও অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্রই ভক্তি ও কারুণ্যের বাড়াবাড়ি।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক হইতেছে আনন্দ রহো (১২৮৮)। তাহার পর ইনি সীতার বনবাস, রাবণবধ, সীতাহরণ, লক্ষ্মণবর্জন, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এবং মোহিনীপ্রতিমা, মলিনমালা, মায়াতরু প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেন। ইঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম হইতেছে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮৩), চৈতন্যলীলা (১৮৮৪), বুদ্ধদেব-চরিত (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৮৮৬), প্রফুল্ল (১৮৯১), জনা (১৮৯৩), বলিদান ইত্যাদি। ধ্রুবতপস্যা নাটক (১৮৭৩) অপর এক গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা।

বাঙ্গালীর মন ভক্তি ও করুণ রসে যত সহজে আর্দ্র হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। এই দুই রসের সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র বিশেষ নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রায় আশীখানি নাটক-নাটিকা-গীতিনাট্যে সাত-আট শতেরও উপর বিভিন্ন চরিত্র কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার দক্ষতায় এই বিভিন্ন চরিত্রের অনেকগুলিই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সন্তান। গ্রীক-ট্র্যাজেডি লেখকগণের অথবা শেক্‌স্‌পিয়রের দরের নাট্যকার তাঁহাকে বলা চলে না। তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অনেক সঙ্কীর্ণ ছিল। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসনিষ্ঠ বুদ্ধি উচচ-শিরের স্বাধীনতাকে প্রায়ই সঙ্কুচিত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে তাঁহার নাট্যসৃষ্টি আরও মূল্যবান্ হইতে পারিত।

আমাদের দেশে সাধারণ নাট্যশালা, অর্থাৎ যাহা অবৈতনিক বা সখের থিয়েটার নহে, তাহার প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালার দুইটি নট-নাট্যকার পরস্পর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই দুইজনের একজন হইতেছেন গিরিশচন্দ্র, অপরজন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। গিরিশচন্দ্রের মত অমৃতলালও ছিলেন একধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং যশস্বী নাট্যকার। সরস রচনায় অমৃতলালের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ইঁহার নাট্যগ্রন্থগুলি প্রায়ই লঘুধরণের, হাস্যরসবহুল। অমৃতলালের প্রথম নাটক হইতেছে হীরকচূর্ণ নাটক বা গাইকোয়াড় নাটক (১২৮২)। রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বরোদার গায়কবাড় মলহর রাওয়ের বিচার ও নির্বাসন —এই সমসাময়িক ঘটনা লইয়া নাটকটি লেখা। এই সময়ে আরও দুইজন

নাট্যকার এই বিষয়ে নাটক লিখিয়াছিলেন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রনাথ মিত্র। সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের দৌর্বল্য এবং সাময়িক ঘটনা লইয়া লেখা নক্‌শা ও প্রহসনগুলিতে অমৃতলাল চমৎকার সরসতার অবতারণা করিয়াছেন। বিবাহ-বিভ্রাট (১২৯১), বাবু (১৩০০), একাকার (১৩০১), গ্রাম্যবিভ্রাট (১৩০৪), অবতার (১৩০৮), খাসদখল (১৩১৮) ইত্যাদি প্রহসন অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। অমৃতলালের কতকগুলি প্রহসনের বিষয়বস্তু বিদেশী সাহিত্য হইতে পরিগৃহীত।

এই যুগের পৌরাণিক নাট্যকারদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের পরেই বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের (মৃত্যু ১৯০১) এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-১৮৯৪) নাম করিতে হয়। বিহারীলালের রচিত অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসন অভিনয়ে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইনিও বঙ্কিম-চন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে অভিনয়োপযোগী নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—কাব্য, উপন্যাস এবং নাটক। ইঁহার অনলে বিজলী (১৮৭৮), প্রহ্লাদচরিত্র (১৮৮৪) প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। নাটকে এবং কাব্যে রাজকৃষ্ণের প্রতিভার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় অবস্থা অনুকূল হইলে তাঁহার রচনা উৎকৃষ্টতর হইত।

গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১২৭০-১৩৩৪) পৌরাণিক নাটককে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব হইতে কতকটা মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহার নাটক গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত অতটা লঘু ভক্তিরসসিক্ত নয়। পৌরাণিক মহৎচরিত্রগুলিকে ইনি বুদ্ধির দিক দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের প্রভাব ক্ষীরোদচন্দ্রের কয়েকটি নাটকে সুস্পষ্টভাবে পড়িয়াছে। ইঁহার নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে রঘুবীর (১৩১০), ভীষ্ম (১৩২০), নরনারায়ণ (১৩৩৩) ইত্যাদি। কিন্তু ইঁহার সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনা হইতেছে আলিবাবা (১৩০৪)। এই গীতিনাট্যটি বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে চিরনবীন রহিয়াছে। ইহার পূর্বে ইনি বেদৌরা নাটক (১৩০৩) রচনা করিয়াছিলেন। আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী লইয়া নাট্যরচনার সূচনা গিরিশচন্দ্রের দ্বারা হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাট্যকার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেও এবং ইঁহার চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান প্রভৃতি নাটক অভিনয়ে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও ইনি একখানি—সীতা (১৩০৯)—ছাড়া যথার্থ ভাল নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। প্লটের মধ্যে সরল প্রবাহের অভাব, ভূমিকাগুলির স্বাভাবিক পরিণতির ব্যতিক্রম, স্থান-কাল-পাত্রের বৈসাদৃশ্য এবং কথোপকথনের কৃত্রিমতা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রধান দোষ। ইঁহার সবচেয়ে বিখ্যাত

নাটক—চন্দ্রগুপ্ত—উমেশচন্দ্র গুপ্তের বীরবালা নাটকের প্রায় যথাযথ অনুকরণ।

নাট্যকার বলিয়া যত না হউক কবি এবং বিশেষ করিয়া "হাসির গান" রচয়িতা-রূপে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে একটি সুনির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন।

৩৪

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক এবং কালিদাসের মত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম কবি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে ইঁহার তুল্য বিচিত্রপ্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যশিল্পী আর দেখা যায় নাই। ইনি ভারতবর্ষে বাঙ্গালা দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এবং বোধ করি বিশ্ব-জগতে মর্ত্ত্য পৃথিবীর নাম অমর করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে নিয়মমত এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের হয় নাই। বাল্যে ও কৈশোরে গৃহশিক্ষকদের নিকট এবং পরে নিজের অধ্যবসায়ে ইনি বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাহা ছাড়া জ্যোতিবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রেরও তিনি অল্পবিস্তর চর্চা করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা-লেখার অভ্যাস করেন। নিজের বাল্যকথা এবং সাহিত্যচর্চ্চার গোড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বইটিতে অনবদ্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া একাশী বৎসর বয়সে মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত প্রেরণায় অজস্রভাবে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শুধু কাব্যে নয়, গল্প-উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দান অজস্র ও অসামান্য। তবে কাব্যে—অর্থাৎ কবিতায় এবং গানে—তাঁহার কবিপ্রতিভার মুখ্য ও ধারাবাহিক বিকাশ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার কবিখ্যাতি আর সব খ্যাতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কাব্যসৃষ্টিকালকে তিন যুগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম যুগে কবির চিত্ত অন্তর্মুখীন। হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা এবং তাহা প্রকাশের ব্যাকুলতা এই যুগের কাব্যের ভাবকে অস্পষ্ট ও কুণ্ঠিত আর ভাষাকে ভাবাতুর করিয়াছে। ১২৮২-৮৩ সালে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় প্রকাশিত বনফুল হইতে ছবি ও গান (১৮৮৪) পর্য্যন্ত কাব্যগুলি এই যুগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় যুগে কবির চিত্ত বহির্মুখীন। হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা কাটিয়া গিয়াছে, এবং রূপরসের জগতের ও মানব-হৃদয়ের নব নব সৌন্দর্য্য কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে। কবির কাব্যে প্রতিভা-

সূর্য্য এই যুগে ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্নগগনে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কাব্যের ভাব ভাষা ও ছন্দ বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও শক্তির বর্ণচ্ছটাবিকাশ দেখাইয়াছে। কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) হইতে খেয়া (১৯০৬) পর্য্যন্ত কাব্যগুলি দ্বিতীয় যুগে পড়ে। তাহার পর বলাকা (১৯১৬) হইতে তৃতীয় যুগের আরম্ভ। এই যুগে কবির পরাঙ্‌মুখীন চিত্ত যেন পরকালের ডাক শুনিয়া পিছু ফিরিয়াছে; ধরণীর রূপরস যেন তাঁহার চোখে নূতন মায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছে। পরলোকে নবজন্মের জন্য উৎসুক কবিচিত্তে যেন "মর্ত্ত্যধরার পিছু ডাকা দোলা লাগায় বুকে।" সেইজন্য অতীতের স্মৃতি এই যুগের কাব্যগুলিতে প্রধান স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বনফুল ১২৮৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম গদ্য প্রবন্ধ, সমালোচনা—ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী—প্রকাশিত হয় জ্ঞানাঙ্কুরে ১২৮৩ সালে। বনফুলের পর রচিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী ১২৮৫ সালে বনফুলের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকা বাহির করিলেন। ভারতী পত্রিকার আসরে কবি জাঁকাইয়া বসিলেন; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য বহু রচনা বাহির হইতে লাগিল। সকল রচনার পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র বই লিখিতে হয়, সুতরাং ইহার পর প্রধান প্রধান রচনার কথাই বলিব। ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির অনুকরণে কয়েকটি ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়া ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশ করেন। বাল্যের রচনা হইলেও পদগুলি চমৎকার, এবং বাল্যের রচনার প্রতি কবি যথেষ্ট নির্ম্মমতা দেখাইলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতার প্রতি তিনি একেবারে উদাসীন হইতে পারেন নাই। এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক গীতিকবিতা। বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল সুর গীতিকাব্য—যাহা জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া আবহমান কাল চলিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে নূতন প্রেরণা এবং অপূর্ব রূপায়ন লাভ করিয়াছে—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলির মধ্যে তাহারই আগমনী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশিষ্টতা সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইল। এই হইতে কবি আখ্যায়িকাকাব্য-রচনা ছাড়িয়া দিলেন। তরুণ কবির অপরিণত লেখনীর সৃষ্টি হইলেও কাব্যটির প্রতি সমঝদার সাহিত্যিক-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই; কবি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সংবর্দ্ধনা লাভ করিলেন। তাহার পর প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩) কাব্যে দেখা যায় যে হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা কাটিয়া গিয়া কবিচিত্তে মানবজীবনের বিচিত্র স্নেহ-

সম্পর্ক সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়াছে। ভাষা এবং ছন্দও অনেকটা সংযত ও সংহত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ভারতীতে (১২৮৪-৮৫) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস করুণা প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাঁচা লেখা বলিয়া এটি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। দ্বিতীয় উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট লেখার সময় গদ্য-রচনায় কবির হাত পাকিয়াছে। বৌঠাকুরাণীর হাট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে, এবং তৃতীয় উপন্যাস রাজর্ষি ১২৯৩ সালে। ইতিমধ্যে কাব্য-রচনায় উত্তরোত্তর বিস্ময়প্রদভাবে কবির প্রতিভাস্ফুরণ হইতেছে। কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যে হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা একেবারে কমিয়া গিয়াছে; ভাব সুনির্দ্দিষ্ট এবং ভাষা ও ছন্দ পরিমিত হইয়াছে। তাহার পরে মানসী (১৮৯০) কাব্যে কবির প্রতিভা স্ফুটতর বিকাশ লাভ করিয়াছে; হৃদয়াবেগের বাষ্পাকুলতা কাটিয়া গিয়া ভাবে ও ভাষায় উচ্চ শিল্পসৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। কবির তখন পূর্ণ যৌবন, সেইজন্য প্রণয়ঘটিত কবিতাগুলি মানসীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মানসীর কবিতাগুলি রচনা করিবার সময়ে রাজা ও রাণী নাটক (১৮৮৯) লেখা হয়। বাসনাবিজড়িত প্রেমের সঙ্গে আদর্শগত প্রেমের দ্বন্দ্ব এই কাব্যরসপ্রচুর নাটকটির প্রতিপাদ্য। ইহার পর রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম অংশ অবলম্বন করিয়া তিনি বিসর্জন নাটক (১২৯৬) রচনা করেন। বিসর্জন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি। তাহার কিছুকাল পরে নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) রচিত হয়; ইহার মূল সুর নারীপ্রেমের চরিতার্থতা। তাহার পরে সোনার তরী (১৮৯৪) কাব্য প্রকাশিত হয়। সোনার তরীর অনেক কবিতা পদ্মাতীরে বাস-কালে লিখিত। তাই এই কবিতাগুলির মধ্যে নদীপ্রবাহের অবাধ ঔদার্য্য প্রবহমান। কবিচিত্তে নদীর ও নদীতীরের দৃশ্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট। পৃথিবীর সঙ্গে কবি যেন একটা নাড়ীর টান অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীবলীলার বৈচিত্র্য তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় কবি সাধনা পত্রিকা বাহির করিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা তখন মধ্যাহ্নগগনে আরূঢ়; কবিতায় গানে, গল্পে প্রবন্ধে, নাটকে প্রহসনে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সৃষ্টির প্রাচুর্য্যে অজস্রধারে উৎসারিত হইতে লাগিল। সাধনার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ "গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাঁকাইতে" লাগিলেন।

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নূতন এবং প্রধান ধারার সৃষ্টি করিলেন—ছোট-গল্প রচনা করিয়া। এই ছোট-গল্পের ধারা এখনকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবল বেগে বহিতেছে, এবং একাধিক প্রতিভাবান্ লেখক ছোট-গল্পের মধ্য দিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছোট-গল্প লেখায় হাত দিবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি দুই একজন সাহিত্যিক গল্প লিখিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র উপন্যাস বা "বড় গল্প" জাতীয় রচনা, ছোট-গল্প—ইংরেজীতে যাহাকে বলে "শর্ট ষ্টোরি"—তাহা নহে। বাঙ্গালায় ছোট-গল্পের প্রবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথেরই কীর্ত্তি, এবং তাঁহার ছোট-গল্প আজিও বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরাজিত রহিয়াছে। যথার্থ কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প রচয়িতাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছয়টি ছোট-গল্প প্রকাশিত হইল হিতবাদী পত্রিকায়। তাহার পর সাধনা পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি দুইটি করিয়া ছোট-গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে। চারি বৎসর পরে সাধনা উঠিয়া গেলে ভারতী ও প্রদীপ পত্রিকায়, এবং পরে নব-পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে এবং প্রবাসী পত্রিকায়, এবং আরও পরে সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের বহু ছোট-গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্তও রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।

সোনার তরীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটা বুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিক ভাবের সূচনা হইল। কবির কাব্যপ্রেরণার মূলে যিনি ছিলেন তিনি বা তাঁহার প্রেমই যেন কবিকে ইহজন্মের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এমন কি জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তিনিই যেন তাঁহার সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছেন, এমন একটা ভাব সোনার তরীর কয়েকটি কবিতার মধ্যে স্ফুটভাবে দেখা দিল। ইহার পূর্বে মানসীতে এই ভাবের সূত্রপাত দেখি "মানসী প্রতিমা" কবিতায়। চিত্রা কাব্যে (১৮৯৬) এই ভাব স্ফুটতর বিকাশ লাভ করিল। চৈতালী কাব্যে (১৮৯৬) কবির দৃষ্টি যেন ভারতবর্ষের সুমহান্ অতীতের আদর্শের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। কথা কাব্যে (১৯০০) অতীতকালের মহৎচরিত্রের কাহিনী অঙ্কিত হইয়াছে। কল্পনা কাব্যে (১৯০০) অতীতের রোমান্টিক জীবনের প্রতি কবি আকৃষ্ট হইয়াছেন। মানসী হইতে কল্পনা পর্য্যন্ত এই যে যুগ ইহাকে রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পনৈপুণ্যের প্রথম যুগ বলা যাইতে পারে। ছন্দের বৈচিত্র্যে, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যে, ভাবের সমারোহে এই যুগের কবিতাগুলি অতুলনীয়। গদ্যেও তাহাই দেখি। এই সময়ে লেখা গল্পে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র-ভঙ্গিতে ভাষার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। গদ্যও পদ্যের মত বা ততোধিক সুষমাযুক্ত এবং ছন্দোময় হইয়াছে।

ক্ষণিকা কাব্যে (১৯০০) রবীন্দ্রনাথ সুর বদলাইলেন। ভাষার ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য একেবারে কমিয়া গেল। তখন কবি নিজের মনে যে এক অপূর্ব নিরাবিল উদ্দাম মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই সহজ ভাষায় হালকা ছন্দে অনবদ্যরূপে এই কাব্যের আড়ম্বরহীন লঘুরীতি কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইল। এই কাব্যেরই শেষে যে দুইটি কবিতা আছে তাহাতে কবির আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার পরম কবিত্বময় প্রকাশ দেখা গেল। ক্ষণিকার

এই আধ্যাত্মিক ভাব সোনার তরীর যুগের বুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিকতা নয়। এই ভাবের মূলে আছে গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত ভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম। পরবর্তী কালের অধিকাংশ কাব্যে বিশেষ করিয়া গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪) কাব্যের কবিতা ও গানগুলির মধ্যে এই ভক্তিভাব বিশেষ-ভাবে ঘোরাল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতালীতে ও কল্পনায় ভারতবর্ষের অতীত দিনের প্রতি কবির যে অনুরক্তি দেখা গিয়াছিল তাহা নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১) আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় প্রকাশ পাইল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হওয়ায় কনিষ্ঠ শিশুসন্তানের বেদনা তাঁহার চিত্তকে বাৎসল্য ও করুণ রসে অভিষিক্ত করিল। তাহার ফলে শিশু কাব্যের (১৯০৩) অপূর্ব কবিতা-গুলির উৎপত্তি। ক্ষণিকার আধ্যাত্মিক ভাব খেয়া কাব্যে (১৯০৬) আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যেন একটু ক্ষীণ বিষাদের ভাব মিশিয়া রহিল। তাহার পর গীতাঞ্জলি (১৯১০)। গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও ইহার ও অন্যান্য কাব্যের কতকগুলি কবিতা এই নামে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ায় সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলির ও গীতিমাল্যের অনেকগুলি গানে ও কবিতায় বাউল-গীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর কবি রূপকনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। রাজা (১৩১৭) নাটকে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক অভিসার রূপকারূঢ় হইয়াছে। অচলায়তনে (১৯১১) ধর্ম্মসাধনার বাহ্যরূপের ছবি পাই। ডাকঘরে (১৯১২) কবির চিত্তগহনের অস্ফুট অধ্যাত্ম আকুতি মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

রাজর্ষির পর রবীন্দ্রনাথ বহুকাল উপন্যাস-রচনায় হাত দেন নাই। ১২৯৮ হইতে ১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত সময়টা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প ও প্রবন্ধ রচনার যুগ বলা যাইতে পারে। এইগুলি প্রধানত হিতবাদীতে, সাধনায় এবং ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ সালে কবি নব-পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ সালে তাহা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস—চোখের বালি এবং নৌকাডুবি—বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা উপন্যাসরচনায় এখন যে পদ্ধতি চলিতেছে—অর্থাৎ সামাজিক-সংস্কার-নিরপেক্ষ ভাবে পাত্র-পাত্রীর মানসলোকের বিবর্ত্তন ও বিশ্লেষণ —তাহার সূত্রপাত হইল চোখের বালিতে। ষষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোরা প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৪-১৬)। গোরার ভাষা পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকটা হালকা ছাঁদের। তাহার পর প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) কবির জীবন-স্মৃতি বাহির হইল। ইহার রচনারীতি গোরার ভাষা হইতে আরও নিরাড়ম্বর, আরও মধুর। জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ।

ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক কবিতারচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পয়ার-মূলক সিঁড়িভাঙ্গা ছন্দে গভীর অনুভূতিপূর্ণ ও আত্মচিন্তাত্মক কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন ; ভাবের গভীরতায় এবং ভাষার দীপ্তিতে যেন সোনার তরীর যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। কথ্যভাষার ছাঁদে তিনি অনেকগুলি গল্প এবং দুইটি উপন্যাসও রচনা করিলেন। উপন্যাস দুইটির নাম ঘরে বাইরে (১৯১৬) এবং চতুরঙ্গ (১৯১৬)। এ যুগের অধিকাংশ লেখা প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্রে (১৩২১) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সবুজপত্রে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বলাকা কাব্যে গ্রথিত হইয়াছে। ভাবের ঐশ্বর্য্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে বলাকা (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম। এই কাব্যে বৃহত্তর জগতের অর্থাৎ বিশ্বের বিবর্ত্তন বা গতিছন্দের মর্ম্মকথা মূল-সুর হিসাবে অনুরণিত হইয়াছে। তাহার পরে পলাতকা কাব্যে (১৯১৮) কতকগুলি কাহিনীর অংশ বলাকার সিঁড়িভাঙ্গা ছন্দে লেখা হইয়াছে। শিশু ভোলানাথ কাব্যে (১৯২২) শিশু কাব্যেরই ভাবের অনুবৃত্তি হইয়াছে, তবে এখানে আধ্যাত্মিকতা সুস্পষ্ট। পূরবী কাব্যে (১৯২৫) আবার পূর্ব্বতন রচনার ঔজ্জ্বল্য ও গাঢ়তা ফিরিয়া আসিল। বলাকা এবং পূরবী কাব্য দুইটি রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পনৈপুণ্যের দ্বিতীয় যুগের নিদর্শন। এই সময়ে কবি দুইটি রূপক-নাট্য লিখিয়াছিলেন—মুক্তধারা (১৯২২) ও রক্তকরবী (১৯২৪)। নাটক দুইটিতে পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতা ও প্রচণ্ড ধনলোভের উপর মানুষের সর্বজনীন কল্যাণবুদ্ধির ও ত্যাগশক্তির জয় ঘোষণা হইয়াছে। মহুয়া কাব্যে (১৯২৯) নারী-প্রেম ও নারী-চরিত্রের মাধুর্য্যই একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়। পরিশেষ কাব্যে (১৯৩২) যেন ক্ষণিকার লঘুতা ফিরিয়া আসিয়াছে। গদ্য-কবিতাও এখানে প্রথম দেখা গেল। পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬) এবং শ্যামলী (১৯৩৬) গদ্য-কাব্য। গদ্য-কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল নাই এবং পংক্তির সুনির্দ্দিষ্ট যতিবিভাগ নাই, গদ্যকে পদ্যের মত সাজাইয়া পড়িলে যেমন হয় কতকটা যেন তাহাই। পূর্বে লিপিকা (১৯২২) বইটিতে এই ধরণের রচনা সঙ্কলিত হইয়াছিল। তবে সেগুলি পদ্যের মত পংক্তি ধরিয়া সাজানো ছিল না। বিচিত্রিতা কাব্যের (১৯৩৬) কবিতাগুলি কয়েকটি ছবির ব্যাখ্যারূপে লেখা হইয়াছে। বীথিকা কাব্য (১৯৩৫) সাধারণ রীতিতে লেখা। নিদারুণপীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রান্তিক (১৯৩৮) রচনা করেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কবিচিত্তের বিচিত্র অনুভূতি এই কবিতাগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার পর যথাক্রমে আকাশপ্রদীপ (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যা (১৯৪০) ও আরোগ্য (১৯৪১) কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শেষ প্রকাশিত কাব্য হইতেছে জন্মদিনে।

সবুজপত্রের যুগের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ এই সব উপন্যাস ও বড় গল্প লিখিয়াছেন—যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪)। শেষের কবিতায় কবি এক নূতন ঢঙের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পদ্যের মশলা মিশ্রিত এই গদ্য রচনাটিকে বাঙ্গালায় চম্পূকাব্য বলা যাইতে পারে। এই কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গি শাণিত ইস্পাতফলাকার ন্যায় উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। শেষকালে রচিত তিনটি ছোট-গল্প তিন সঙ্গী (১৯৪০) নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

শুধু সাহিত্যসৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়াবহ বিচিত্র প্রতিভা পর্য্যবসিত হয় নাই। ইন্দ্রধনুর মত পেলব ও বর্ণবহুল সুর-সৃষ্টির প্রাচুর্য্যে তাঁহার সুগভীর রসানুভূতির ও অপরূপ আত্মবিকাশের আর একটি প্রধান উৎসমুখের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে চিরন্তন শিল্পরূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর তাঁহার গানে সুরে তাঁহার রসসিদ্ধি প্রকৃতির ঋতুচক্রের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া বাঙ্গালীর রসের ভোজের দুর্লভ ভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অখণ্ড জীবনের কবি। শুধু চোখ মেলিয়া নয় কান পাতিয়াও তিনি পরিপূর্ণ জীবনরস আস্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তের ক্ষুধা মিটিত রূপরসের জগৎকে চোখে দেখিয়া, আর তাঁহার আত্মার পরিতৃপ্তি হইত শব্দরসের অভিষেকে। কবির কথায়

> গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
> তখন তারে জানি আমি তখন তারে চিনি।

রবীন্দ্রনাথের বাক্-বৈদগ্ধ্য তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্ট। নিজের হাতে ভাষা তৈয়ারী করিয়া প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টিকার্য্যে এমন চরম সার্থকতা লাভ আর কোন দেশে কোন কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে নূতন শ্রী আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কবিতার ছন্দে রীতিতে ও ভাবে, গানের কথায় ও সুরে, গদ্যের প্রকাশক্ষমতায় এবং লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালা দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতবর্ষে তো বটেই, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আজ অবধি রবীন্দ্রনাথের মত আর কোন লেখক একাকী কোন ভাষায় এমনভাবে যুগপৎ শক্তি এবং মাধুর্য্য সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। উপনিষদের ও কালিদাসের কবিতার—বিশেষ করিয়া মেঘদূতের—কবি ছিলেন অসাধারণ ভক্ত। উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ধর্ম্ম ও কাব্য সাহিত্যের সহিত

তাঁহার ধারাবাহিক পরিচয় ছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। সে শ্রদ্ধা গতানুগতিক ব্যবহার নয়, তাহা অন্তরের গভীর উপলব্ধি হইতে উৎসারিত ভক্তি। সেকালে তপোবনে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচারী বালকেরা শিক্ষালাভ করিত। সেই আদর্শের অনুসরণে কবি বোলপুরের নিকটে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয় এখন বিশ্বভারতীতে বিরাট পরিণতি লাভ করিয়াছে। এখানে স্কুল-কলেজের বিদ্যাচর্চা, প্রাচ্যভাষা- ও ধর্ম্ম-বিষয়ক গবেষণা, এবং সঙ্গীত ও চিত্র-কলার অনুশীলন হইয়া থাকে। বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংলগ্ন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও উটজ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্বভারতী এখন ভারতবর্ষে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অনুশীলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বিশেষত্ব—অর্থাৎ যাহাতে পূর্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবি হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়—তাহা হইতেছে এই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিষয়বস্তু—তাহা বহিঃপ্রকৃতি হউক অথবা কোন ভাব বা আইডিয়া হউক—কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে সেই অনুভূতিরই প্রকাশ। পূর্ববর্ত্তী কবিদিগের কাব্যে বিষয়বস্তুরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত কাব্যধারায় কবি-চেতনা বিষয়বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া এক অখণ্ডরূপ লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বের কাব্যরীতিতে কবিচিত্ত বিষয়বস্তু হইতে স্বতন্ত্র অথচ সাঁপেক্ষ হইয়া দর্পণের মত শুধু আদর্শ প্রতিবিম্বিত করিত; রবীন্দ্রনাথের রীতি হীরকখণ্ডের মত বস্তু-নিরপেক্ষ হইয়া অপূর্ব বর্ণচ্ছটা বিকীরণ করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিকে রোমান্টিক বলা চলে, কিন্তু তাঁহার রোমান্টিক প্রকৃতির মধ্যে একটা বিরাট আদর্শের সুস্পষ্টতা আছে। আমাদের দেশের বাউল দরবেশ কবীরপন্থী ইত্যাদি সহজ-সাধকদিগের রসদৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির কতকটা সাম্য আছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে "মিষ্টিক" বা আধ্যাত্মিক কবিও বলা যায়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। এখনকার দিনে সাহিত্যিকের এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি জগতের সর্বোচ্চ সম্মান। ইহার অল্প কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে "ডক্টর্ অব্ লিটারেচার" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাহার পর দেশে বিদেশে—বিশেষ করিয়া ইউরোপে—ইনি যেরূপ অভূতপূর্ব সম্মানলাভ করিয়াছেন তাহা আর কোনো কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই। আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে শুধু শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া নহে, জ্ঞানগুরু আচার্য্য বলিয়াও অপরিসীম শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

৩৫

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে কিংবা তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইহা প্রবলতর হয় এবং অচিরবিলম্বে পূর্বতন পদ্ধতিকে অপ্রচলিত করিয়া দেয়। আধুনিক ইংরেজী কবিতার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাববর্জিতভাবে বাঙ্গালা কবিতা রচনা করা এখন অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান্ সমসাময়িকদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫-১৯২০) কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তেমন পড়ে নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে ঘরোয়া-ভাব ও স্নেহ-ভক্তির নিতান্ত সরল প্রকাশ লক্ষণীয়। ভারতী পত্রিকার প্রথম যুগে উহাতে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। ১২৮৭ সালে ইঁহার উর্ম্মিলা কাব্য, ফুলবালা ও নির্ঝরিণী প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে অশোক-গুচ্ছ (১৩০৮) ও গোলাপগুচ্ছ (১৯১২)।

কোন কোন হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সমধর্ম্মী ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮)। দাম্পত্য-প্রেম উভয় কবিরই কাব্যপ্রতিভার প্রধানতম উৎস। গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন "স্বভাবকবি" বলিতে যাহা বুঝায় কতকটা তাই। ইঁহার কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুঙ্কুম (১২৯৮), কস্তুরী (১৩০২), চন্দন (১৩০৩), ও ফুলরেণু (১৩০৩)।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮) বিহারীলালের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন বলা যায়। তথাপি ইঁহার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে অলক্ষ্য নয়। নারীপ্রেমের শান্ত রস অক্ষয়কুমারের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব। ছন্দের চাতুর্য্যের দিকে অধিক দৃষ্টি না রাখায় ভাবের প্রকাশ অকুণ্ঠিত হইয়াছে। ভাবাবেগের তীব্রতায় কবি ভাষার উপর সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। অক্ষয়কুমারের প্রথম কাব্য প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। তাহার পর কনকাঞ্জলি (১২৯২), ভুল (১২৯৪), শঙ্খ (১৩১৭) ও এষা (১৩১৯)।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) আলোচ্য সময়ের প্রথম শ্রেষ্ঠ নারী কবি। শৈশব-স্মৃতি অবলম্বনে পল্লীচিত্র এবং কলিকাতার অন্তঃপুরের ছবি ইঁহার কাব্যের অসাধারণ বিশেষত্ব। ভাবে ও ভাষায় এই কবিতাগুলির মধ্যে যে নারী-মানসের স্পর্শ এবং অকৃত্রিম সারল্য দেখা যায় তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যত্র দুর্লভ। ইঁহার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অশ্রুকণা (১২৯৪), আভাষ (১২৯৭), শিখা (১৩০৩), অর্ঘ্য (১৩০৯) ইত্যাদি। ইঁহার প্রথম কবিতাপুস্তক কবিতাহার (১৮৭৩)।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) অল্পবয়সে কবিত্বপ্রতিভার স্ফুরণ দেখাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকিলেও ইঁহার কাব্যে মৌলিকতা আছে। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ আলো ও ছায়া (১৮৮৯) বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইঁহার অপর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পৌরাণিকী (১৩০৮), অশোক সঙ্গীত (১৩১৪), মাল্য ও নির্ম্মাল্য, (১৩২৭) এবং দীপ ও ধূপ (১৯২৯)।

মাতা প্রসন্নময়ীর মত প্রিয়ম্বদা দেবীও (১৮৭১-১৯৩৪) কাব্যরচনায় যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার কবিতার ভাষা সংযত, আকার ক্ষুদ্র এবং ভাব প্রগাঢ়। এই বিষয়ে ইঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ রচনার প্রতিপক্ষ। ইঁহার কবিতা রেণু (১৩০৮), পত্র-লেখা (১৩১৭) অংশু (১৩৩৪) কাব্যে সঙ্কলিত আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যে বিশেষভাবে পড়িয়াছে। তৎসত্ত্বেও কবির নিজস্বতা লুপ্ত হয় নাই।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার কাব্যকলা প্রাচীনপন্থাবলম্বী। কাব্যকুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি (১৮৯৬) ও বিভূতি (১৩৩০) ইঁহার প্রধান কাব্যগ্রন্থ।

সমসাময়িক অপর উল্লেখযোগ্য কবিতাকার হইতেছেন—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শশাঙ্কমোহন সেন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, নিত্যকৃষ্ণ বসু, প্রিয়নাথ সেন, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। নবীনচন্দ্র দাস কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হইবার পূর্বে কাব্যরচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইতেছে আর্য্যগাথা (প্রথম ভাগ ১৮৮২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩)। আষাঢ়ে (১৩০৫), মন্দ্র (১৩০৯), আলেখ্য (১৩১৪) এবং ত্রিবেণী (১৩১৯) পরিপক্ক রচনা। ভাষায় শৈথিল্য এবং ছন্দে স্বাধীনতা সত্ত্বেও ভাবের সরল এবং কবিত্বময় প্রকাশ ইঁহার কবিতাগুলিতে বিশেষ একটু মাধুর্য্যের সঞ্চার করিয়াছে। ইঁহার শ্রেষ্ঠ কৃতি হাসির গান (১৩০৭)।

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) প্রতিভাস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল গানরচনার মধ্য দিয়া। বাণী, কল্যাণী (১৩১১) অমৃত (১৩১৭) ইত্যাদি কাব্যে ইঁহার গান ও কবিতা সঙ্কলিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানত ছন্দঃশিল্পী ছিলেন; বাঙ্গালা ছন্দে তিনি অনেক নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশী কবিতাকে ভাব ও ভাষা সমেত আত্মসাৎ করিতে ইঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের যুগের মধ্যাহ্নসময়ে আবির্ভূত হইয়াও ইঁহার প্রভাব

যথাসম্ভব এড়াইয়া স্বকীয় পন্থায় কাব্যরচনা করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ অসামান্যতা দেখাইয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইতেছে দুইটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা —সবিতা (১৯০০) ও সন্ধিক্ষণ। ইঁহার প্রধান মৌলিক কাব্যগ্রন্থ হইতেছে বেণু ও বীণা (১৩১৩), ফুলের ফসল (১৩১৮), কুহু ও কেকা (১৩১৯), তুলির লিখন (১৩২১), অভ্র-আবীর (১৩২২), ও ইঁহার মৃত্যুর পর সঙ্কলিত বিদায়-আরতি এবং বেলা শেষের গান।

৫৬

গল্প, চিত্র ও প্রবন্ধ

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তন যে সফলতা আনে নাই, সেই সাফল্য গল্পে তাঁহার অনুবর্ত্তীরা লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর সংসারে ও মানসপ্রকৃতিতে ছোট-গল্পের যে চমৎকার উপাদান রহিয়াছে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া দিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুসরণকারী হইতেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নগেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প ঠিক ছোট-গল্পের পর্য্যায়ে পড়ে না বটে, তবে তাঁহার সংগ্রহ (১৮৯২) বইটিতে যে কয়টি চিত্র আছে তাহার মধ্যে দুই একটিকে উৎকৃষ্ট ছোট-গল্পের মর্য্যাদা দিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান গুণ হইতেছে প্লটের চমৎকারিতা এবং বর্ণনার দ্রুতগতি ও আড়ম্বরহীনতা।

রবীন্দ্রনাথের পরেই বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প লেখক হইতেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রভাত-কুমারের প্রথম দিকের গল্পগুলিতে যতটা অনুভূত হয় পরবর্ত্তী রচনায় তেমন নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথাসম্ভব অতিক্রম করিয়া প্রভাতকুমার তাঁহার ছোট-গল্পে নিজের বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভাতকুমারের গল্পে ভাবাবেগ কম এবং কাহিনীর আকর্ষণ বেশী। এক কথায় বলিতে গেলে প্রভাত-কুমারের ছোট-গল্পে বঙ্কিমের রোমান্‌স্‌দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির সুষ্ঠু মিলন হইয়াছে। সরল ও স্বচ্ছন্দ রচনাভঙ্গির তলে তলে প্রচ্ছন্ন কৌতুকপ্রবাহ এবং সমবেদনা গল্পগুলিকে নিরতিশয় সুখপাঠ্য করিয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবনে রোমান্‌সের অবসর নিতান্ত কম। কিন্তু তাহারই মধ্যে যেটুকু দেখা যায় অথবা দেখা যাইতে পারে তাহার স্নিগ্ধ সরস আলেখ্য প্রভাত-কুমারের ছোট-গল্পগুলিতে রমণীয়ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বা বড় গল্পে যে রোমান্‌স্ আছে তাহা আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের নয়; ঐতিহাসিক দূরত্ব এই রোমান্‌স্‌গুলির রমণীয়তা বাড়াইয়াছে। প্রভাতকুমারের ছোট-গল্পের রোমান্‌স্ সমসাময়িক ভদ্র বাঙ্গালী জীবনের রোমান্‌স্, সেইজন্য পাঠক এবং

লেখক উভয় সমাজেই এই গল্পগুলি আদর এবং প্রভাব অসামান্য। প্রভাতকুমারের গল্পের বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে নবকথা (১৩০৬), ষোড়শী (১৩১৩), দেশী ও বিলাতী (১৩১৬) এবং গল্পাঞ্জলি (১৩২০)। প্রভাতকুমার অনেকগুলি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি তাঁহার ছোট-গল্পের উৎকর্ষ পায় নাই। উপন্যাসের মধ্যে স্থানে স্থানে চমৎকার উজ্জ্বল যে চিত্র আছে তাহাতে গল্পের রস জমিলেও কিন্তু সর্বশুদ্ধ প্লটে সংহতি এবং কাহিনীতে স্বচ্ছন্দ প্রবাহ দেখা যায় না। প্রভাতকুমারের উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে নবীন সন্ন্যাসী (১৩১৮)।

প্রভাতকুমারের পর অনেক ভাল ছোট-গল্পলেখক দেখা দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং জলধর সেন। সুধীন্দ্রনাথের গল্পে করুণরস অতি সামান্য আয়োজনে জমিয়া উঠিয়াছে। চরিত্রচিত্রণে সরসতার সঞ্চার সুরেন্দ্রনাথের গল্পের অসাধারণত্ব। ইঁহার রচনাভঙ্গি একান্ত নিজস্ব। জলধরের গল্প করুণরস-প্রধান। ছোট-গল্পের মত সরসভাবে সেকালের পল্লীর কাহিনী বর্ণনায় ও চিত্র অঙ্কনে দীনেন্দ্রনাথ রায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার পল্লীচিত্র (১৩১৩), পল্লীবৈচিত্র্য ইত্যাদি বই গল্পের মত সুখপাঠ্য। ইনি বহু রোমাণ্টিক ও ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধ রচনায় বিশিষ্টতা দেখাইয়াছেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়।

প্রমথ চৌধুরী বাঙ্গালা গদ্যে কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা বিরোধভাস বা paradox-এর প্রাচুর্য্য এই রীতির বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোট-গল্পও রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চার-ইয়ারী কথা (১৯১৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাঙ্গালাসাহিত্যে অদ্ভুতরসের তিনি স্রষ্টা। একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া অবলম্বন করিয়া লুইস ক্যারলের Alice in Wonderland কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে রচিত কঙ্কাবতী উপন্যাসে (১২৯৯) বাস্তব জগতে এবং রূপকথার রাজ্যের সম্ভব-অসম্ভবকে বিশেষ নিপুণতার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা ও ডমরুচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের নব্য আরব্য-উপন্যাস। শিশু এবং বর্ষীয়ান্ সকলেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি হইতে সমান আনন্দ পায়। নিতান্ত স্বল্প আয়োজনে অনাবিল কৌতুকরসের সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের সমানধর্ম্মা লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব অল্পই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের নিতান্ত ঘরোয়া এবং অত্যন্ত সরস লিপিভঙ্গি অনুকরণের

অসাধ্য। ফোক্‌লা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ময়না কোথায় প্রভৃতি উপন্যাসে হাস্য, করুণ এবং বীভৎস রসের দক্ষ সমাবেশ হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা এন্‌সাই-ক্লোপীডিয়া বিশ্বকোষের পত্তন করিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুতরসের প্রবর্ত্তনে সফলকাম হইয়াছেন। অবনীন্দ্র-নাথ আধুনিক ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পিগুরু। প্রাচীন ভারতের লুপ্তশিল্পধারাকে ইনি নূতন খাতে এবং প্রবলতর বেগে প্রবাহিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইঁহার দান অসামান্য। অবনীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভাবে নিজস্ব। ছেলে-দের জন্য ইনি শকুন্তলা (১৩০২), ক্ষীরের পুতুল (১৩০২), রাজকাহিনী ইত্যাদি যে-সকল বই লিখিয়াছেন, তাহার বর্ণনাভঙ্গি বয়স্কদেরও পরম উপভোগ্য। ভূতপতরীর দেশ (১৩২২) এবং খাতাঞ্চির খাতা অপূর্ব অদ্ভুতরসের গল্পের বই। শিশুর অপরিণত মনের উপর বিশ্বের বিচিত্র রূপ ও অনুভূতি যেমন সংলগ্ন এবং অসংলগ্ন ভাবে বিচিত্রতর আলোছায়া ফেলিয়া যায়, ভূতপতরীর দেশেও তেমনি ছড়া ও ছবি, ইতিহাস ও গল্প, জাগরণ ও স্বপ্ন গল্পের ইন্দ্রজাল বুনিয়া চলিয়াছে। রঙে এবং রেখায় যেমন রূপচিত্র, কাগজে এবং কলমেও তেমনি শব্দচিত্র সমান নৈপুণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে অবনীন্দ্রনাথের হাতে। পথে বিপথে (১৩২৫) বইটিতে ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলিবে।

উপন্যাসে, এবং বড় গল্পে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নূতনত্বের অবতারণা করিয়া-ছিলেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রীশচন্দ্রের অনুজ শৈলেশচন্দ্র (?-১৯১৪) গল্পচিত্র-রচনায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারীর (?-১৯২০) শুভবিবাহ (১৩১২) এই ধরণের একটি উৎকৃষ্ট রচনা। যতীন্দ্রমোহন সিংহের উড়িষ্যার চিত্র-ও (১৯০৩) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩০) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শশাঙ্ক (১৩২১), ধর্ম্মপাল (১৩২২), করুণা (১৩২৪) ও ময়ুখ এই চারিটি উপন্যাসে গুপ্ত, পাল ও মোগল যুগের ইতিহাস যেন জীবন্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্র হইলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়েও (১৩২৬) উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। বইটির কথ্যভাষামূলক লিপিভঙ্গি উপভোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে ভারতী পত্রিকাকে আশ্রয় করিয়া একটি তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। ইঁহাদের গল্পে-উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখা গেল। কাহিনীর মধ্যে বস্তুর ভাগ অল্প, অলস রোমান্‌স্‌-কল্পনার

অংশই বেশি। ভাষা যথাসম্ভব কথ্যভাষাশ্রয়ী, তবে অত্যন্ত কাব্যরসসিক্ত সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে বহাইয়া দেওয়া ইঁহাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই গোষ্ঠীর অনেকেই ভাল গল্পলেখক ছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়(?-১৯২৯) ছিলেন ইঁহাদের গোষ্ঠীপতি। এই সম্প্রদায়ের অন্যতর প্রধান লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প-উপন্যাস রচনায় প্রাচুর্য্য ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের অনুসরণ সর্বপ্রথম চারুচন্দ্রই করিয়াছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও ভারতী-গোষ্ঠীর সভ্য ছিলেন।

৫৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আধুনিককালে বাঙ্গালাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসরচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তাঁহার রচনার সমাদরও তেমনি অসম্ভাবিত। শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত (১৩১০) রচনা—মন্দির—১৩০৯ সালের কুন্তলীন পুরস্কার পাইয়াছিল। গল্পটি বেনামিতে বাহির হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় গল্প—বড়দিদি—১৩১৪ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর ১৩১৯ সালের মাঘ মাস হইতে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের আসর রীতিমত জাঁকাইয়া বসেন। সাহিত্য পত্রিকার মাঘ এবং ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় যথাক্রমে বাল্যস্মৃতি ও কাশীনাথ নামক দুইটি গল্প বাহির হইল, এবং ১৩২০ সালের যমুনা পত্রিকায় চন্দ্রনাথ, পথনির্দ্দেশ, বিন্দুর ছেলে, চরিত্রহীন (অংশত) এবং পরিণীতা প্রকাশিত হইয়া লেখকের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। অতঃপর শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসই ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা তিনি ভালভাবেই কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন তাঁহার গল্প-উপন্যাসের কাঠামোয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীর প্রথম পর্ব্বের (১৩২৩) চিত্রগুলিতে তাঁহার বাল্যজীবনের ছবি এবং কিশোরমনের ঘাতপ্রতিঘাত সহৃদয় রসমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। আরও কয়েকটি গল্প-উপন্যাসেও শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনীর আভাস বা রূপান্তর পাওয়া যায়।

বাল্যাবধি শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের ভক্ত পাঠক ছিলেন। তাই তাঁহার প্রথম যুগের রচনায় বঙ্কিমের অনুসরণ দুর্লক্ষ্য নয়। গল্প-উপন্যাসে রোমান্সের ঘন-আবরণও বঙ্কিম-প্রভাব সূচিত করে। যৌবনের পূর্বে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পান নাই। ১৩০৮-০৯ সালে ভারতীতে

ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত নষ্টনীড় এবং চোখের বালি শরৎচন্দ্রকে নূতন দিক নির্দ্দেশ করিল। অতঃপর বিষয়বস্তুতে রবীন্দ্রনাথের গৌণপ্রভাব এবং ভাষায় তাঁহার সজ্ঞান অনুকরণ শরৎচন্দ্রের লেখায় স্পষ্ট অনুভব করা যায়। শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই গুরুতর।

শরৎচন্দ্রের লেখায় যে বিশুদ্ধ ঘরোয়া রোমান্‌স্‌-রস উপচিত হইয়াছে প্রধানত তাহাই সেগুলির অপরিসীম জনপ্রিয়তার হেতু। কিন্তু এই বিশুদ্ধ গল্পরস ছাড়াও এমন একটা নূতনত্ব তাঁহার রচনায় আছে যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট দান বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা হইতেছে সমাজকে প্রচলিত প্রথার দ্বারা নয়, চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি ও সার্বভৌমিক ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে বিচার করা। অন্ধসংস্কার-চালিত সমাজের অনেক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গল্পে-উপন্যাসে সমাজের কৃত্রিম অংশটার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ (১৩২২), অরক্ষণীয়া (১৩২৩) প্রভৃতি বিশিষ্ট গল্পে সমাজের অন্ধ শৃঙ্খলে নিষ্পীড়িত মানুষের দুঃখবেদনার সকরুণ ইতিহাস পাই।

শরৎচন্দ্রের লেখায় ব্যক্তির ও সমাজের সমস্যার ইঙ্গিত আছে কিন্তু সমাধান নাই। সমাধান গল্পের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়, আর শরৎচন্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধ গল্প-লিখিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে কাহিনীর যবনিকার অন্তরালে যে চরম পরিণতির উদ্দেশ পাই তাহা শরৎচন্দ্রের রচনায় একবারেই মিলে না।

শরৎচন্দ্রের গদ্যভঙ্গি গৌণত বঙ্কিমের এবং মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে এমন কয়েকটা গুণ আছে যাহা তাঁহার নিজস্ব। শরৎচন্দ্রের লেখা অত্যন্ত সরল; ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি বাক্যের প্রয়োগ নাই, অথচ ইহা রসহীন কথোপকথনের ভাষা নয়। আসল কথা হইতেছে, শরৎচন্দ্রের ভাষা রোমান্টিক এবং সেন্টিমেণ্টাল বিষয়বস্তুর একান্ত অনুগত।

রবীন্দ্রযুগের মধ্যাহ্নে উদিত হইয়াও শরৎচন্দ্র যে নিজের স্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তারিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক; সাহিত্যশিল্প হিসাবে তাঁহার সব গল্প ও উপন্যাস নিশ্চয়ই নিখুঁত নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব হইতেছে সমাজ-দুর্গের বহিঃপ্রাঙ্গণস্থিত দুঃখী-দরিদ্র-নিপীড়িতের প্রতি অজস্র সহানুভূতি। এই সহানুভূতি বাহিরের তৃতীয় ব্যক্তির নয়, অনুকম্পাও নয়, তাহাদের একজন হইয়া শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি কিছু কম নয়, কিন্তু তিনি একান্ত-

ভাবে কবি, তাঁহার চিত্তের প্রসার অপরিসীম বৃহৎ এবং ব্যাপক; তিনি যে দুঃখ-বেদনা অনুভব করিয়া কাব্যে ও গল্প-উপন্যাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহা তীব্রতামাত্রহীন, তাহা "রস"। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা, তাঁহার রসসৃষ্টিতে আমাদের আত্মার সৌন্দর্য্যবোধ চরিতার্থ হয়, কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জগতের স্থূল মন সব সময়ে সে রসসৃষ্টির নাগাল পায় না। রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে আমরা পাই প্রধানত এবং প্রচুরভাবে জীবনরস। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও এই জিনিষই পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রচুর এবং রোমান্স-তরল রূপে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ জনপ্রিয় রচনায় সাহিত্যের রস যত না আছে, তাহার বেশী আছে গল্পের মোহ। চরিত্র-সৃজনে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, এবং এই ঋণ স্থানে স্থানে হয়ত লঘু না হইয়া বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যেখানে নিজের শুধু অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিয়াছেন সেখানে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট।

শরৎচন্দ্র যাহাদের সুখ-দুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি যেন তাহাদেরই একজন—এই সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের মূল-কথা। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট অপ্রধান চরিত্রগুলির কোন মাহাত্ম্য নাই, তাহারা পাঁচপাঁচি মানুষ, দরিদ্র, ভালমন্দে জড়িত সাধারণ লোক। এই সমাজের সহিতই তাঁহার আত্যন্তিক পরিচয় ছিল বলিয়া ইহাদের কোন কোন ছবি তাঁহার হাতে জলন্তভাবে ফুটিয়াছে এবং পাঠক-সাধারণের মন অনায়াসে হরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে। ধনী বা অভিজাত সমাজের অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের ছিল না, সেই জন্য তিনি যেখানে এই সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন সেখানে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাংসারিক অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের যতটুকু ছিল তাহা গভীর ছিল বটে, কিন্তু ব্যাপক ছিল না। এই কারণে তাঁহার অতগুলি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রায় একই নারী-চরিত্রের এবং দুই তিনটি নর-চরিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখি।

অতি-আধুনিক সময়ে বাঙ্গালাদেশে অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের সাহিত্যপ্রচেষ্টার অবসান এখনও ঘটে নাই, তাই সে আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরের বাহিরে রাখিয়া দেওয়া গেল।

প্রধান প্রধান প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী

বৌদ্ধ গান ও দোহা।

পঞ্চদশ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল(?)।

ষোড়শ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কবীন্দ্রের মহাভারত, শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব, মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, পরমানন্দের শ্রীকৃষ্ণলীলাকাব্য, ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও দুর্ল্লভসার, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধপর্ব, রঘুনাথের অশ্বমেধপর্ব।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ও কালিকাপুরাণ, মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল, মাধব আচার্য্যের গঙ্গামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কবিবল্লভের রসকদম্ব, নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস, "দুঃখী" শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, কবিশেখরের গোপালবিজয়।

সপ্তদশ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কাশীরামের মহাভারত, গুরুচরণদাসের প্রেমামৃত, যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দ, বিদগ্ধমাধব, দানকেলিকৌমুদী ও গোবিন্দলীলামৃত, গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল, দৌলৎ কাজীর সতী ময়নামতী, রাজবল্লভের বংশীবিলাস, গতিগোবিন্দের বীররত্নাবলী।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—গোপীবল্লভদাসের রসিকমঙ্গল, আলাওলের পদ্মাবতী, সিকন্দরনামা, হপ্ত পৈকর ইত্যাদি, ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল, অদ্ভুত-আচার্য্যের রামায়ণ, ভবানন্দের হরিবংশ, পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল,

মনোহরদাসের অনুরাগবল্লী, মনোহরদাসের দিনমণিচন্দ্রোদয়, কালিদাসের মনসামঙ্গল, কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয়, ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল, রূপনারায়ণের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, রতিদেবের মৃগলুব্ধ, কবিচন্দ্রের শিবায়ন, কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ও রায়মঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ ইত্যাদি, শেখ চাঁদের রসুলবিজয়, রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গল শ্যাম পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল, রামদাস আদকের ধর্ম্মমঙ্গল।

অষ্টাদশ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী ও বংশীশিক্ষা, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস, বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র, রামজীবনের মনসামঙ্গল ও আদিত্যচরিত, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন, জীবনকৃষ্ণমৈত্রের মনসামঙ্গল, ভবানীশঙ্করের মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, সহদেব চক্রবর্ত্তীর অনিলপুরাণ।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল, রাধাকান্ত মিশ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য, মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, রুদ্ররামের ষষ্ঠীমঙ্গল, বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল, জয়নারায়ণের কাশীখণ্ড, বিশ্বম্ভরের জগন্নাথমঙ্গল।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট